আজাদ হিন্দ ফৌজ

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীতারিণী শঙ্কর চক্রবর্ত্তী

সম্পাদিত
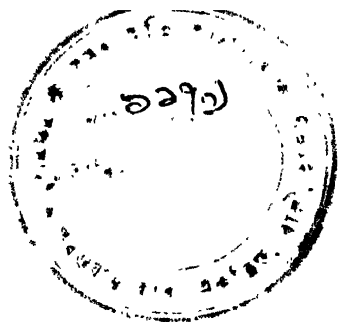
হিন্দুস্থান বুক ডিপো

১২ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

১০ই মে ১৯৪৬

হিন্দুস্থান বুকডিপো ১২নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট
হইতে শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত,
মানসী প্রেস, ৭৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, হইতে
শ্রীশম্ভুনাথ ব্যানার্জ্জী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

দাম সাড়ে তিন টাকা

উৎসর্গ

ভুলাভাই দেশাই, যিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীগণের কলঙ্ক মোচনে এবং রক্ষাকল্পে যে অসীম ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

দ্বিতীয় খণ্ডে আজাদ হিন্দ বাহিনীর আত্ম সমর্পনের পরবর্ত্তী ঘটনাবলী ও বিচারের বিস্তৃত বিবরণ আলোচনা করা হইল।

১০ই মে ১৯৪৬

শ্রীতারিণী শঙ্কর
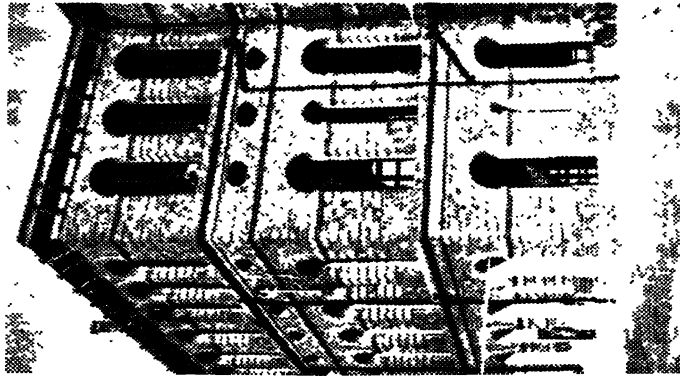
বিচারালয
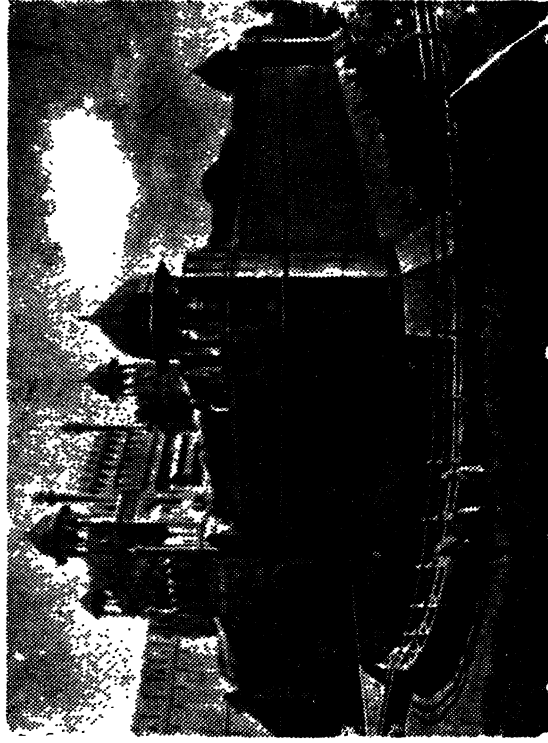
দিল্লীর লাল কেল্লা

স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর অধিনায়কগণ

শ্রীযুত রাসবিহারী বসু

ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের প্রথম প্রেসিডেণ্ট ও আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের প্রধান পরামর্শদাতা শ্রীযুত রাসবিহারী বসু কয়েক মাস আগে টোকিওতে মারা গিয়াছেন।

পূর্ব্ব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠনে তিনি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রথম অবস্থায় তিনিই এ আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছিলেন।

বাংলার বিপ্লববাদ যখন পাঞ্জাবকে রঙীন করিয়া তুলিয়াছিল সেই সময় দেরাদুন বনবিভাগের হেডক্লার্ক রাসবিহারী বসু পাঞ্জাবের ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন ও তাহাদের নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠেন। ১৯১৪ সালের ২৭শে ডিসেম্বর লর্ড হার্ডিংজ্ যখন দিল্লী নগরীতে শোভাযাত্রা করিয়া প্রবেশ করিতেছিলেন তখন তাঁহারই নেতৃত্বে যে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহাতে বড়লাট ও তাঁহার পত্নী আহত হন এবং কয়েকজন মৃত্যু মুখে পতিত হন। লেডী হার্ডিংজ্ বোমার শব্দে এমনি আঘাত পান যে, তিনি আর ভাল করিয়া সারিতে পারিলেন না এবং উহাই তাঁহার মৃত্যুর শেষ কারণ বলিয়া জানা যায়। এই ঘটনার পর বহু ষড়যন্ত্র ও বোমা-নিক্ষেপের ব্যাপারে রাসবিহারী সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৯১৪ সালে কলিকাতা রাজাবাজার বোমার আখড়া আবিষ্কারের ফলে সেখানকার কাগজপত্রে সরকার উপলব্ধি করিলেন যে, দিল্লীর এই ঘটনা রাসবিহারী ও তাঁহার দলবলেরই কীর্ত্তি। ১৯১৪ সালে সরকার এই সব নথিপত্র হইতে সংগৃহীত তথ্যাবলীর দ্বারা দিল্লী ষড়যন্ত্রের মামলা খাড়া করিলেন। ইহাতে তাঁহার সহকর্মীদের অনেকে ধরা পড়িল এবং অনেকের ফাঁসি হইল। রাস-

বিহারীকে গ্রেপ্তারের জন্য বারো হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয় এবং হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র তাঁহার ছবি প্রচার করা হয়। এত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি পুলিস ও গোয়েন্দাদের চক্ষে ধূলি দিয়া বাংলার ও পাঞ্জাবের মধ্যে বিপ্লবসূত্র গ্রথিত করিবার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।

১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বিষ্ণুগণেশ পিংলে নামক জনৈক মারাঠা যুবক অনেকদিন আমেরিকায় বাস করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি আমেরিকায় 'গদর' ও অন্যান্য বিপ্লব-প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ভারতে বিপ্লব জাগরণে সহায়তা করিবার নিমিত্তই আসিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালী বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হন। রাসবিহারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিপ্লব-ভাবাপন্ন লোকদের একত্র করিয়া দেশকে কি প্রকারে স্বাধীন করা যায় সে সম্বন্ধে নানা পরামর্শ করিলেন। রাসবিহারীর অত্যদ্ভুত সংগঠন শক্তি ছিল। তিনি পিংলে, মোহন সিং, কর্তার সিং, শচীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিপ্লবীগণের সাহায্যে দেশীয় সৈনিকদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিবার আয়োজন করিলেন; কয়েকটি স্থানের সৈনিকেরা রাজী হইল। স্থির হইল ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহ হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে কৃপাল সিং নামক একজন বিশ্বাসঘাতক পুলিসের নিকট সমস্ত বলিয়া দেয়। সরকার তখনই ব্রিটিশ সৈন্য আনাইয়া বারুদঘরে ও তোপখানায় বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করিয়া সতর্ক হইলেন। সরকারের ভাবগতিক ও আয়োজন দেখিয়া সৈনিকেরা ভয় পাইল।

চারি দিকে খানাতল্লাস ধরপাকড় চলিল। রাসবিহারীর এক বাসায় অনেক রিভলবার, গুলী, বোমা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইল, কিন্তু সে-বারও পুলিস রাস বিহারীকে ধরিতে পারিল না। কয়েকদিন পরে মিরাটের এক কেল্লার মধ্যে পিংলে কতকগুলি বোমা সমেত ধরা পড়েন। সরকারী মতে বোমাগুলি এমন উপাদানে গঠিত যে, সেগুলি অনায়াসে অর্দ্ধেক রেজিমেণ্ট উড়াইয়া দিতে পারিত। বিচারে পিংলের ফাঁসী হইল। ইহার পর ব্যাপক ভাবে খানাতল্লাস করিয়া

সরকার পক্ষ লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা আরম্ভ করিলেন। এই সময় ভারতীয় বিপ্লববাদীদের বিপ্লবের ঐকান্তিক চেষ্টার ইতিহাস প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

ইহাদের সহিত আমেরিকাবাসী গদরের ঘনিষ্ঠ যোগ, আমেরিকাস্থ জার্মাণ কন্সাল ও গুপ্তচরদের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণের আয়োজন, বাংলার বিপ্লবীদের সহিত যুক্ত হইয়া সেখান হইতে বোমা ও অন্যান্য বিস্ফোরক আমদানী, ডাকাতি ও হত্যা প্রভৃতি ভীষণ কার্য্য জনসাধারণ জানিতে পারিল। বিচারে কয়েকজনের ফাঁসী ও কয়েকজন মুক্তি পাইলেন; অবশিষ্ট কর্ম্মীদের কারাদণ্ড হইল। কয়েক জনের দ্বীপান্তরও হইয়াছিল; তন্মধ্যে ভাই পরমানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার পর সরকার ভারতরক্ষা আইনের সাহায্যে ১৬৮ জন পাঞ্জাবীকে বিপ্লবী সন্দেহে, ও Ingress Ordinance বিধি অনুসারে ৩৩১ জন লোককে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। প্রত্যাগত শিখদের মধ্যে ২,৫৭৬ জনকে নিজ নিজ গ্রামে নজরবন্দী রাখা হইল।

লাহোর ষড়যন্ত্রে অনেক উচ্চ শিক্ষিত লোক ছিলেন। তাঁহারা সকলেই মৃত্যু বরণ করিলেন অথবা কারাপ্রাচীরের অন্তরালে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গণনা করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার পর সশস্ত্র বিপ্লবের শেষ আশা নষ্ট হইল। এই সকল রাজনৈতিক বিপ্লব দমনকল্পে শিখ সর্দ্দারগণ, পাঞ্জাবী জমিদার ও প্রধান ব্যক্তিগণ সরকারকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত কেবল পুলিসের পক্ষে এরূপ ভাবে কাজ করা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ।

রাসবিহারী লাহোরে বিদ্রোহ জাগরণে অসমর্থ হইয়া ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই ছদ্মবেশে দেশত্যাগী হইলেন। রাসবিহারীর নামে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা ছিল। তথাচ সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি পুলিসকে ফাঁকি দিলেন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ জাপান যাইতেছেন। রাসবিহারী P. N. Tagore নাম লইয়া ও রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া, তাঁহার পূর্ব্বে জাপানে গিয়া ব্যবস্থাদি করিতে হইবে এই অজুহাতে ছাড়পত্র প্রভৃতি লইয়া

চিরকালের জন্য দেশত্যাগী হইলেন। রাসবিহারীর জাপান পৌঁছাইবার এক মাস পরে বৃটিশ সরকার যখন বুঝিলেন তিনি জাপানে আছেন, তখন জাপান সরকারকে বৃটিশ সরকার তাঁহাকে ভারতে পাঠাইয়া দিবার অনুরোধ করেন। জাপান সরকারও ইহাতে রাজী হন।

সেই সময় একদিন রাসবিহারী জাপানী পোষাক পরিয়া ছদ্মবেশে রাস্তায় বাহির হন। সেই রাত্রে বেশ তুষারপাত হইয়াছিল। পথগুলি তখনও বরফে আবৃত ছিল। রাসবিহারী গলিপথ ধরিয়া তদানীন্তন এক মামুলী মন্ত্রীর গৃহে উপস্থিত হন। মন্ত্রিকন্যা তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করেন। তিনি মন্ত্রিকন্যার সহিত যখন চা-পান করিতেছিলেন তখন জানিতে পারিলেন যে, দরজায় পুলিস দাঁড়াইয়া আছে। রাসবিহারী বুঝিলেন, এবার তাঁহাকে বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে। তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন, যদি তিনি ধৃত হন তবে মৃত্যু সুনিশ্চিত।

পিছন দরজা দিয়া তিনি মন্ত্রিকন্যার সহিত নিকটস্থ ঘেইসা বালিকাদের আড্ডায় গিয়া তাহাদের পোষাক পরিধান করিয়া এবং পরচুল লাগাইয়া ঘেইসা বেশে থাকিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ছয় মাস কাল জাপানী পুলিস খুঁজিয়া পায় নাই। অবশেষে তিনি ব্লেক-ড্রেগনদের সাহায্যে জাপানী প্রজা হইতে সক্ষম হন। ইহারা জাপান সরকারের বিরুদ্ধবাদী দল।

তিনি ঐ অঞ্চলের বিপ্লবীদের সংঘবদ্ধ করিলেন এবং চীনদেশস্থ জার্ম্মাণদিগকে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সাংহাই-এর জার্ম্মাণ কন্সালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্তব্য সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ করিলেন। ১৯১৫ সালের অক্টোবর মাসে সাংহাইতে একজন চীনার দ্বারা অনেকগুলি পিস্তল ও টোটা ভারতের বিপ্লবে সহায়তার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু বৃটিশ পুলিস সন্ধান পাইয়া উহা বাজেয়াপ্ত করে। বৃটিশ সরকারের অনুরোধক্রমে জাপ সরকার তাঁহাকে পাঁচদিনের মধ্যে সাংহাই ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। অতঃপর তিনি আট বৎসর আত্মগোপন করিয়া ছিলেন।

ইহার পর তিনি জাপানে "ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ" প্রতিষ্ঠা করিয়া উহা পরিচালনা করেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি জাপানী ভাষায় পাঁচখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন এবং ডাঃ সাণ্ডারল্যাণ্ড লিখিত "ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ" পুস্তক জাপ-ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। জাপ-ভাষায় তিনি একখানা সংবাদপত্র পরিচালনা করেন। উক্ত সংবাদপত্রে ভারত সম্পর্কে জাপ সংবাদপত্রসমূহেও বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং জাপানীদের নিকট বহু বক্তৃতাও করিয়াছেন। মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে টোকিওতে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অর্থসংগ্রহের কাজে লাগিয়া যান।

১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরের পতন হয়। বৃটিশ সৈন্যগণ পূর্ব্বাহ্নেই পলায়ন করেন, কিন্তু ভারতীয় সৈন্যদলকে কিছু না জানাইয়া তাহাদের অনিশ্চিত ভাগ্যের উপর ফেলিয়া রাখা হয়। ব্রিটিশ সমর-অধিনায়কগণের আদেশে সিঙ্গাপুরের সমস্ত ভারতীয় সৈন্য বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেন।

এই সকল ভারতীয় সৈন্য ও প্রবাসী ভারতীয়গণকে যাহাতে জাপানীদের পক্ষে যুদ্ধে লাগাইতে পারেন সেই হিসাবে মেজর ফুজিয়ারা ইঁহাদের নেতৃবৃন্দকে একটি সংঘ গঠন করিতে বলেন। ইঁহারা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাকে মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জাপানের তাঁবেদার হিসাবে গণ্য হইতে অস্বীকার করেন। ইহার পর মার্চ্চ মাসের শেষে রাসবিহারীর সভাপতিত্বে টোকিওতে এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাবের মধ্যে একটিতে বলা হয়—পূর্ব্ব-এশিয়া-প্রবাসী ভারতীয়গণের পক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। এতদ্দ্বারা গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজ কেবল সামরিক প্রয়োজনে জাপানের নিকট হইতে নৌবল ও বিমানবল প্রভৃতি চাহিতে পারিবে। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনা করিবার অধিকার একমাত্র ভারতীয় নেতৃবৃন্দেরই থাকিবে; এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসই সেই অধিকারের মালিক।

জুন মাসে ব্যাঙ্ককেও একটি প্রতিনিধি-সম্মেলনে আজাদ হিন্দ আন্দোলনের

মূল নীতি নির্ধারিত হয়। এই সম্মেলন হইতে গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে আজাদ হিন্দ সংঘ গঠিত হয়। ইহার সভাপতি হন রাসবিহারী বসু। ভারতীয়গণের এই স্বাধীন প্রচেষ্টা জাপান কিছুতেই প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে নাই। বরঞ্চ সাম্রাজ্যবাদী জাপানের মনেও ভীতি ও আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। পাছে সম্রাজ্যবাদের ক্ষতি হয় এই জন্য জাপান অচিরেই এই সংঘ-গঠিত সৈন্য-বাহিনী ভাঙ্গিয়া দেয়।

১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই সুভাষ চন্দ্র সিঙ্গাপুর পৌছেন। পুনরায় তিনি ২নং আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠন করিবার নিমিত্ত ৪ঠা জুলাই এক সম্মেলন আহ্বান করেন। তাহাতে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন এবং সকল আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সংঘ গঠিত পরিষদে রাসবিহারী বসু তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন।

"রাজদ্রোহ কমিটি" সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, শ্রীযুত বসু ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করামাত্র তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। তিনি বাস্তবিক নির্ব্বাসিতের জীবন যাপন করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন বিশিষ্ট ভারতীয় বিপ্লবীর জীবনের অবসান ঘটিয়াছে।

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ মুরসানের রাজা বাহাদুর ঘনশ্যাম সিংহের পুত্র। ১৮৮৬ সালে তাঁহার জন্ম হয়। রাজা ঘনশ্যাম সিংহের নিকট-আত্মীয় হাথরাসের রাজা হরনারায়ণ সিংহের কোন পুত্র ছিল না। এইজন্য ঘনশ্যাম সিংহ হাথরাসের রাজা হরনারায়ণ সিংহের নিকট মহেন্দ্র প্রতাপকে আড়াই বৎসর বয়সের সময় পোষ্যরূপে দান করেন এবং হরনারায়ণও আনন্দের সহিত মহেন্দ্র প্রতাপকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

হাথরাসের রাজা নিজ রাজ্য হাথরাস ছাড়িয়া বৃন্দাবনধামে বাস করিতেই

ভালবাসিতেন। তিনি বৃন্দাবনে যমুনার তীরে কেলীঘাট নামক স্থানে এক বিরাট প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ পিতার সহিত এই বৃন্দাবনেই খেলা করিতেন, বেড়াইতেন, যমুনার নীল জলে সাঁতার কাটিতেন। পরবর্তী জীবনে তিনি ভাল সাঁতার কাটিতে পারিতেন বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। উপযুক্ত গৃহশিক্ষকদের উপর তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার ভার পড়ে। বাড়ীতে যখন পড়িতেন, তখন তিনি বীরপুরুষদের সম্বন্ধেই বেশী করিয়া পড়িতেন। খেলাধুলার মধ্যেও তাঁহার বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার খেলার সাথী ছিল অনেক। তিনি ছিলেন তাহাদের নায়ক। শৈশবে খেলার ছলে তিনি সাজিতেন নেপোলিয়ান আর সবাই সৈন্য সাজিয়া তাঁহার হুকুম তামিল করিত। হুকুম চালাইবার এবং সেই হুকুমকে কার্য্যে পরিণত করিবার অসাধারণ ক্ষমতা তিনি বাল্যকালেই লাভ করিয়াছিলেন।

মহেন্দ্র প্রতাপের বয়স যখন সাড়ে নয় বৎসর তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত রাজ্য এবং তাঁহার ভার কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে চলিয়া যায়। তিনি হাইস্কুলে পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। পরে আলিগড় কলেজ হইতে এফ, এ, পাশ করিয়া তিনি বি, এ, শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই সময় কলেজের ইংরাজ প্রিন্সিপ্যালের কোন অন্যায় কার্য্যের জন্য কলেজের সমস্ত ছেলেরা ধর্ম্মঘট করে, তাহাদের মধ্যে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপও ছিলেন। তিনি ছিলেন ইহাদের অন্যতম নায়ক। কলেজের ধর্ম্মঘটের অবসান হইল। কিন্তু মহেন্দ্র প্রতাপ আর কলেজে গেলেন না। কলেজের পড়া সেই হইতেই শেষ হইল।

বিবাহ ও ইউরোপ ভ্রমণ

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের বয়স যখন সবেমাত্র ষোল বৎসর, তখন প্রসিদ্ধ ঝিন্দ রাজ্যের তৎকালীন রাজার ছোট ভগ্নীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের

দুই বৎসর পর তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণের ইচ্ছা হয়। পূর্ব-পশ্চিমের জ্ঞান বিজ্ঞানের একটা সমন্বয় তৃষ্ণা তাঁহার প্রাণকে উতল করিয়া তুলিয়াছিল পশ্চিমের যাহা কিছু ভাল, তাহা গ্রহণ করিতে এবং ভারতের সনাতন সত্যে প্রচার করিতেই তিনি বাহির হইয়াছিলেন। এইজন্য তিনি ১৮ বৎসর বয়সে স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া য়ুরোপ ভ্রমণে বাহির হন।

য়ুরোপে নানা দেশ ভ্রমণ করিবার সময় তিনি নানাপ্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি দেখিলেন যে, যাহারা স্কুল-কলেজে পড়ে তাহাদের সে পড়া ব্যর্থ হয় না। য়ুরোপের শিক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে হইল দেশে গিয়া সেই আদর্শে বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন এবং সেখানে পুঁথিগত ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা। তাঁহার এই প্রেরণাব ফলেই বৃন্দাবনের প্রেমমহা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার পত্নীর নাম প্রেমমহা। তাঁহারই নামানুসারে এই বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়।

১৯০৯ সালের মে মাসে তিনি তাঁহার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি দেশের বরেণ্য জননায়কবর্গকে আমন্ত্রণ করিয়া এক সভার অনুষ্ঠান করেন। সভার সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। সভায় তিনি বলেন যে, তাঁহার একটি পুত্র হইয়াছে এবং সেই পুত্র হইল এই বিদ্যালয়। তিনি এই বিদ্যালয়ের জন্য তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দান করিতে চাহেন। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দান করিতে সকলে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। অবশেষে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দান না করিয়া প্রায় দশ লাখ টাকা মূল্যের পাঁচখানা গ্রাম বিদ্যালয়কে দান করেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবনের রাজপ্রাসাদও বিদ্যালয়কে দিয়া দিলেন। পরে নানা বাধাবিঘ্ন আসিতে পারে—এইজন্য যাহা দান করিলেন, তাহা বিদ্যালয়ের নামে রেজিষ্টারী করিয়া দিলেন। ইহাই প্রেমমহা বিদ্যালয় স্থাপনের ইতিহাস।

বিদ্যালয় স্থাপন হইতেই তিনি বিদ্যালয়ের কর্ণধার ছিলেন এবং অবৈতনিক-

ভাবে শিক্ষকতাও করিয়াছেন। শিশুশিক্ষার প্রতি তাঁহার খুব দৃষ্টি ছিল। তখন এদেশে বর্তমান পদ্ধতির শিশুশিক্ষা আরম্ভ হয় নাই। তবু বহু পুরাতন কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি দ্বারা তিনি শিশুদিগের মন গড়িয়া তুলিতেন। ছেলেদের লইয়াই তিনি বেশী সময় অতিবাহিত করিতেন। তারপর তাঁহার অবশিষ্ট সম্পত্তির আয় হইতেও গুপ্তভাবে তিনি বিদ্যালয়কে সাহায্য করিতেন এবং গরীব বিদ্যার্থীকে সাহায্য করিতেন। তিনি সাধারণ শিক্ষকের মত শিক্ষকতা করিতেন। ছেলেদের মনে উৎসাহ দিবার জন্য প্রাণে নূতন ভাব সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি নানা স্থানে ছেলেদের লইয়া যাইতেন। স্থানে স্থানে বনে জঙ্গলে পাহাড়ে গিয়া তাবু পাতিয়া ছেলেদিগকে প্রকৃতির সহিত পরিচয় করাইতেন এবং তাহাব সমস্ত খরচ নিজেই বহন করিতেন।

১৯২১ সালের প্রারম্ভে ভারতে যে অসহযোগেব বিরাট আন্দোলন আবম্ভ হয় এবং মহাত্মা গান্ধী যাহার নায়ক, সেই অসহযোগের কথা রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের হৃদয়ে প্রায় ৩৬।৩৭ বৎসর পূর্বে প্রথম স্থান পাইয়াছিল। তিনি তাঁহাব সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সরকারকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। ডাক্তারী প্রভৃতি বিদেশী ঔষধ ব্যবহারের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। আয়ুর্ব্বেদকে তিনি খুব উচ্চ স্থান দিতেন। সরকারের সহিত সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া তিনি তাঁহার নিজের আদর্শ অনুসারে—জাতির আদর্শ অনুসারে চলিয়াছিলেন।

দাতা হিসাবে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের স্থান অনেক উচ্চে। তাঁহার ছোট ছোট দানের অন্ত ছিল না। অনেকে জানিতেই পারিত না—কে তাহাকে দান করিলেন, এমন ছিল তাঁহার দানের রীতি।

এক সময় যুক্তপ্রদেশের আর্য্যসমাজের গুরুকুল ফরক্কাবাদে ছিল। কিন্তু সবার ইচ্ছা ছিল উহা বৃন্দাবনে তুলিয়া আনা হউক। বৃন্দাবনে কেহ আর্য্যসমাজীদের জমি দিতে স্বীকার করিল না। তখন তিনি বিনাসর্তে বৃন্দাবন

সহরের বাহিরের কয়েকটি বাগান ও জমি দান করিলেন। ঐ জমির মূল্য হইবে ১৫০০০৲ টাকা।

বর্তমানে হিন্দু সমাজে যে সব কুসংস্কার আছে, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ তাহা দূর করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। কেবল বক্তৃতাতেই অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন হয় না, তাই তিনি মেথরদের সহিত একত্র বসিয়া আহার করেন।

বহু সাম্যবাদীর সহিত তাঁহার আলাপ-আলোচনা হয়। তবে তাহারা বর্তমান যুগের সাম্যবাদী নহেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ-আলোচনার পর কেবলই ভাবিতেন, ভারতের মুক্তি কোন্ পথে ?

১৯১২ সালে তিনি পুনরায় ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া প্রেমমহা বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া সংগঠনকার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে জনগণকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। কিছু কাল দেশে থাকিবার পর যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে সেই দিনই তিনি য়ুরোপ যাত্রার জন্য তৈয়ার হইলেন। ইহা তাঁহার তৃতীয়বার য়ুরোপ যাত্রা।

মহেন্দ্র প্রতাপ যুদ্ধের সময় নানাদেশ ঘুরিয়া নানাদেশের সহায়তা লইতে চেষ্টা করিতেছিলেন ; এই জন্য জার্ম্মাণীর কাইজারের নিকট হইতে চিঠি লইয়া তুরস্ক হইয়া আফগানিস্থানে আসেন এবং আমীরের সহিত আলোচনা করেন ; পরে আবার জার্ম্মাণীতে ফিরিয়া যান।

সেই হইতে ভারত সরকার অন্যান্য বহু লোকের সহিত মহেন্দ্র প্রতাপের ভারত আগমন বন্ধ করিয়া দেন। তিনি আফগানিস্থানের নাগরিক অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। আফগানিস্থানের আমীর তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন। আমীর আমানুল্লা তাঁহার বন্ধু ছিলেন। আফগানিস্থানের এজেন্ট হিসাবে তিনি পৃথিবীর নানাদেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

বার্লিনে অবস্থানকালে "World Federation" নামক একখানা ইংরেজী কাগজ তিনি সম্পাদনা করিতেন।

তিনি ভারতের নানা ইংরেজী কাগজে প্রবন্ধ লিখিতেন। মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁহার রীতিমত পত্র ব্যবহার হইত। "Young India" পত্রেও তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

তাঁহার যে রাজনৈতিক মত তাহা তিনি তাঁহার এক বন্ধুর পত্রের জবাবে "World Federation" পত্রে ব্যক্ত করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ভারতবাসীরই কংগ্রেসে যোগদান করা উচিত এবং কংগ্রেসের আদর্শ অনুসারে উহার অনুজ্ঞা পালন করা উচিত।

প্রেমমহা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশ করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার ধর্ম্ম প্রেমধর্ম্ম ; যদি আমি হিন্দু হই—তবে আমি মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান।"

বহুদিন তাঁহার বিশেষ কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মস্কো, কাবুল প্রভৃতি স্থানে তিনি আছেন বলিয়া শুনা যাইত। পরে সংবাদ পাওয়া যায় যে, জাপানে আছেন। টোকিও এবং কোবেস্থিত বৃটিশ বাণিজ্য দূতাবাসের কর্ম্মচারিগণ যখন তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, তিনি আফগানিস্থানের প্রজা।

অতঃপর হনোলুলুতে হেডকোয়ার্টার স্থাপন করিয়া তিনি পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে লইয়া একটি রাষ্ট্র-সমবায় গঠনের উদ্দেশ্যে একটি নূতন কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করেন। তাঁহার এই নূতন পরিকল্পনা সম্পর্কে বহু পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয় এইং এ সম্পর্কে নানারূপ মন্তব্য করা হয়। আর্য্যবাহিনী নামে পরিচিত ভারতীয়গণের সভাপতিরূপেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জেনারেল ম্যাকআর্থার যে ৩৯ জন লোককে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দিয়াছেন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ তাঁহাদের অন্যতম। যুদ্ধবন্দী হিসাবে তাঁহাকে

গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দেওয়া হয়। সম্প্রতি তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাকে ভারতে ফিরাইয়া আনার প্রচেষ্টা হইতেছে।

দীর্ঘ এবং শীর্ণকায় রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের মুখমণ্ডল গুম্ফ এবং শ্মশ্রুমণ্ডিত। তিনি চশমা পরিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর হইবে।

কর্ণেল জগন্নাথ রাও ভোঁসলে

যে বংশে ইতিহাস বিখ্যাত মহারাষ্ট্রনায়ক বীরশ্রেষ্ঠ শিবাজী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কর্ণেল জগন্নাথরাও সেই গৌরবদীপ্ত ভোঁসলে কুলোদ্ভব। মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে 'শান্তবাদীর'র নিকটবর্ত্তী তিরোদ গ্রামে তিনি ১৯০৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

'শান্তবাদী'তে মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের পর জগন্নাথরাও দেরাদুনের প্রিন্স অফ ওয়েলস সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। দেরাদুনের শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি ১৯২৭ সালে ইংলণ্ডের 'স্যাণ্ডহার্ষ্ট' সামরিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন সর্ববিষয়ে পারদর্শিতার জন্য তিনি সকলেরই প্রশংসাভাজন হন। ১৯২৮ সালে ভোঁসলেজী কোয়েটাতে অবস্থিত ল্যাঙ্কাশায়ার' রেজিমেণ্টে যোগদান করেন। এক বৎসর পর তাঁহাকে রাজকীয় মারহাট্টা পদাতিক দলে বদলি করা হয়।

১৯৩০ সালে জগন্নাথরাও লেফটেন্যাণ্ট এডজ্যুটাণ্টের পদে উন্নীত হন এবং কনৌরে অবস্থান করিতে থাকেন। এইখানেই তিনি সমুদ্রে নিমগ্নপ্রায় দুইটি উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারীকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করেন। তাঁহার এই বীরত্বের জন্য তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসার অধিকারী হন এবং সম্রাট তাঁহাকে একটি পদকে ভূষিত করেন।

১৯৩৪ সালে ভোঁসলে কাপ্টেন হন এবং সম্রাটের মুকুটোৎসবে যোগদানের দুষ্প্রাপ্য সুযোগ পান। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর তিনি সৈন্যাপত্য শিক্ষাকার্য্যের জন্য নির্বাচিত হন। এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে,

ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই মনোনয়ন লাভ করিতে সমর্থ হন। এই শিক্ষা শেষ হইলে ভোঁস্‌লেকে বেরিলীতে সেনাধিনায়ক মণ্ডলীর অন্তর্গত পদবিশেষে নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর তাঁহাকে লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেলরূপে সিঙ্গাপুরে পাঠান হয়।

বিবরণে প্রকাশ, সিঙ্গাপুরের দূরবস্থার পর ভোঁস্‌লে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেন এবং সৈন্যাধ্যক্ষরূপে সর্বোচ্চ পদে তিনি অভিষিক্ত হন। তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য সহস্র সহস্র অফিসারকে শিক্ষিত করিয়া তোলেন। তাঁহাকে ব্যাঙ্ককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, তাহাকে দিল্লীর 'লালকেল্লায়' বন্দী জীবন কাটাইতেছেন।

জগন্নাথরাও ঐতিহাসিক খ্যাতিসম্পন্ন অভিজাত সর্দার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গত মহাযুদ্ধে এবং এই মহাযুদ্ধেও তাঁহার অনেক আত্মীয় সাহস ও বিক্রমের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার একটি আত্মীয় গোয়ালিয়র রাজ্যের উচ্চপদস্থ সামরিক আফিসারের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। কাপ্টেন ভোঁস্‌লে সিন্ধিয়ার বর্তমান শাসকেরও আত্মীয়।

তাহার পত্নী চাঁদকিনোবাঈও অভিজাত পরিবার সম্ভূত। বরোদা, কোলাপুর, শান্তবাদী, প্রভৃতি কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের নৃপতির সহিত তাঁহার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। জগন্নাথরাওএর তিনটী কন্যা বর্তমান—জ্যেষ্ঠের বয়স ১১ বৎসর। তাঁহার স্ত্রী ও কন্যারা বর্তমানে বরোদাতে বাস করিতেছেন।

জগন্নাথরাওয়ের পেশীবহুল বলিষ্ঠকায় আকৃতি সৈন্যোপজীবিকার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মহৎ-চরিত্র ও সরল ব্যবহারের গুণে তিনি সকলেরই প্রিয়। মহারাষ্ট্র ভাষা ছাড়া উর্দু ও ইংরাজী ভাষার উপরও তাঁহার বেশ অধিকার আছে। তিনি একজন বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী। সৈনিক জীবনে তিনি খেলা-ধূলায় পারদর্শিতা দেখাইয়া বহু পদক লাভ করিয়াছিলেন। ক্রিকেট তাঁহার প্রিয় খেলা।

জগন্নাথরাওএর ৮৫ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা মাতা গঙ্গাবাঈ তাঁহার বীর সন্তানের সহিত মিলিত হইবার জন্য গৃহদেবী ভবানীর নিকট প্রার্থনা করিয়া শান্তবাদীতে কালাতিপাত করিতেছেন। বৃদ্ধা মাতার এই আকুল কামনা কি পূর্ণ হইবে না ?

লেঃ কর্ণেল ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথন

ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথন ১৯৩৭ সালে মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজ হইতে ভৈষজ্য ও শল্য শাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর ১৯৪২ সালে তিনি সিঙ্গাপুর গমন করেন। তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিয়া উহার অন্তর্ভুক্ত নারীবাহিনী গঠন করেন। তিনি লেঃ কর্ণেল পদে উন্নীত হইয়া "ঝাঁসীর রাণী" বাহিনীর অধিনায়কত্ব করেন। সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নেত্রী ঝাঁসীর রাণীর নামানুসারে উক্ত বাহিনীর নামকরণ করা হয় এবং মালয়ে অবস্থিত ভারতীয় পরিবার হইতে উক্ত বাহিনীর জন্য নারীদের সংগ্রহ করা হয়। তাহারা অস্ত্র প্রয়োগের কৌশল ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে। ব্রহ্মে জাপানীদের পতনের পর এই নারী বাহিনীর অস্তিত্ব লোপ পায়। অতঃপর শ্রীমতী লক্ষ্মী কিছুকাল কালেওয়ায় এবং পরে রেঙ্গুনে ইউনাইটেড ফার্ম্মেসীতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের মধ্যে চিকিৎসক হিসাবে কাজ করেন। তিনি বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট পরে আত্মসমর্পণ করেন। ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর অধিনায়িকা লেঃ কর্ণেল লক্ষ্মী স্বামীনাথনের বয়স ৩২ বৎসর। তাঁহার পিতা একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ছিলেন এবং তাঁহার মাতা শ্রীযুক্তা আম্মু স্বামীনাথন ভারতবর্ষে সুপরিচিত। এই বীরাঙ্গনা বাল্যে ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিতপালিত হইলেও নানারূপ বিদ্যার ও কলার্চ্চার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল এবং তিনি বেশভূষা হইতে আরম্ভ করিয়া, এমন কি কথাকলি নৃত্যের আঙ্গিক পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিতেন। তিনি ক্রীড়ামোদী ছিলেন এবং টেনিস ও

পিংপং খেলিতে ভালবাসিতেন। মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারী পাশ করিবার পর তিনি মাদ্রাজ ফ্লাইং ক্লাবের শিক্ষক বাঙ্গালোর নিবাসী বিমানচালক জনৈক ব্রাহ্মণযুবকের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে মনস্থ করেন. কিন্তু শীঘ্রই গতানুগতিক গার্হস্থ্য-জীবনের আকর্ষণ তাঁহার কাছে নিষ্প্রভ হইয়া যায়। তিনি নিস্তরঙ্গ ও নিরাপদ জীবন যাপনের মোহ কাটাইয়া বিপদসঙ্কুল বৃহত্তম জীবনের সহিত পরিচিত হইবার জন্য বাহির হইয়া পড়েন এবং ১৯৪০ সালে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

বহুগুণবিভূষিতা শ্রীমতী লক্ষ্মী মাদ্রাজে তাঁহার প্রোজ্জ্বল দেশপ্রেমের জন্য খ্যাত ছিলেন। তাঁহার কংগ্রেসানুরাগ সুবিদিত ছিল। কংগ্রেস নির্ধারিত দিবসগুলি তিনি নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন এবং ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা তাঁহার গৃহে উত্তোলন করিতেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কয়েকবার শ্রীমতী লক্ষ্মীর বাসায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন এবং গৃহস্থ অধিবাসীদের নৈষ্টিক দেশপ্রেম দর্শনে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। জাপান কর্তৃক সিঙ্গাপুর অধিকৃত হইবার প্রাক্কালে শ্রীমতী লক্ষ্মীকে স্থান ত্যাগ করিতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তিনি ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পর কিছুদিন আর তাঁহার সম্পর্কে কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

অতঃপর একদিন সাইগল রেডিও হইতে বিজ্ঞাপিত হয় যে, শ্রীমতী লক্ষ্মী মালয়ে যে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই গবর্ণমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। অতঃপর তাঁহার নেতৃত্বে "ঝাঁসীর রাণী" এই নামে নারী যোদ্ধ্ব বাহিনী গঠিত হয়।

১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে শান ষ্টেটে কালওয়া নামক স্থানে বার্মা রক্ষা আইনে তাঁহাকে অন্তরীণ করা হয়। ১৯৪৬ সালে ৩রা মার্চ্চ বর্মা হইতে দমদম বিমান ঘাঁটিতে আনার পর মুক্তি দেওয়া হয়। অপূর্ব বীরত্ব ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার জন্য লেঃ কর্ণেল লক্ষ্মীর নাম পৃথিবীর মুক্তিলিপ্সু বীরাঙ্গনাদের তালিকায় চিরউজ্জ্বল থাকিবে।

মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ

মেজর জেনারেল শাহ নাওয়াজ রাওয়ালপিণ্ডীর বিখ্যাত জানজুয়া রাজপুত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জানজুয়া সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন; তিনি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল কার্য্য করিয়াছিলেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে শাহ নওয়াজের পরিবারস্থ প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিই সৈন্যবাহিতে যোগদান করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের পরিবারভুক্ত স্বজনগণের মধ্যে ন্যূনকল্পে আশীজন ব্যক্তি বর্তমানে ভারতীয় সামরিক বিভাগের অফিসার-রূপে কার্য্য করিতেছেন। এক কথায় বলিতে গেলে একটি সুবিদিত রাজভক্ত পরিবারে শাহ নওয়াজের জন্ম। তিনি রয়েল ইণ্ডিয়ান মিলিটারী কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি আই, এম, এস, পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়া বিশেষ বিশেষ বৃত্তি লাভ করেন ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চতুর্দ্দশ পাঞ্জাবে রেজিমেণ্টের প্রথম বাহিনীতে নিযুক্ত হন।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে ফিরোজপুর শিক্ষা কেন্দ্র ত্যাগ করিয়া তিনি মালয়ের একটি সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের জন্য আদিষ্ট হন, উক্ত সৈন্য-বাহিনীর সহিত ১৯৪২ খৃঃ ২৯শে জানুয়ারী তিনি সিঙ্গাপুর উপনীত হন। কিন্তু সিঙ্গাপুর যুদ্ধের অবস্থা তখন চরমে পৌছিয়াছে। শাহ নওয়াজ স্বভাবতঃ এত নির্ভীক ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে তিনি সেই চরম অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্যেও জাপানের বিরুদ্ধে সমানভাবে যুদ্ধ চালাইয়া যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন; পশ্চাৎ অপসরণের কল্পনাও করেন নাই। অথচ তাঁহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বস্থ সৈন্যবাহিনীর ব্রিটিশ অধিনায়কগণ সঙ্কট উপলব্ধি করিয়া তৎপরতার সহিত পূর্ব্বেই পলায়ন করেন।

১৯৪২ খৃঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারী সকালে জাপ অধিনায়ক মেজর ফুজিয়ারার নিকট

তাঁহাদের বাহিনী আত্মসমর্পণ করেন। পরে মেজর ফুজিয়ারা এই ভারতীয় বাহিনীর সর্ব্ববিধ দায়িত্ব সর্ব্বাধিনায়ক "মোহন সিংএর হস্তে সমর্পণ করেন। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহিত শাহ্ নওয়াজের সাক্ষাৎ হয়। মেজর জেনারেল শাহ্ নওয়াজ তাঁহার কর্ম্মজীবনের বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে নেতাজীর সহিত আমার সাক্ষাৎএর পূর্ব্বে আমি কেবল সামরিক শিক্ষাই লাভ করিয়াছিলাম; রাজনীতি বা অন্যান্য বিষয়ে আমার বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল না। শৈশব হইতে যে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের মধ্যে আমি প্রতিপালিত হইয়াছিলাম তাহাতে আমার মানসিক বৃত্তিগুলি একজন তরুণ ইংরাজ অফিসারের মতই গঠিয়াছিল এবং আমি ভারতবর্ষকে ইংরাজের দৃষ্টি লইয়াই দেখিতে শিখিয়াছিলাম, কিন্তু নেতাজীর সংস্পর্শে আসিয়া আমার দৃষ্টিপথ হইতে সে স্বপ্নের কাজল মুছিয়া গেল। দাসত্বের মোহমুক্ত দৃষ্টি মেলিয়া আমি প্রথম আমার জন্মভূমিকে ভারতবাসীর দৃষ্টি লইয়া দেখিলাম।"

দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মেজর জেনারেল শাহ্ নওয়াজের জীবনে এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিল। জন্মভূমির দাসত্ব শৃঙ্খল এবং ৪০ কোটি ভারত বাসীর পরাধীনতার বন্ধন মুক্ত করিবার জন্য তিনি ভারতের জাতীয় বাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৪ খৃঃ ইম্ফল অভিযান কালে তিনি 'বসু' বিগ্রেডের অধিনায়করূপে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। জন্মভূমির স্বাধীনতা অর্জ্জনে তিনি এতদূর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন যে এই যুদ্ধে তিনি তাঁহার সহোদর ভ্রাতার বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আজাদ হিন্দ ফৌজে তিনি মেজর জেনারেলের পদে উন্নীত হন; এবং জাতীয় বাহিনীর বিজয় গৌরবের কীর্ত্তি স্বরূপ তিনিই প্রথম বৃটিশ শাসিত মণিপুর, কোহিমা, প্রভৃতি প্রদেশে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করেন।

কর্ণেল পি কে সেহ্‌গল

আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানের পূর্ব্বে ক্যাপ্টেন পি কে সেহ্‌গল বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত পঞ্চম বেলুচ রেজিমেণ্টের অফিসার ছিলেন। তিনি লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ অচ্ছুরামের পুত্র।

১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে উক্ত রেজিমেণ্টের ২য় ব্যাটেলিয়নের নায়ক পদ গ্রহণ করিয়া সিঙ্গাপুরে গমন করেন। ১১ই নভেম্বর কর্ণেল সেহ্‌গল সিঙ্গাপুরে উপনীত হন। এক পক্ষকাল পরে কেলানটান ষ্টেটের অন্তর্গত কোটা বারু সমুদ্রাঞ্চল রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হন। মালয়ের উত্তরাঞ্চলের সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল ম্যারে, ভারতীয় নবম ডিভিসনের মেজর জেনারেল বারষ্টো প্রভৃতি কর্ণেল সেহ্‌গলের রেজিমেণ্ট পরিদর্শন করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মালয় অভিযানের সময় তিনি জাপানীগণকে কয়েকটি যুদ্ধে বিশেষভাবে পরাজিত করেন। একবার কর্ণেল সেহ্‌গল তাঁহার সৈন্যগণের সাহায্যে ৫০০ শত জাপানী সৈন্যের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করিয়া বহু অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করেন।

১৯৪২ সালে ৩১শে জানুয়ারী ভোর রাত্রে তিনি তাঁহার সৈন্যদল সমেত জোহর বারু অতিক্রম করিয়া সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হন। সিঙ্গাপুরে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর এই সৈন্যদল অক্লান্তভাবে দিবারাত্র জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। জাপানীগণ ৮ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরে অবতরণ করে এবং ১০ই ফেব্রুয়ারী কর্ণেল সেহগল প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া জাপানীগণকে সমুদ্রাভিমুখে উড্‌ল্যাণ্ড অঞ্চলে বিতাড়িত করেন। কিন্তু পরদিবস মাণ্ডাই পর্ব্বত অঞ্চল হইতে অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যদের স্থান গ্রহণের জন্য কর্ণেল সেহ্‌গল আদেশ প্রাপ্ত হন। মাণ্ডাই পর্ব্বত অঞ্চলে যাইবার পথে তাঁহারা জাপানীগণ কর্তৃক আক্রান্ত হন। ইতিমধ্যে অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যদল কর্ণেল সেহ্‌গলের সৈন্যদল পৌছিবার পূর্ব্বেই পলায়ন

করেন। জাপানীগণ উক্ত পর্ব্বত অধিকার করায় এই সৈন্যদল মূল বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ঐ দিবস অপরাহ্নে তিনি তাঁহার মূল সেনাদলের সহিত পুনরায় যোগসূত্র স্থাপন করেন। এই সময় জাপানীগণ প্রবলভাবে আক্রমণ করিলে তিনি তাঁহার সৈন্যদলের সাহায্যে সে আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তিনটি জাপানী ট্যাঙ্ক অধিকার করেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী কর্ণেল সেহ্‌গল জাপানীদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

শৃঙ্খলিতা ভারত জননীর মুক্তি সাধনের জন্য ১৯৪২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেন, এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন।

কর্ণেল গুরুবক্স সিং ধীলন

আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম অভিযুক্ত আসামী কর্ণেল গুরুবক্স সিং ধীলন। তিনি জাতিতে শিখ, দেখিতে গৌরবর্ণ মধ্যমাকৃতি। তিনি যে পরিবারসম্ভূত, সে পরিবারের অনেকেই বহুদিন যাবৎ সেনাবাহিনীতে কাজ করিয়াছেন। তিনি ১৯১৬ সালে লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সৈন্যবাহিনীতে সিপাহী হিসাবে যোগদান করেন। তিনি দেরাদুন ও নবাবগঞ্জ সামরিক বিদ্যালয় হইতে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া গুরুবক্স ১।১৪ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিলে তাঁহাকে এবং তাঁহার রেজিমেণ্টকে মালয়ে পাঠান হয়। মালয়ে কিছুকাল অবস্থান করিবার পর পুণায় আরও অধিক ব্যবহারিক সামরিক শিক্ষালাভের জন্য তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। এখানেও তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং তাঁহার রেজিমেণ্টে যোগদানের জন্য পুনরায় মালয় যাত্রা করেন। এই সময় তাঁহাদের রেজিমেণ্টটি উত্তর মালয়ের

জঙ্গলে অবস্থান করিতেছিল। বিপদের সময় তাঁহার মধ্যে আজীবন নেতার সমস্ত গুণপনাই তাঁহার মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়াছে।

কর্ণেল ধীলন ৫ই ডিসেম্বর (১৯৪১) জিত্রাতে তাঁহার সৈন্যবাহিনীর সহিত মিলিত হন। চাংলুন রণাঙ্গনে জাপানীদের সহিত যুদ্ধে তিনি তাঁহার সৈন্য ও অফিসারগণসহ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। ১৬ই ডিসেম্বর পেনাং হইতে ২৬ মাইল দূরে নিবং টাইবলে তাঁহারা উপস্থিত হন। এইস্থানে কর্ণেল ধীলন ও হাবিবকে দুইটি সেতুমুখ রক্ষার ভার দেওয়া হয়। ১৯শে ডিসেম্বর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী পশ্চাৎ অপসরণ করা হয়। ৮ই ডিসেম্বর জাপানীগণের যুদ্ধ ঘোষণার পর কর্ণেল ধীলন অক্লান্তভাবে জাপানীদের বিরুদ্ধে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এই সময় তিনি সারাদিনের মধ্যে একবারের জন্যও পূর্ণ খাদ্য গ্রহণ করিবার সময় পাইতেন না। এই সময় যখন তিনি জ্বরে আক্রান্ত হইয়া হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন ভারতীয় সেনাদের মধ্যে বৈষম্যমূলক ব্যবহারের জন্য তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। তৎপর তিনি ভারতীয় উইং কমাণ্ডার ও অ্যাডজুটান্ট পদে বৃত হন ও ভারতীয় সৈনিকগণকে শান্ত করেন।

যুদ্ধের সময় একবার যখন জাপানীরা অধিকসংখ্যক সৈন্য ও বিমান বাহিনী লইয়া বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদিগকে নির্মমভাবে আক্রমণ করিতেছিল, তখন তিনি অনেকের জীবন বাঁচাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পলায়নের রাস্তা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে তাঁহারা অস্ত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং তাঁহাদের দলটিকে জাপানী সামরিক বন্দীনিবাসে লইয়া যাওয়া হয়। ক্যাপ্টেন গুরুবক্স ধীলন অতঃপর ব্যাংককে অধিষ্ঠিত পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হন।

এই সময় তিনি মেজর মোহন সিং কর্তৃক গঠিত ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগদান করেন। কর্ণেল ধীলন তিন হাজার আজাদী সৈন্য লইয়া গঠিত “নেহেরু ব্রিগেড” ইম্ফল রণাঙ্গনে পরিচালিত করেন। ১৭ই মে পেগু

রণাঙ্গনে বৃটিশ বাহিনী কর্তৃক ধৃত হইয়া পেগু জেলে নীত হন। ১৯৪৫ সালের জুন মাসের শেষভাগে তাঁহাকে ভারতবর্ষে আনিয়া কলিকাতাতে অবস্থিত বৃটিশ মিলিটারী হাজতে আটক রাখা হয়। ১৯৪৫ সালের ৫ই জুলাই তিনি দিল্লী পৌছেন। ৫ই জুলাই হইতে ১১ই আগষ্ট পর্যন্ত তিনি কোথায় আছেন, এ সম্পর্কে কোন খবরই পাওয়া যায় না। ১১ই জুলাই ভারত গবর্ণমেণ্টের য়্যাডজুট্যাণ্ট জেনারেলের নিকট হইতে প্রাপ্ত একটি পত্র হইতেই তাঁহার সম্পর্কে তাঁহার পরিবারবর্গ প্রথম খবর পান। পত্রে উল্লিখিত হয় যে, ক্যাপ্টেন গুরুবক্স সিংকে খুজিয়া পাওয়া গিয়াছে এবং তাঁহাকে প্রশ্ন করা ও তাঁহার অনুসন্ধানাদির কাজ কয়েক সপ্তাহব্যাপী চলিবে। ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহার সম্পর্কে কোনরূপ অনুসন্ধান বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়। সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার পিতা গুরুবক্স সিংয়ের নিকট হইতে এই মর্মে একটি 'তার' পান—'দয়া করিয়া সত্বর দিল্লী লালকেল্লায়' আমার সহিত সাক্ষাৎ করুন। ভালই আছি। মাতাঠাকুরাণীকে আমার ভালবাসা জানাইবেন।

ক্যাপ্টেন ধীলন বিবাহিত, কিন্তু তাঁহার কোন সন্তানাদি নাই। তাঁহার পিতা পশু-চিকিৎসক হিসাবে সেনাবাহিনীতে ২২ বৎসর কাজ করিবার পর বর্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এখন লাহোরের আলগাঁওতে বিশ্রাম-জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহার আরও দুই ভাই সেনাবাহিনীতে কাজ করিতেছেন এবং চতুর্থ ভ্রাতা ডেপুটি-ফরেষ্ট রেঞ্জারের পদে নিযুক্ত আছেন।

বিচার

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লাল কেল্লার অন্তর্গত ব্যারাকের যে হলটি শয়নপ্রকোষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হইত, সেই হলে ১৯৪৫ সালের ৫ই নভেম্বর প্রাতে ১০-:৫ মিনিটে সামরিক আদালত বসে। বিচারালয়ে পরিণত ব্লকটি লোহিত ও ধূসর বর্ণের প্রস্তরনির্মিত দ্বিতল অট্টালিকা; উহার নির্মাণ-প্রণালী অসংযত; কেল্লার দক্ষিণ প্রান্তে ইহা অবস্থিত। নিম্নতলে একটী অংশে সাংবাদিকগণের কক্ষ নির্দ্দিষ্ট করা হয়। সেখানে টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ অফিসের 'প্রেস কাউণ্টার' স্থাপিত হয়, ইহারই ঠিক উপরে দ্বিতলের একটি হল বিচারালয়ের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। এই হলটির আকৃতি আয়তক্ষেত্রের ন্যায়। দেওয়ালগুলি খুব উঁচু। হলটির দৈর্ঘ্য ৬০ ফুট ও বিস্তৃতি ২৫ ফুট। হলটির তিন দিকে প্রশস্ত বারান্দা আছে।

হলের একদিকে নারিকেল দড়ির জাল দ্বারা আচ্ছাদিত। মঞ্চে প্রেসি-ডেণ্ট এবং সামরিক আদালতের অন্যান্য সদস্যের আসন নির্দিষ্ট হয়। আসামী পক্ষের এবং সরকার পক্ষের কৌসুলিগণ হলের পরবর্তী অংশে মঞ্চের সম্মুখে আসন গ্রহণ করেন। দড়ি ঘেরা একটি স্বতন্ত্র আবেষ্টনীর মধ্যে সাংবাদিকগণের স্থান নিদিষ্ট থাকে। হলের বাকি অংশ দর্শকগণের জন্য বন্দোবস্ত করা হয়।

সামরিক বিচারালয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম বিচারের দিন হইতে পর্যন্ত বিচার সমাপ্ত কাল পর্য্যন্ত, দিল্লীর লালকেল্লায় প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ থাকে। বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার জন্য যাঁহাদের 'স্পেশাল পাশ' ছিল, অথবা যাঁহাদের নিকট ষ্টেশন ষ্টাফ অফিসারের অথবা অনুরূপ পাশ ছিল, কেবলমাত্র তাঁহারাই কেল্লায় প্রবেশ করিতে পারিতেন। শেষোক্ত অফিসারগণ সরকারী কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কেল্লায় প্রবেশ করিবার অধিকারী।

যাঁহারা বিচারালয়ের সহিত সোজাসুজি সংশ্লিষ্ট তাঁহারা ব্যতীত, 'প্রেস পাশ' প্রাপ্ত সাংবাদিকগণ এবং সমর বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত 'স্পেশাল পাশ' প্রাপ্ত জনসাধারণ আদালত ভবনে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়।

কোর্টের বিচারকগণ, আসামী, কৌস্থলী ও সাক্ষিগণের আসন ব্যতীত আরও ২ শত আসনের ব্যবস্থা করা হয়। উহার মধ্যে ৬০টি আসন সাংবাদিকগণের জন্য এবং অল্প কয়েকটি মাত্র সামরিক বিচারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীদের জন্য স্বতন্ত্র ছিল।

সাংবাদিকগণের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট 'প্রেস রুমে' টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ অফিসের 'প্রেস কাউন্টার' স্থাপিত হয়।

আদালতের প্রেসিডেণ্ট ও অন্যান্য সদস্য শপথ গ্রহণের পর আসামী মেজর জেনারেল শাহ্ নওয়াজ, কর্ণেল পি কে সেহ্গল ও কর্ণেল গুরুবক্স সিং ধীলনকে কোর্টে হাজির করা হয়। আসামীগণ সারিবদ্ধ হইয়া স্থিরভাবে কোর্টের সম্মুখে দণ্ডায়মান হন। তাঁহারা ইউনিফর্ম পরিহিত ছিলেন। কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনীতে তাঁহারা যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই পদের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক সমস্ত নিদর্শন ইউনিফরম হইতে খুলিয়া লওয়া হইয়াছিল।

সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, নরহত্যা এবং তাহাতে সহায়তা করা—আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত এই সকল অভিযোগ আদালতে আসামীদের নিকট পঠিত হয়। আসামীগণ প্রত্যেকটি অভিযোগ সম্পর্কে নিজেদিগকে নির্দোষ বলিয়া ঘোষণা করেন।

বিচারক, আসামী ও উভয়পক্ষের ব্যবহারজীবিগণ

আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সমর্থনের জন্য কংগ্রেস কর্তৃক যে পক্ষসমর্থনকারী কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে তাহা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, লাহোর হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি কুনোয়ার স্যার

দিলীপ সিংহ, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, মিঃ আসফ আলী, রায় বাহাদুর বদ্রীদাস, পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মিঃ পি কে সেন এবং শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন শরণকে লইয়া গঠিত হয়। স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু এবং শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষ সমর্থন করেন।

ভারতীয় বাহিনীর সাতজন অফিসার লইয়া সামরিক আদালত গঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে চার জন ইউরোপীয় এবং তিনজন ভারতীয়, যথা—মেজর জেনারেল এ বি, ব্ল্যাক্সল্যাণ্ড, ব্রিগেডিয়ার এ জি এইচ হার্ক, লেঃ কর্ণেল সি আর স্কট. লেঃ কর্ণেল টি আই ষ্টিভেনসন, লেঃ কর্ণেল নাসির আলী খাঁন, মেজর বি প্রীতম সিংহ এবং মেজর বনোয়ারীলাল। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এডভোকেট জেনারেল স্যার এন পি ইঞ্জিনিয়ার ও মেজর ওয়াল্‌স।

বিচারকগণের শপথ গ্রহণ করিতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগে। বিচারকগণ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বলিয়া স্ব স্ব ধর্মানুযায়ী বাইবেল, গীতা, কোরাণ ও গ্রন্থসাহেব স্পর্শ করিয়া তাঁহারা শপথ গ্রহণ করেন। তাঁহারা এ শপথও করেন যে কর্তৃপক্ষ প্রকাশ না করা পর্যন্ত তাঁহারা এই সামরিক আদালতের রায় প্রকাশ করিবেন না এবং কোন সামরিক আদালতে সাক্ষ্যদানের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন কারণেও তাঁহারা এই সামরিক আদালতের কোন বিচারকের কোন মতামত বা ভোট প্রকাশ করিবেন না। সরকারপক্ষের প্রথম সাক্ষী লেঃ নাগ আজাদ হিন্দ ফৌজের বিভিন্ন শ্রেণীর সৈন্যদের কতকগুলি ব্যাজ আদালতে একজিবিট হিসাবে পেশ করেন। কতকগুলি ব্যাজে কংগ্রেস পতাকার সবুজ শ্বেত ও গৈরিক বর্ণ রহিয়াছে।

আসামীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলী শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই এক দরখাস্ত দাখিল করেন। আসামীপক্ষকে সাক্ষীগণের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ করিবার এবং প্রমাণাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিবার সুযোগ দেওয়ার

জন্য উক্ত দরখাস্তে বিচার তিন সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত স্থগিত রাখার জন্য প্রার্থনা করা হয়।

ফরিয়াদীপক্ষের কৌঁসুলী স্যার এন পি ইঞ্জিনিয়ার বলেন,—আসামী-পক্ষ যদি প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে অল্প সময়ের জন্য মামলা স্থগিত রাখিতে তাঁহার কোনও আপত্তি নাই। তবে তাঁহার মত এই যে, ফরিয়াদীপক্ষে মামলা উদ্বোধনের এবং প্রধান প্রধান সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের পরই মামলা সংক্রান্ত কাজকর্ম স্থগিত রাখার উপযুক্ত অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে।

অতঃপর কিছুক্ষণের জন্য কোর্টের কাজ বন্ধ থাকে এবং বিচারকগণ পরামর্শ করিবার জন্য বাহিরে যান। পরে বিচারকগণ আসন গ্রহণ করিয়া ঘোষণা করেন যে, এডভোকেট-জেনারেলের উদ্বোধন বক্তৃতা ও প্রথম সাক্ষীর জবানন্দী গ্রহণের পর মামলা স্থগিতের দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে তাঁহারা সম্মত আছেন।

অতঃপর স্যার এন পি ইঞ্জিনিয়ার তাঁহার উদ্বোধন-বক্তৃতা আরম্ভ করেন।

জলযোগের পর আদালত বসিলে সরকার পক্ষের প্রথম সাক্ষী লেফটেনাণ্ট ধীরেন্দ্র চন্দ্র নাগের জবানবন্দী গৃহীত হয়।

আরও তিনজনের বিরুদ্ধে চার্জ সীট দাখিল

আজাদ হিন্দ ফৌজের—(১) ক্যাপ্টেন আবদুল রসিদ (১।১৪'শ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট), (২) সুবেদার শিঙ্গারা সিংহ (৫।১৪'শ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট) এবং (৩) জমাদার ফতে খাঁ (৫।১৩'শ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট) ক্যাপ্টেন বুরহানউদ্দিন প্রভৃতি আরও রণনায়কগণের বিভিন্ন আটটি সামরিক আদালতে বিচার হইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও অনেকে বিচারের অপেক্ষায় বিভিন্ন বন্দী নিবাসে আটক অবস্থায়

কালাতিপাত করিতেছেন। ইহাদিগকে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রথমোক্ত দুইজনের বিরুদ্ধে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায় সহায়তা করার, হত্যা করার এবং একটি দণ্ডে ঝুলাইয়া রাখিয়া দুইজন নন্-কমিশণ্ড অফিসারকে গুরুতর আঘাত করার এবং তাঁহাদিগকে ছড়ি দ্বারা আঘাত করার অভিযোগও আনা হইয়াছে। ইঁহাদের প্রায় প্রত্যেককেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৭ নং এবং ৩২০ নং ধারা অনুসারে ও সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লোককে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে গুরুতর আঘাত বা আঘাত করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

মেজর জেনারেল ব্লাক্স্‌ল্যাণ্ড এবং সামরিক আদালতের অন্যান্য সদস্য নির্দ্ধারিত দিবসে প্রাতে ১০-১৫ মিনিটে আসন গ্রহণ করেন। কোর্টের বাম দিকে আসামী পক্ষের কৌঁসুলীগণের আসন। কৌঁসুলীগণ নিম্নলিখিত পর্যায়ে আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে কুনোয়ার স্যার দলীপ সিং, তারপর ব্যারিষ্টারের পোষাক-পরিহিত পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু (২২ বৎসর পরে পণ্ডিত নেহরু এই প্রথম ব্যারিষ্টারের পোষাক পরিলেন), তারপর স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, মিঃ আসফ আলী এবং ডাঃ কে এন কাটজু। তাঁহাদের পশ্চাতের সারিতে ডাঃ পি কে সেন এবং অন্যান্য কৌঁসুলী উপবেশন করেন। তাঁহাদের ঠিক বিপরীত দিকে এডভোকেট জেনারেল স্যার এন পি ইঞ্জিনিয়ার এবং মিলিটারী প্রসিকিউটার লেঃ কর্ণেল ওয়ালস উপবিষ্ট হন।

আদালত বসিবার পর সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফারগণ ফটো গ্রহণ করেন। সেজন্য কিছু সময় অতিবাহিত হয়। তার পর জজ-এডভোকেট কর্ণেল এফ সি এ ক্রীন, কোর্টের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে, আর ফটো লইতে দেওয়া হইবে না এবং কোর্ট গৃহে ধূমপান নিষিদ্ধ।

কোর্ট গঠন সংক্রান্ত আদেশ পঠিত হইবার পর, জজ-এডভোকেট আসামী-

দিগকে কোর্টে আনিবার আদেশ দেন। ক্যাপ্টেন শাহ্ নওয়াজ, ক্যাপ্টেন সাইগল এবং লেঃ গুরুবক্স সিং ধীলনকে যখন কোর্টে হাজির করা হয়, তখন কোর্ট গৃহে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। আসামীত্রয় পরস্পর পাশাপাশি দাঁড়াইয়া কোর্টকে অভিবাদন করেন এবং স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হন। বিচারকগণ যে মঞ্চোপরি উপবিষ্ট ছিলেন, তাহারই পাদদেশে আসামীগণ সারি দিয়া দাঁড়ান।

আসামীদের পরিধানে সামরিক ইউনিফরম ছিল। কিন্তু তাঁহারা যে পদে নিযুক্ত ছিলেন, ইউনিফরম হইতে সেই পদের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক নিদর্শন খুলিয়া লওয়া হইয়াছিল।

আসামীদিগকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হয়,—যাঁহাদিগকে লইয়া কোর্ট গঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের কাহারও দ্বারা বিচারে অথবা মামলার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য যে সকল সরকারী রিপোর্টার নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও সম্বন্ধে কোনও আপত্তি আছে কি না। আসামীগণ নেতিবাচক উত্তর প্রদান করেন।

অতঃপর আদালতের বিচারকগণকে এবং রিপোর্টারগণকে শপথ গ্রহণ করান হয়।

সরকারী অভিযোগ

জজ এডভোকেট ইহার পর অভিযোগগুলি পাঠ করেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারা অনুযায়ী তিনজন আসামীকেই রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর ও ১৯৪৫ এর ২৬শে এপ্রিলের মধ্যে সিঙ্গাপুর, মালয়, রেঙ্গুণ, পোপা ও কিয়াক-পাদাউং-এর নিকটে এবং ব্রহ্মের অন্যান্য স্থানে এই তিনজনই এক সঙ্গে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ইহা ছাড়া ১৯৪৫ এর অনুমান

৬ই মার্চ্চ তারিখে ব্রহ্মে পোপা-পাহাড়ের নিকটে হরি সিংহ, দুলিচাঁদ, দারে দারিও সিংহ এবং ধরম সিংহকে হত্যার অভিযোগও লেঃ ধীলনের বিরুদ্ধে উপস্থিত করা হইয়াছে। এই ব্যক্তিদের হত্যাকার্য্যে লেঃ ধীলনকে সহায়তা করিবার অভিযোগও ক্যাপ্টেন সেহগলের বিরুদ্ধে আনীত হইয়াছে। আর গোলন্দাজ মহম্মদ হোসেনের হত্যাকার্য্যে খাজিনশাহ এবং আয়া সিংহকে সাহায্য করিবার অভিযোগেও ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ অভিযুক্ত হইয়াছেন।

আমরা নির্দ্দোষ

এই অভিযোগের উত্তরে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা নির্দ্দোষ। অতঃপর আসামীদিগকে তাঁহাদের কৌঁসুলীদের নিকটে বসিবার অনুমতি দেওয়া হয়। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও রক্ষা কমিটির অন্যান্য সদস্যদিগকে অভিবাদন জানাইয়া তাঁহারা আসন গ্রহণ করেন।

শুনানী মুলতুবীর জন্য আবেদন

তিন সপ্তাহের জন্য মামলার শুনানী বন্ধ রাখিবার জন্য আবেদন জানাইয়া শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই আদালতে একটি দরখাস্ত পেশ করেন। দরখাস্তে বলা হয় যে, ৩১শে অক্টোবরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আসামীরা আইনজ্ঞদের সহিত পরামর্শ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য আইনগত, মৌখিক ও লিখিত সাক্ষ্য প্রমাণ এত বেশী রহিয়াছে যে, উহার মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় বিষয় বাছাই করা ও কৌঁসুলীদের সহিত পরামর্শ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। সাক্ষীদের মধ্যে লেঃ জেনারেল পার্সিভাল, লেঃ কর্ণেল হাণ্ট (ইহারা দুইজনে বর্ত্তমানে ইংল্যাণ্ডে আছেন), মালয়ের মেসার্স গুহ ও রাঘবন, ব্রহ্মের জেনারেল আউন সাঙ্গ ও কয়েকজন জাপ কর্ম্মচারী রহিয়াছেন; ইহাছাড়া আসামী পক্ষের ১১২ জন

সাক্ষীর মধ্যে এখন-ও ৮০ জনের বেশী সাক্ষীর সহিত সাক্ষাৎ করা হয় নাই। মালয় অভিযান সম্পর্কে ফীল্ড মার্শাল ওয়েভেলের রিপোর্ট ও আরও বহু অত্যাবশ্যকীয় দলিল পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও এখনও আসামীপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলিও করা হয় নাই। ২৪শে অক্টোবর কর্ত্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নূতন অভিযোগপত্র উপস্থিত করেন। ফলে আরও বহু নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে। এই মামলার সহিত আইনের বহু জটিল প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে। মামলাটি অভিনব। সুতরাং আসামীপক্ষকে প্রস্তুত হইবার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া প্রয়োজন। এই কারণে শুনানী তিন সপ্তাহ স্থগিত রাখিবার জন্য আবেদন করা হইতেছে।

এডভোকেট জেনারেল স্যার এন, পি, ইঞ্জিনিয়ার বলেন যে, মুলতুবীর প্রস্তাবে তাঁহার আপত্তি নাই, আসামী পক্ষকে কোনরূপ বিব্রত করিবার ইচ্ছা সরকার পক্ষের নাই, তবে তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতা ও প্রধান সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর শুনানী স্থগিত রাখিলেই ভাল হয় বলিয়া তিনি মনে করেন। কারণ প্রধান সাক্ষীর নিকট হইতেই মামলার আসল তথ্যগুলি জানা যাইবে। শুনানী স্থগিতের কাল কমাইবার জন্য তিনি আসামী পক্ষের কৌঁসুলীকে অনুরোধ করেন।

শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই বলেন যে, এডভোকেট জেনারেলের প্রস্তাবে তাঁহার আপত্তি নাই, তবে স্থগিত রাখার সময় ন্যূনপক্ষে তিন সপ্তাহের কম হইলে চলিবে না।

মুলতুবী প্রস্তাব সম্পর্কে কর্ণেল ক্রিন

আদালতের গঠনতান্ত্রিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া বিচারক এ্যাডভোকেট কর্ণেল ক্রিন বলেন যে, ভারতীয় সৈন্য এ্যাক্ট অনুযায়ী অবশ্যই আদালতকে

একাধিকবার আদালত বন্ধ রাখিবার অধিকার দিয়াছে। কিন্তু উক্ত এ্যাক্ট আদালতকে আর একটি কর্ত্তব্যবোধও দিয়াছে। ফলে আদালত যদি আরম্ভ হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের যদি আদালতে উপস্থিত করা হয়, তাহা হইলে আদালতের কাজ দিনের পর দিন চলিতে থাকিবে। এই ধারার উপর যে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে, তাহার কারণ সামরিক আদালত আদৌ অসামরিক আদালত নহে। ইহার কার্য্যকাল সমস্ত বৎসরব্যাপী নহে। অপর পক্ষে যাঁহাদের লইয়া সামরিক আদালত গঠিত তাঁহাদের বিচারকের কার্য্য ব্যতীতও অন্য কাজ করিতে হয়। এই কারণে সামরিক আদালতে বিচার স্থগিত রাখা সব সময় সম্ভব নয়। কর্ণেল ক্রিন বলেন, সুবিচারের জন্য বিচার কার্য্য দ্রুত হওয়া প্রয়োজন। অপর পক্ষে এই বিচারে আসামী পক্ষের কৌঁসুলী বলিতেছেন যে, তিনি সাক্ষীদের সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করেন নাই। এই বিষয়ে অবশ্যই আসামী পক্ষে বহু কৌঁসুলী রহিয়াছে; তাঁহাদের নিকট আমি এইটুকু বলিব যে, সাক্ষীদের পরীক্ষায় তাঁহাদের নিকট সর্ব্বাধিক পরিশ্রম আশা করা হইতেছে। আমার মনে হয় এই পরিস্থিতিতে আমি হয়ত বলিব যে, নিশ্চয়ই কিছুদিনের বিচার স্থগিত রাখা হইবে; কতদিনের জন্য রাখা হইবে তাহা আপনাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। এ্যাডভোকেট জেনারেল প্রস্তাব করিয়াছেন যে, সরাসরি বিচার স্থগিত না রাখিয়া উদ্বোধনী বক্তৃতা ও প্রথম সাক্ষীর জেরার পর আদালত স্থগিত রাখা হউক। এ্যাভোকেট জেনারেল আরও ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, উক্ত ব্যবস্থার ফলে আসামীপক্ষের সুবিধা হইবে।

এই সময় আদালতের কার্য্যকলাপ পাঁচ মিনিটের জন্য বন্ধ থাকে। বিচারকালে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আত্মীয়গণ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আসনের নিকট ভিড় করেন। তাঁহারা দর্শকের আসনে বসিয়াছিলেন। সেহগলের

মাতা ও ভগ্নী সেহগলকে আলিঙ্গনবদ্ধ করেন। ধীলনের পত্নী স্বামীর সহিত মিলিত হন। সেগলের পিতা মিঃ অছরুরাম সেহগলের সহিত করমর্দ্দন করেন।

আদালতের অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হইলে প্রেসিডেণ্ট ঘোষণা করেন যে, এ্যাডভোকেট জেনারেল উদ্বোধন বক্তৃতা শ্রবণ এবং ফরিয়াদী পক্ষের প্রথম সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর শুনানী মুলতুবী রাখিবার আবেদন মঞ্জুর করিতে আদালত সম্মত আছেন। যাহা হউক, শুনানী কতদিন মূলতুবী রাখা হইবে সে সম্বন্ধে আদালত পরে বিবেচনা করিবেন।

মামলা আরম্ভের দিন দিল্লী পুলিশ লালকেল্লায় যাইবার সমস্ত পথ রোধ করিয়া রাখে। কেল্লায় এবং আদালত গৃহে, প্রবেশর পথ বৃটিশ সামরিক পুলিশ কর্তৃত রক্ষিত ছিল। এতদ্ব্যতীত নিকটস্থ তাঁবুতে অতিরিক্ত পুলিশ রিজার্ভ রাখা হইয়াছিল।

আদালতে প্রবেশকারীদিগকে কড়াকড়ি ভাবে পরীক্ষা করা হয়। সংবাদপত্রের সংবাদদাতা ও সাধারণ লোকদিগকে ছয় স্থানে পরীক্ষা করিবার পর আদালতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। কাহারও পক্ষে ছাতা কিংবা ছড়ি লইয়া আদালতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ায়, এক বৃদ্ধ ব্যক্তি তিনি সিঁড়ি উঠিলে তাঁহাকে তাঁহার ছড়ি সমর্পণ করিতে অনুরোধ করা হয়। দোতালায় আদালত কক্ষে গমনেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে নীচে সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির মুখে পর্য্যায়ক্রমে দণ্ডায়মান থাকিতে হইয়াছিল।

সামরিক আদালতের কর্ম্মচারিগণ সংবাদপত্রের সংবাদদাতাগণ এবং সাধারণ লোককে প্রধান প্রবেশঃপথ দিয়া আদালত কক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। আসামী তিনজনকে পিছনের প্রবেশ পথ দিয়া আদালতে আনা হয়। বাছাই করা সামরিক প্রহরিগন ব্যতীত অপর সকলের পক্ষে ঐ পথ বন্ধ। আদালত গৃহের পিছনের দিক এবং আদালত কক্ষে প্রবেশের, সিঁড়ি কাঁটা তারের বেড়া দিয়া ঘেরা ছিল।

আদালতে অধিবেশনের প্রথম দিনে দর্শকদের মধ্যে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, মাষ্টার তারা সিংহ, স্যার ফ্রেডারিক জেমস এবং সর্দার মঙ্গল সিংহ উপস্থিত ছিলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে "আজাদ হিন্দ ফৌজের দেশপ্রেমিক লোকদিগকে বাঁচাও" এবং "দেশপ্রেমিকগণ বিশ্বাস-ঘাতক নহেন" বাক্য লিখিত প্ল্যাকার্ডসহ বহুসংখ্যক ব্যক্তি লালকেল্লার বাহিরে প্রধান রাস্তায় সমবেত হয়। তাহারা রাস্তা দিয়া সামরিক ও সরকারী মোটর গাড়ী চলিয়া যাইবার সময়ে জয় হিন্দ' ধ্বনি করে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে সরকারপক্ষের যুক্তি

এডভোকেট জেনারেল স্যার এন পি এঞ্জিনিয়ার আদালতে তাঁহার উদ্বোধন বক্তৃতায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বিস্তৃত ইতিহাস বিবৃত করেন। সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স হইতে হস্তগত পর্য্যবেক্ষকদের রিপোর্ট, আজাদ হিন্দ ফৌজ যে সব যুদ্ধ করে তাহার রেকর্ড, অভিযুক্তদের দ্বারা প্রদত্ত আদেশনামা এবং কাপ্টেন শাহ নওয়াজ খানের ডায়েরী হইতে কতক অংশ আদালতে পাঠ করা হয়।

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উল্লেখ করিয়া স্যার নাসেরওয়ানজী অভিযুক্ত অফিসারত্রয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী বিবৃত করেন। ১৯১৪ সালের ২৪শে জানুয়ারী রাওলপিণ্ডিতে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ খানের জন্ম হয়। তিনি দেরাদুনে ইণ্ডিয়ান মিলিটারী একাডেমীতে শিক্ষালাভ করেন এবং ১৯৩৬ সালে রেগুলার কমিশনপ্রাপ্ত হইয়া ১৯৩৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে চতুর্দশ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টে নিযুক্ত হন। ক্যাপ্টেন পি কে সেহগল ১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাসে হোসিয়ারপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও ইণ্ডিয়ান মিলিটারী একাডেমীতে শিক্ষা লাভ করেন এবং ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দশম বালুচ রেজিমেণ্টে

নিযুক্ত হন। লেঃ জি এস ধীলনও দেরাদুনে ইণ্ডিয়ান মিলিটারী একাডেমীতে শিক্ষা গ্রহনান্তে ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে রেগুলার কমিশন প্রাপ্ত হন। লেঃ ধীলন ১৯১৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল লাহোর জেলার আলগনে জন্মগ্রহন করেন।

সরকার পক্ষের অভিযোগ

সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের প্রথম অভিযোগের উল্লেখ করিয়া স্যার নাসেরওয়ানজী বলেন যে, যুদ্ধ ঘোষণার পিছনে কি মনোবৃত্তি কার্য্য করিয়াছিল, তাহা ধর্তব্যের মধ্যে নহে। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যাহাকে দেশাত্মবোধ বলিয়া অভিহিত করেন, তাহার প্রেরণাতেই হউক বা অর্থের খাতিরেই হউক, তাঁহারা যাহা করিয়াছেন আইনের দৃষ্টিতে তাহা অপরাধ। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সর্বময় ও সর্বাবস্থায় সম্রাটের প্রতি অনুগত থাকিতে বাধ্য। তাঁহারা যেখানেই থাকুন না কেন, এই আনুগত্য তাঁহারা ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন না। এমন কি যুদ্ধবন্দী থাকাকালেও তাঁহারা এই আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ।

স্যার এন পি এঞ্জিনিয়ার অতঃপর বলেন—"অভিযুক্তরা তথাকথিত আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও যোদ্ধারূপে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রধানতঃ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার ও সৈন্যদের লইয়া গঠিত। নিম্নলিখিত বিভিন্ন অংশ লইয়া এই বাহিনী গঠিত হয়।

(১) হেডকোয়ার্টার্স, (২) হিন্দুস্থান ফিল্ড গ্রুপ, (৩) শার্দূল গেরিলা দল, (৪) স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ, (৫) সংবাদ-সংগ্রাহক দল, (৬) সংরক্ষিত সেনাদল।

প্রথম হিন্দুস্থানী ফিল্ড গ্রুপ এইগুলি লইয়া গঠিত ছিল:—হেডকোয়ার্টার্স, ১, ২ ও ৩নং পদাতিক বাহিনী আই এ এফ সি বাহিনী, একটি ভারী কামান বাহিনী, ১নং ইঞ্জিনিয়ার দল, ১নং সাঙ্কেতিক সংবাদ আদান-প্রদানকারী দল, ১নং চিকিৎসক বাহিনী ও ১নং টি পি টি কোম্পানী। শার্দূল গেরিলা বাহিনী,

গান্ধী গেরিলা রেজিমেণ্ট, আজাদ গেরিলা রেজিমেণ্ট ও নেহ্রু রেজিমেণ্ট লইয়া গঠিত ছিল।"

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সিঙ্গাপুরে আগমনের ২।৩ মাস পর ১৯৪৩ সালের নবেম্বর মাসের সমসময়ে আরও একটি গেরিলা রেজিমেণ্ট গঠিত হয়। শাহ নওয়াজ খাঁন ইহার সেনাপতি নিযুক্ত হন। অপর তিনটি রেজিমেণ্ট—গান্ধী-নেহরু ও আজাদ রেজিমেণ্ট একটি ডিভিশনে পরিণত হয়। পরে আরও দুইটি ডিভিশন গঠিত হয়। একটি ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের লইয়া ও অন্যটি সম্পূর্ণতঃ অসামরিক লোকদের লইয়া। এই অসামরিক লোকদের অধিকাংশই মালয়ের ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ দ্বার সংগৃহীত হইয়াছিল।

১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুর জাপানীদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। ১৭ই ফেব্রুয়ারী বহুসংখ্যক যুদ্ধবন্দীকে সিঙ্গাপুরের ফায়ার পার্কে মার্চ করাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে ১।১৪ ও ৫।১২ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট ছিল। ক্যাপ্টেন এম জেড কিয়ানী (ইনি পরে আজাদ হিন্দ ফৌজের জি ও সি হইয়াছিলেন) ইহাদের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। মেজর ফালওয়ারা নামক জনৈক জাপানী অফিসার সমবেত অফিসার ও সৈন্যদের সমক্ষে বক্তৃতা করেন।

অতঃপর এডভোকেট জেনারেল বলেন যে, জাপানী গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় সৈন্যদিগকে জাপানীদের পক্ষে আনয়নের জন্য ফুজিওয়ারাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কয়েকজন ভারতীয় অফিসারও ছিলেন। ১।১৪ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেন মোহন সিং এই সকল ভারতীয় অফিসারদের অন্যতম তিনি বলেন,—"আমরা একটি ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠন করিতে যাইতেছি। আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিব। আপনাদের সকলেরই ইহাতে যোগদান করা কর্তব্য।"

১৯৪২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা হয়।

ক্যাপ্টেন শাহ নাওয়াজ খান তখন নীশন যুদ্ধবন্দী ক্যাম্পের নায়ক ছিলেন। তিনি প্রায় দুইশত কিম্বা তিন শত অফিসারের সম্মুখে বক্তৃতা করেন,—ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর হেডকোয়ার্টার্সে এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাহারা সকলেই ভারতীয় এবং তাঁহাদের সকলেরই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। তিনি অতঃপর উপস্থিত শ্রোতাদিগকে অপরাপর যুদ্ধবন্দীদের নিকট প্রস্তাবটি ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে উপদেশ দেন।

১৯৪২ সালের জুন মাসে ব্যাঙ্ককে এক সম্মেলন হয়। ভারতীয় সৈন্যদলের বিভিন্ন রেজিমেণ্টের প্রতিনিধিসহ অপর কয়েকজন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সভার সভাপতিত্ব করেন রাসবিহারী বসু। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর একটিতে বলা হয় যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠিত হউক। ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ ইহার জন্য সৈন্য, অর্থ, খাদ্য ও পোষাক পরিচ্ছদ এবং জাপানী গভর্ণমেণ্ট আবশ্যক অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিবে।

সিঙ্গাপুরে যে সকল ক্যাম্পে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের রাখা হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে বিদাদারী ক্যাম্প, সেলেতার ক্যাম্প ও ক্রানজি ক্যাম্প অন্যতম। এই ক্যাম্পের যুদ্ধবন্দীর উপর নির্যাতন চালান হয় এবং জানাইয়া দেওয়া হয় যে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগ না দিলে নির্যাতন চালাইয়া যাওয়া হইবে। ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের যাহারা ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগ দেয়, তাহাদের অনেকে নির্যাতন হইতে রেহাই পাইবার জন্য যোগ দিয়াছিল।

ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদিগকে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করিবার জন্য কি ধরণের নির্যাতন চালান হয়, তৎসম্পর্কে স্যার নাসেরওয়ানজী বলেন যে, যাহারা ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকার করে তাহাদিগকে পৃথক কয়েদ-শিবিরে লইয়া যাওয়া হয়। তাহাদিগকে খাদ্য দেওয়া

হইত না এবং যদি বা খাদ্য দেওয়া হইত তাহা অত্যন্ত কদর্য্য ছিল। তাহাদিগকে মাটিতে শোয়াইয়া প্রায় ৫ ফুট লম্বা ও ১ ইঞ্চি পুরু লাঠি দিয়া প্রহার করা হইত। তাহাদিগকে পিপীলিকাপূর্ণ জমিতে বিছানা ও বস্ত্র ছাড়া শয়ন করিতে বাধ্য করা হইত। এইভাবে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর ভারতীয় সৈন্যরাই যুদ্ধবন্দীদের উপর নির্যাতন চালায়। এক সময় তাহারাও যুদ্ধবন্দী ছিল।

এডভোকেট-জেনারেল ক্রানজি-ক্যাম্পের ঘটনা বিবৃত করিয়া বলেন যে, ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে ৫।১৪ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের জমাদার ফতে খান ও ঐ রেজিমেণ্টেরই শিঙ্গারা সিং ১৪ জন সশস্ত্র শিখ সহ ক্রানজিক্যাম্পে আসেন। ঐ স্থানে প্রায় ৩ শত মুসলমান যুদ্ধবন্দী ছিল। তাহাদিগকে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিতে বলা হইলে তাহারা এই বলিয়া অস্বীকার করে যে, তাহারা তাহাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে না। তখন তাহাদের উপর গুলী চালান হয় এবং কয়েকজন মারা যায়। শিঙ্গারা সিং-এর সমভিব্যাহারী জনৈক শিখও নিহত হয়। তাহারা চলিয়া গেলে তিন জন জাপানী অফিসার ও তিন জন ভারতীয় জাতীয় বাহিনী অফিসার আসিয়া যুদ্ধবন্দীদিগকে বুঝান যে, ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগদানের আদেশ জাপানী গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আসিয়াছে এবং এই আদেশ তাহাদিগকে পালন করিতে হইবে। মুসলমান সৈন্যরা অস্বীকৃত হইলে তাহাদিগকে পৃথক কয়েদ শিবিরে লইয়া গিয়া নির্যাতিত করা হয়।

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিদাদরী-ক্যাম্পেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। যে সকল গুর্খা সৈন্য ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকার করে, তাহাদের উপর গুলী ও বেয়নেট চালান হয়। এমন কি হাসপাতালে পর্য্যন্ত আহত সৈনিকদিগকে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিতে বলা হয়।

১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে মোহন সিং ও জাপানীদের মধ্যে গোলযোগ আরম্ভ হয়। মোহনসিংকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং যে সকল যুদ্ধবন্দী আজাদ

হিন্দ্ ফৌজে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহাদের ব্যাজ ফিরাইয়া দেন; কিন্তু হেডকোয়ার্টারে কোন কোন অফিসার ব্যাজ রাখেন। ব্যবস্থা কমিটির বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও মোহনসিংকে কারারুদ্ধ করা হয়। ইহার পর আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিকাংশ অফিসারই ইহার সঙ্গে যুক্ত থাকিতে অসম্মত হন। ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে ভারতীয় সৈনিক কর্ম্মচারীদের এক সভা হয়। ব্যবস্থা কমিটি এই সভা আহ্বান করেন এবং তাঁহাদের নিকট কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়।

একটি প্রশ্ন—আপনি আজাদ হিন্দ্ ফৌজে থাকিতে চান কি না? যাঁহারা অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, তাহাদিগকে ১৩ই ফেব্রুয়ারী শ্রীযুত রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলা হয়। কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার পূর্বেই তাহাদিগকে এক মুদ্রিত পুস্তিকা দেওয়া হয়। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের প্রেসিডেন্টরূপে শ্রীযুত রাসবিহারী বসুই ইহা প্রচার করেন। এই পুস্তিকায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এই কথা ছিল—আপনারা সকলেই জানেন, বৃটেনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় পৌছিয়াছে। বৃটিশকে ভারত ত্যাগে বাধ্য করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং বর্তমান মীমাংসার কোন আশা নাই। আমাদের কর্তব্য এখন সুস্পষ্ট। যাহারা আজাদ হিন্দ ফৌজ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের কি হইবে; আপনারা জানিবার জন্য ব্যগ্র—কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ইহাদের ব্যাপারে আমার কোন হাত থাকিবে না। জাপানীদের পক্ষে আমি কোন কথা বলিতে পারি না। তাঁহারা যাঁহাদের বন্দী তাঁহারা তাঁহাদের লইয়া কি করিতে চান, আমি বলিতে পারি না। যে সকল অফিসার তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করিতে সম্মত নহেন, আজ ১১-৩০ মিনিটে আমার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবেন। আমি তাঁহাদিগকে পৃথক করিতে চাই।

১৯৪৩ সনের জানুয়ারী মাসের পরে আজাদ হিন্দ ফৌজে আবার লোক সংগ্রহ আরম্ভ হয় এবং অনেক যুদ্ধবন্দী ইহাতে যোগদান করেন এবং অনেককে যোগদানে বাধ্য করা হয়।

১৯৪৩ সনের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ পোর্ট ডিক্সনে ছিলেন। তিনি যুদ্ধবন্দী অফিসারদের নিকট বক্তৃতা দেন তিনি বলেন, ক্যাপ্টেন মোহনসিংএর আজাদ হিন্দ ফৌজ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অন্য একটি আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হইতেছে। তিনি বলেন, আমাদের উপর এখানে দুর্ব্যবহার করা হইতেছে; কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিলে আমাদের উপর যথাযোগ্য ব্যবহার করা হইবে এবং খাদ্য পাইব। তিনি এই কথা যুদ্ধবন্দীদের জানাইতে বলেন এবং সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান কেন্দ্রে পাঠাইয়া দিবার জন্য ক্যাম্প কমাণ্ডাণ্টের নিকট একটি সেচ্ছাসেবক তালিকা দিতে বলেন; কিন্তু কেহই নাম দেয় না।

১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে পোর্ট সুইটেনহামে শাহ নওয়াজ আর যুদ্ধবন্দীদের কুচকাওয়াজের সময় তিনি একটি বক্তৃতা করেন। বৃটিশকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য তিনি সকলকে সেচ্ছাসেবক শ্রেণীভুক্ত হইতে বলেন। তিনি বলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজে তাহারা হাত খরচা বাবদ সামান্য কিছু পাইবেন। কিন্তু ভারতে স্বাধীনতা অর্জিত হইলে তাঁহাদের বেতন পুরাতন হার অনুযায়ী হইবে। কিন্তু এবারে কেহ নাম দেয় না।

লেঃ ধীলনও অনুরূপ প্রচেষ্টায় রত হন। এক সভায় মেজর ধারা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। মেজর ধারা প্রথমে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের জন্যই আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হইয়াছে। ভারতে পৌছিয়া জাপানীগণ যদি কোনরূপ অসৎ নীতি অবলম্বন করেন,

তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গেও যুদ্ধ করিবেন। ভারত তখন জাপানের বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধারণ করিবে।

লেপ্টেন্যাণ্ট ধীলন

এক বিদ্রোহী যুদ্ধবন্দী শিবিরে বক্তৃতা উপলক্ষে লেপ্টেন্যাণ্ট ধীলন বলেন, সিঙ্গাপুরে ও জিন্দ্রায় সমস্ত ভারতীয় যুদ্ধবন্দী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়াছেন আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারত হইতে ইংরাজকে বিতাড়িত করিবে। যদি তাহারা ইহাতে সফল না হন, তাহাদের ভয়ের কিছুই নাই। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপরই সমস্ত দোষ পড়িবে। অন্য কাহারও শাস্তি হইবে না।

স্যার এন পি ইঞ্জিনিয়ার বলেন, আসামীগণ যাহা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, তাহার ফলাফল বিচার করিতে গিয়া তৎকালীন অবস্থা বিচার করিতে হইবে। মালয় ও সিঙ্গাপুরে বৃটিশ বাহিনী পরাজয় মানিয়া লইয়াছে। বন্দীশিবিরে যুদ্ধবন্দীদের প্রতি ব্যবহার পূর্বেই বলা হইয়াছে। ভারতীয় সৈন্যগণ বিনা বিচারে তাহাদের অফিসারের নির্দেশ মানিয়া লইতে অভ্যস্ত। আসামীগণ আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য লোক সংগ্রহ করিতেছিলেন। তাঁহারা অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবহারের প্রলোভন দেখাইয়াছেন এবং প্রচ্ছন্ন ভয়ও দেখাইয়াছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ না দিবার ফল ছিল অনশন ও অত্যাচার। এই অবস্থায় ভারতীয় বাহিনীর বহু সৈন্য আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়াছেন তাহা বিচিত্র নহে।

আসামীগণ আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য লোক সংগ্রহ করিয়াছেন, আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রতিষ্ঠানের সংগঠনে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে নির্দেশ দিয়াছেন ও ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং নিজেরাও যুদ্ধ করিয়াছেন। এই কার্য্য তাঁহারা পূর্বকল্পিত পরিকল্পনা অনুযায়ী করিয়াছেন।

জাপানীরা যে সমস্ত বৃটিশ অস্ত্রশস্ত্র দখল করিয়াছিল নিজেদের ট্রেণিং ও সংগ্রামে ইহারা তাহাই ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহাদের পরিধানে ভারতীয় সৈনিক ও অফিসারের পোষাকই ছিল। ইহা ভিন্ন তাঁহারা আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যাজ ব্যবহার করিতেন।

লেপ্টন্যাণ্ট নাগকে ১৯৪২ সনে আজাদ হিন্দ ফৌজ অ্যাক্ট গঠন করিতে বলা হয় এবং তিনি উহা করেন। লেপ্টন্যাণ্ট নাগও আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়াছিলেন। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী-আইন অনুযায়ী এই আইন গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে শাস্তি হিসাবে বেত মারা একটি ধারা আছে। প্রতি সপ্তাহে ৬টি এবং সর্বসমেত ২৪টি বেতের বেশী নয়। ১৯৪৩ সালের জুন মাসে স্থির হয় যে সৈন্যবাহিনীর কম্যাণ্ডার এবং মিলিটারী ব্যুরোর ডিরেক্টরগণ সৈন্য ও ননকমিশনড্ অফিসারের শৃঙ্খলা-রক্ষার ব্যাপারে বেত মারিতে পারিবেন।

১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথমতঃ যুদ্ধবন্দীদের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থার জন্যই 'ব্যবস্থা কমিটি' গঠিত হয়। এই ব্যবস্থা কমিটিই প্রচারকার্য্য চালাইত। ১৯৪৩ সালের মধ্যভাগে 'ডিরেক্টরেট অব মিলিটারী ব্যুরো' গঠিত হয়। সেহগল ছিলেন মিলিটারী সেক্রেটারী এবং শাহ নওয়াজ—চীফ্ অফ দি জেনারেল ষ্টাফ।

১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের এবং অসামরিক জনসাধারণের এক সাধারণ সভা হয়। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এই সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন। ইঁহারা, আজাদ হিন্দ ফৌজ যে সকল অঞ্চল দখল করিয়াছেন, তাহা শাসন করিবেন। তিনি মন্ত্রিদের নামও ঘোষণা করেন। ইহার মধ্যে শাহ নওয়াজও আছেন। ১৯৪৪ সালের ৩০শে নভেম্বর অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের একটি যুদ্ধ সমিতি গঠিত হয়। ক্যাপ্টেন সেহ্গলের মারফৎ

ইহার একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার জন্য লেপ্টন্যাণ্ট নাগকে দেওয়া হয়।

১৯৪৫ সালের মার্চ মাসের দিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের বহু সৈন্য ও অফিসার বৃটিশ বাহিনীতে যোগ দিতে থাকে। ইহা নিবারণ করিবার জন্য শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু এই মর্মে এক নির্দেশনামা জারী করেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের কোন সৈন্য বা অফিসার ভীরুর ন্যায় ব্যবহার করিলে অন্য সৈন্যগণ তাঁহাকে বন্দী করিতে পারিবেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা করিলে গুলী করিতে পারিবেন।

এডভোকেট-জেনারেল বলেন, এই মামলায় মৌখিক সাক্ষ্য ও দলিল-পত্রের প্রমাণ উপস্থিত করা হইবে। বিভিন্ন সময়ে ব্রহ্মদেশে বৃটিশ বাহিনীর হাতে বহু দলিলপত্র আসিয়াছে। এই সমস্ত যথাযোগ্য স্থানে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং পরে দিল্লী হেডকোয়ার্টারে আসিয়াছে। এই সকল দলিলে আসামীগণের সাক্ষর আছে।

এই সকল দলিলপত্রের মধ্যে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজের সাক্ষরিত একখানি চিঠি আছে। ব্রহ্মদেশে আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যবস্থা সম্পর্কে ১৯৪৩ সালের আগষ্ট মাসে প্রথম ডিভিসন আজাদ হিন্দ ফৌজের হেডকোয়ার্টারে লিখিত এই পত্র। পত্রের তারিখ ৮ আগষ্ট '৪৩ (জপানী বৎসর 2603)।

এই পত্রে বলা হইয়াছে যে, ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে যখন আক্রমণ সুরু হইবে, কিছু ভারতীয় সৈন্য তাহাদের দলে যোগ দিবে এবং অন্য এক-দলকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করা হইবে। ভাষার অসুবিধার জন্য জাপ অগ্রগামী দল এই দুই শ্রেণীর ভিতরে পার্থক্য করিতে পারে না। প্রচারে ও সুবিধার জন্য এই সকল লোকের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে তাহাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে। ইহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হইবে।

(১) সমস্ত ঘটনা জ্ঞাত হইয়া যাহারা তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিতে আসিয়াছেন,

(২) যাঁহারা অবস্থা সম্পর্কে জানেন না অথচ তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিতে চান; (৩) যাঁহারা তাহাদের সঙ্গে যোগ দিবেন না। প্রথম দুই শ্রেণীকে সংগঠিত করিতে হইবে, তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র দিতে হইবে। ৩য় দলকে যুদ্ধ বন্দী করিয়া জাপানের হাতে সমর্পণ করিতে হইবে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ নির্দেশনামা

১৯৪৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের এক নির্দেশনামা মিলিটারী সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন সেহ্‌গলের আদেশে প্রচারিত হয়। উক্ত নির্দ্দেশ নামায় অস্থায়ী আজাদ হিন্দ ফৌজকে বিভিন্ন কার্য্যের জন্য কিরূপ সম্মানে ভূষিত করা হইবে তাহাই বলা হয়। ইহাতে আরও বলা হয়, কোন বৃটিশ বা মার্কিণ বন্দী বা হত্যা করিতে পারিলে "তজ্মা-ই-শত্রুনাশ' সম্মান দেওয়া হইবে।

১৯৪৫ সালের ২রা এপ্রিল ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ মেজর কাওয়াবারাকে টেলিফোন তার কাটা এবং শত্রুর সাঁজোয়া বাহিনী ও লরীপূর্ণ সৈন্য আমদানী সম্পর্কে জানান।

১৯৪৫ সালের ১০ই এপ্রিল ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ ৬০৫, ৭৪৭ এবং ৮০১ ইউনিট-এর প্রতি এক নির্দ্দেশনামা জারি করিয়া জানান, সৈন্যবাহিনীকে বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতে হইবে, ডিভিসনাল হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ থাকিবে না। শৃঙ্খলা ভঙ্গ বা অবাধ্যতামূলক অপরাধের জন্য শাস্তি দিবার ভার রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডারের উপর দেওয়া হয়।

ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজের ডায়েরী

ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজের ১৯৪৪ এবং ১৯৪৫ সালের ডায়েরী সরকারপক্ষের হাতে আসিয়াছে। ডায়েরী ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজের নিজের হাতে লেখা;

উক্ত ডায়েরীতে দেখা যায় ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ ১৯৪৪ সালের ২৭শে জানুয়ারী জাপ বাহিনীর সুপ্রীম কমাণ্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ভারত আক্রমণের নির্দ্দেশ পান ; ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি জেনারেল মোতাগুচি (উত্তর ব্রহ্ম জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজের ৩০শে মার্চ তারিখের ডায়েরীতে এইরূপ লেখা আছে : "কেনেডি পিক হইতে বুবি ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার প্রথম সংবাদ মোটেই শুভ নহে। জাপানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজের সেরা সৈন্যদের মজুরের কাজ করাইয়াছে। এ সম্পর্কে কিমেওয়ারীর সহিত আলোচনার জন্য আমি অদ্য হাকে যাইতেছি। এইরূপ ব্যবহারের কি পরিণতি হইবে জানি না।" ১৯৪৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখের আর একটি লেখায় প্রকাশ, ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ প্রতিরোধকারী বাহিনীর অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উক্ত বাহিনীর কার্য্যের পরিবর্তন হইয়াছে। তাহারা এখন "ইম্ফলের" যুদ্ধে যোগদানের জন্য যাইতেছে। এই বাহিনীর অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন শাকনোওরামকে, তিনি আসন্ন যুদ্ধে কোন্ ঘাটের ভার লইবেন-তাহা বাছিয়া লইতে বলায় ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ "ইম্ফল" আক্রমণ করিবেন বলিয়া জানান।

অনাহারে আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকদের মৃত্যু

১৯৪৪ সালের ৭ই জুলাই তারিখের জরুরী—"আমি এবং কিমেওয়ারির নির্দ্দেশ গ্রহণের জন্য জেনারেল হেডকোয়ার্টারে গিয়াছিলাম। লোকেরা খাদ্যদ্রব্য পাইতেছে না। ৪ জন গাড়োয়ান অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আমি এবং রামস্বরূপ খাদ্যসামগ্রীর একটা কিছু ব্যবস্থা করার জন্য হিকারী কিকানের নিকট গিয়াছিলাম, মনে হইল তাহারা কিছুই করিবে না। আমার

লোকদের ইচ্ছা করিয়া না খাইতে দিয়া মারিয়া ফেলার পশ্চাতে যে কি উদ্দেশ্য আছে জানি না।

১৫ই জুলাই তারিখের ডায়েরীতে প্রকাশ, অনাহারে বহুলোকের মৃত্যু হইতেছে। কেহ কেহ আত্মহত্যা করিতেছে। জাপানীরা কিছুই সাহায্য করিতেছে না।

৮ই আগষ্ট তারিখের ডায়েরী—"কিমেওয়ারীর জবাব সহ য়ুওয়া হইতে প্যারার প্রত্যাবর্তন। তাঁহার নিকট টাকা বা অন্য কোন প্রকার সাহায্য লাভের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। তিনি পরামর্শ দিয়াছেন যে, তেরাযুনে আমাদের যে সমস্ত লোক অসুস্থ অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাদের আত্মহত্যা করা উচিত।"

এডভোকেট জেনারেল আরও বলেন, "১৯৪৫ সালের ডায়েরীও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখের একটি লেখায় প্রকাশ, ঐদিন রাত্রিতে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিতেছেন। তিনি মধ্য রাত্রে পোপা অভিমুখে রওনা হন। নেতাজী তাঁহাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে সর্বপ্রকার নির্দ্দেশ দেন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে নেতাজী বলা হয়।"

১৯৪৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ায়ারী তারিখের ডায়েরীতে বলা হইয়াছে যে, ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ ভোর পাঁচটায় কুয়াক পাদাউঙ্গে পৌঁছিয়াছে। ইন্দো গ্রামে তিনি লেঃ ধীলনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রায় পাঁচ শত দলছাড়া লোককে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। লক্ষণ মোটেই ভাল নহে। লেঃ ধীলন শাহ নওয়াজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বেলা সাত ঘটিকায় তিনি রিয়াজ এবং শেয়ালের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ডায়েরীতে প্রকাশ, শাহ নওয়াজ ইরাবতী বরাবর শত্রুকে ধাওয়াইযা লইয়া যাওয়ার নির্দেশ পাইয়াছেন। তিনি আত্মরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা করেন এবং অফিসারদের নিকট

বক্তৃতা করেন। ক্যাপ্টেন সেহগল ও ক্যাপ্টেন ধীলনকে যুদ্ধ আরম্ভের নির্দেশ দেন। ঐ দিনের ডায়েরীতে আরও প্রকাশ, রাজ, মদন, সারওয়ার এবং দে'র দলত্যাগের সংবাদ তিনি পান। ইহা অত্যন্তই দুঃখের ব্যাপার।

১৮ই এপ্রিল—বৃটিশরা তাউছুইঙ্গলি দখল করিয়াছে। জাপানীরা এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকেরা পুনরাক্রমণ করিতেছে। ১৯শে এপ্রিল—বৃটিশ ট্যাঙ্ক বহর মাগউইয়ে ব্যূহ ভেদ করিয়াছে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাধা দান করা হইবে না।

৫ই মে ১৯৪৫ জাপানীদের আর আজাদ হিন্দ ফৌজের কোন প্রয়োজন নাই। প্রোমের অফিসার প্রভৃতিকে সরাইয়া লওয়া হইতেছে। ফৌজের মধ্যে শৃঙ্খলা হ্রাস পাইয়াছে। নৈতিক দৃঢ়তাও কমিয়া গিয়াছে—নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে। ১৩ই মে, ১৯৪৫—বৃটিশদের সম্পর্কে সমস্ত সংবাদ পাইয়াছি। মনে হইতেছে আমরা সম্পূর্ণরূপে বিছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। সরিয়া পড়ারও কোন উপায় নাই। সন্ধ্যা ৭টায় গ্রামটি পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গল অভিমুখে যাত্রা করিলাম। তথায় বাহিনীর লোকদের সমস্ত সংবাদ দিলাম। অধিকাংশ লোকই যুদ্ধ বন্দী হইবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

শাহ নওয়াজের ডায়েরীর শেষ দিন

১৯৪৫ সালের ১৭ই মে তারিখেই শাহ নওয়াজের শেষ ডায়েরী লেখা। ঐদিনকার ডায়েরী তিনি লিখিয়াছেন—প্রায় মধ্যরাত্রে একটি গ্রামে প্রবেশ করিবার সময়ে ২।১ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের লোকেরা ১৫ গজ দূর হইতে প্রচণ্ড-ভাবে গুলীবর্ষণ করিতে থাকে। অসামরিক পথপ্রদর্শক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। আমার ব্যাগটি হারাইয়া ফেলি। একটি জঙ্গলে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। বেলা আটটার সময়ে পুনরায় রওনা হইলাম। কিন্তু দেখিলাম চারিদিকে রাস্তা অবরুদ্ধ। প্রায় সন্ধ্যা ৬টায় ২।১ নং পাঞ্জাব

রেজিমেণ্ট আমাকে গ্রেপ্তার করে। পেগুর হেড কোয়ার্টারে লইয়া যাওয়া হয় ; তারপর কারাগারে।

ক্যাপ্টেন সেগলের স্বাক্ষরযুক্ত বা হাতের লেখা-সহ দলিলপত্রের মধ্যে এইগুলি প্রধান—১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ক্যাপ্টেন সেহ্গল আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র বসুর একটি বিশেষ নির্দেশ সমস্ত ইউনিটগুলির নিকট প্রেরণ করেন। সমস্ত ইউনিটের অধিনায়কদের তাঁহাদের অধীনে সৈন্যদের কুচকাওয়াজের জন্য সমবেত করাইবার নির্দেশ দেন এবং আরাকান রণাঙ্গন সম্পর্কে সমস্ত সংবাদ সৈন্যদের জানাইতে বলেন।

এই বিশেষ নির্দেশে বলা হয় যে, বহুদিন প্রতীক্ষার পর দিল্লী অভিযান আজ আরম্ভ হইয়াছে। দৃঢ় সংকল্প লইয়া এই অভিযান চালাইয়া যাইতে হইবে। আরাকান পর্বতে যে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উড্ডীন রহিয়াছে যতদিন না সেই পতাকা দিল্লীর লাট প্রাসাদে উত্তোলন করা যাইতেছে এবং যে পর্য্যন্ত আমরা সেই প্রাচীন দুর্গে বিজয় উৎসবে মত্ত হইতে না পারিতেছি—ততদিন পর্য্যন্ত এই অভিযান চলিবে—অবিরাম গতিতে। "দিল্লী চলো"—এই ধ্বনি তাঁহাদের গ্রহণ করিতে বলা হয়।

ক্যাপ্টেন সেহ্গলের ডায়েরীর একদিনকার লেখায় প্রকাশ, পোপা পর্বত রক্ষার ভার তাঁহার উপর ছিল। ১৭ই ফেব্রয়ারী তারিখে তিনি লিখিতেছেন যে, ক্যাপ্টেন ধীলনের রণাঙ্গন বরাবর শত্রুরা ইরাবতী নদী অতিক্রম করিয়াছে। ধীলনের বাহিনী প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। বিশৃঙ্খলা বা নৈরাশ্যের ভাব দেখা দিয়াছে। কর্ণেল আজিজ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ সাময়িকভাবে তাঁহার বাহিনীর পরিচালনা ভার গ্রহণ করিতেছেন।

১লা মার্চ, ১৯৪৫-এর ডায়েরী ; এইরূপ যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে অস্বীকার করায় একজন অফিসারকে প্রাণদণ্ড দিতে হইয়াছে। কি করুণ! মানুষের জীবন কিভাবে নষ্ট হইতেছে! ২রা মার্চ, ১৯৪৫ এখন পর্য্যন্ত এই অফিসার ফিরিয়া

আসে নাই। নিশ্চয়ই তাহারা শত্রু পক্ষে যোগ দিয়াছে—কি বিশ্বাসঘাতক! এখন হইতে আমাকে সম্পূর্ণ নির্দয় হইতে হইবে। আমি এই মর্মে নির্দেশ জারী করিয়াছি যে, কাহারও গতিবিধি সন্দেহজনক হইলেই তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে। ১৯শে মার্চ, ১৯৪৫—ধীলনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার অনুগামীরা বীরত্বের সহিত অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহারা একটি পর্বত তিনবার আক্রমণ করিয়া দখল করিয়াছেন এবং প্রায় তিনশত শত্রুকে মারিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

ক্যাপ্টেন সেহ্গলের ডায়েরীর শেষ দিন

১৯৪৫ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে ক্যাপ্টেন সেহ্গল শেষবারের মতন ডায়েরী লেখেন। উহা এইরূপ—ওয়েলঞ্জ সেকসন রোড রক্ষার জন্য আমি কেবল একটি বাহিনী মোতায়েন রাখিব। অবশিষ্ট সৈন্যরা ধীলন না আসিয়া পৌছান পর্য্যন্ত পোপোয়ায়া অঞ্চলেই থাকিবে। আশা করিতেছি আমি তাঁহাদের সহিত আবার মিলিত হইতে পারিব।” ক্যাপ্টেন সেহ্গল ২৮শে এপ্রিল আত্মসমর্পণ করেন।

অভিযুক্তরা সর্বশেষ যুদ্ধ করেন, কায়াক পাদাউঙ্গের উপকণ্ঠে এবং পোপা অঞ্চলে। অভিযুক্তরা সকলেই সেই সময়ে ঐ অঞ্চলে ছিলেন। তাঁহারা নিজেরাই যুদ্ধ করিতেছিলেন।

অতঃপর এডভোকেট জেনারেল অফিসারগণ যে কয়েকটি ছোট খাট ব্যাপারের সহিত জড়িত ছিলেন সে সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেন।

হত্যার অভিযোগ সম্পর্কে বলিতে গিয়া এডভোকেট জেনারেল বলেন যে, লেঃ ধীলন চারজন সিপাহিকে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন এবং ক্যাপ্টেন সেহ্গল প্ররোচিত করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

এই ৪ ব্যক্তি আজাদ হিন্দ ফৌজের সিপাহি ছিল। পূর্বে ইহারা ভারতীয় সেনা বাহিনীর অধীনে কাজ করিত। এই ৪ জনকে হত্যা করিবার নির্দেশ দেন ক্যাপ্টেন সেহ্‌গল এবং লেঃ ধীলন ৬ই মার্চ তারিখে ইহাদের গুলী করিয়া মারেন। ইহা প্রমাণ করিবার মতন উপযুক্ত দলিলপত্র আছে। কিন্তু এখন মৌখিক ভাবে প্রমাণ করা হইতেছে। ১৯৪৫ সালের ৬ই মার্চ তারিখে ৪ ব্যক্তিকে হাত পিছনের দিকে বাঁধিয়া একটী খানার নিকট লইয়া যাওয়া হয় এবং তাহার ভিতর তাহাদের বসিতে বলা হয়। লেঃ ধীলন একটি বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, এই খানার ভিতর যে কয় ব্যক্তি বসিয়া রহিয়াছে তাহারা পালাইয়া গিয়া বৃটিশদের সহিত যোগ দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু টহলদার বাহিনী তাহাদের ধরিয়া ফেলেন। এই কারণে ইহাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর লেঃ ধীলন ইহাদের গুলী করার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের আহ্বান করেন। হিদায়েতুল্লা কানুরাম এবং শের সিং নামক তিন ব্যক্তি আগাইয়া আসেন। হিদায়েতুল্লা এবং কানুরামের হাতে বন্দুক এবং শের সিংএর হাতে পিস্তল ছিল। তারপর লেঃ ধীলন খানা হইতে ১ম ব্যক্তিকে ডাকেন। তিনি একটা ক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সহিত যোগদানের জন্য যখন এই ব্যক্তি চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময়ে ইহাকে ধরিয়া ফেলা হয়। এইজন্যই ইহাকে গুলী করা হইতেছে।

লোকটি বলে যে তাহার একটি অনুরোধ আছে। লেঃ ধীলন বলেন যে, কোন অনুরোধেই কর্ণপাত করা হইবে না। অতঃপর তিনি গুলী চালাইবার আদেশ দেন এবং তদনুসারে তাহাদের উপর গুলীবর্ষিত হয়। চারিজনেই মাটিতে পড়িয়া যায়। কিন্তু তখনও তাহাদের প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই। লেঃ ধীলন শের সিংকে তাহার পিস্তল দ্বারা ইহাদের প্রত্যেককে গুলী করিবার আদেশ দেন। শের সিং আদেশ পালন করে। ইহার পর মৃতদেহগুলিকে পরিখার ভিতর গোর দেওয়া হয়।

প্রথম সামরিক আদালতে

ভর বিচারক মণ্ডলী

হত্যাকাণ্ডে সহায়তার অভিযোগ

অতঃপর এডভোকেট জেনারেল ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজের বিরুদ্ধে খাজিন শা ও আয়া সিং নামক দুই ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করার অভিযোগ বিবৃত করেন। তিনি বলেন, বিদ্রোহিদের সঙ্গে মিশিয়া বিদ্রোহ করা কিম্বা শত্রুপক্ষে যোগদান করিয়া আক্রমণাত্মক কার্যে লিপ্ত হওয়ার অর্থই দেশদ্রোহী হওয়া। দেশদ্রোহিতায় কোন অধিকার জন্মে না কিম্বা পরবর্ত্তী অপরাধজনক কার্য্যকলাপের দায়িত্ব হইতেও উহা কোন লোককে রেহাই দেয় না। এমন কি কোন দেশদ্রোহীর আজ্ঞা পালন করিলেও, উহা দেশদ্রোহিতারই সামিল হয়।

এইরূপ বলা হইয়াছে যে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর আইন অনুসারে যে সকল কাজ করা হইয়াছে, উহার জন্য আইনগতভাবে আসমীদের কোন কৈফিৎ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই আদালতে কিম্বা ভারতের কোন আদালতেই উক্ত আইন স্বীকৃত হইতে পারে না। উক্ত আইনের বলে ক্ষমতা গ্রহণ করা প্রথমাবধিই বে-আইনী হইয়াছে। উক্ত আইন অনুসারে গঠিত ট্রাইবুন্যালের বিচারে যাহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহারাও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধের জন্য দণ্ডনীয়। ভারতীয় জাতীয় বাহিনী আইন অনুসারে প্রদত্ত সমস্ত আদেশ এবং উক্ত আইনের ফলে গঠিত ট্রাইব্যুনাল অনুমোদিত নহে বলিয়াই যাঁহারা এই আইন অনুসারে কাজ করিয়াছেন তাঁহারা রেহাই পাইতে পারেন না। অতঃপর সরকার পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ আরম্ভ হয়। মিলিটারী প্রসিকিউটর অভিযুক্ত ব্যক্তিত্রয়ের চাকুরীর রেকর্ড দাখিল করেন। স্যার এন পি ইঞ্জিনিয়ার সরকার পক্ষের প্রথম সাক্ষী লেঃ কর্ণেল নাগের জবানবন্দী গ্রহণ করেন। সাক্ষী তাঁহার জবানবন্দীতে বলেন যে, ১৯২০ সালের আগষ্ট মাসে তিনি বেঙ্গল জুনিয়র সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন এবং ১৯৩৪।৩৫ সালে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন।

১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি বিমানবহরে কমিশন লাভ করেন। জাপানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় তিনি পেনাংয়ে ছিলেন। সেখান হইতে তিনি সিঙ্গাপুরে যান। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সিঙ্গাপুরে বিমান হানায় তিনি আহত হন। তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠান হয় এবং তথা হইতে তাঁহাকে একটি যুদ্ধ বন্দিশিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে থাকার সময় "বৃটিশ শাসন হইতে ভারতের মুক্তির জন্য সংগ্রাম চালাইবার" উদ্দেশ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের আন্দোলন চলিতেছে বলিয়া শুনিতে পান। ১৯৪২ সালে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সে সময় সাক্ষী তাহার চক্ষু পরীক্ষা করাইয়া চশমা লওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন।

লেঃ নাগ অতঃপর বলেন যে, আজাদ হিদ ফৌজের নেতৃবৃন্দ যখন জানিতে পারিলেন সে অসামরিক জীবনে তিনি একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন তাহারা তাঁহাকে আজাদ হিন্দ ফৌজের আইন বিভাগে নিযুক্ত করেন। আইন বিভাগে কাজ করার সময় তিনি ভারতায় জাতীয় বাহিনীর আইন প্রণয়ন করেন।

স্যার এন পি ইঞ্জিনিয়ার আজাদ হিন্দ ফৌজের জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং মোহন সিংহের কয়েকটি নির্দ্দেশনামা পাঠ করেন। ঐগুলি ১৯৪২ সালে প্রদত্ত হইয়াছিল। উহা দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তিত্রয়কে উচ্চপদে উন্নীত করা হয়। তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন এম জেড কিয়ানীর একটি নির্দ্দেশনামাও পাঠ করেন। উক্ত নির্দ্দেশনামায় ভারতীয় যুদ্ধ বন্দীদের ভিতর হইতে একটি বাহিনী সংগঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে।

লেঃ নাগ বলেন যে, হিন্দুস্থান ফিল্ডগ্রুপ, গেরিলা গ্রুপ, স্পেশ্যাল সার্ভিস গ্রুপ, ইনটেলিজেন্স গ্রুপ এবং সংরক্ষিত দল লইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত। তিনি বলেন যে, ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যসংখ্যা ছিল দশ হাজার।

শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই: আমি জানিতে চাহি, সাক্ষী কি এ সম্বন্ধে সঠিক

তথ্য রাখেন, কিম্বা ইহা তাহার অনুমান মাত্র। লেঃ নাগ বলেন যে, তিনি সরকারীভাবে অবশ্য উহা জানেন না। মোটামুটি সাধারণ জ্ঞান হইতে তিনি ঐ সংখ্যার কথা বলিতেছেন।

শ্রীযুত দেশাই : আমি শুধু এইটুকু চাহি যে আপনি নিজে যাহা জানেন, তাহার সহিত অপরের নিকট শোনা কথা জড়াইয়া ফেলিবেন না। আরও কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে লেঃ নাগ আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা যে সকল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিত, তাহার বর্ণনা দেন। তিনি বলেন যে, রাইফেল, সঙ্গীন, পিস্তল কতকগুলি সাজোয়া গাড়ী ও সৈন্যবাহী গাড়ী, ইহাই ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের অস্ত্রশস্ত্র। এইগুলির কিছুই জাপানীদের নহে, সমস্তই বৃটিশদের। তাহাদের পোষাক ভারতীয় সৈন্যদের অনুরূপ। আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বতন্ত্র ব্যাজ ছিল। কতকগুলি ব্যাজ সাক্ষ্য হিসাবে আদালতে প্রদর্শিত হয়।

ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের কর্মপরিষদের সদস্যদের সম্পর্কে লেঃ নাগ বলেন যে, শ্রীযুত রাসবিহারী বসু উহার সভাপতি ছিলেন। মিঃ মেনন, মিঃ রাবেন ও মিঃ বোহা উহার অ-সামরিক সদস্য এবং ক্যাপ্টেন মোহন সিং, লেঃ কর্ণেল গিলানী ও লেঃ ভোসলে সামরিক সদস্য ছিলেন। ১৯৪২ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি দলকে ব্রহ্মে প্রেরণ করা হয়। ১৯৪২ সালে ডিসেম্বর মাসে ক্যাপ্টেন মোহন সিং জাপানীগণ কর্তৃক ধৃত হন এবং তিনি যে নির্দ্দেশ রাখিয়া যান, তদনুসারে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। ইহার অত্যল্পকাল পরে লেঃ কর্ণেল ভোসলেকে চেয়ারম্যান করিয়া ক্যাপ্টেন কিয়ানী লেঃ কর্ণেল লোকনাথনও মেজর প্রকাশচাঁদকে সদস্যরূপে গ্রহণ করিয়া একটি পরিচালক কমিটি গঠিত হয়।

ইহার পর আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈন্যদের মতামত নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতাদির আয়োজন করা হয়। সাক্ষী কয়েকবার লেঃ কর্ণেল

চ্যাটার্জি ও শ্রীযুত রাসবিহারী বসুর বক্তৃতার সময় উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই আজাদ হিন্দ ফৌজ রক্ষা করার জন্য শ্রোতৃগণকে অনুরোধ করিতেন। তাঁহারা এই যুক্তি দেখাইতেন যে, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের উদ্দেশ্য যখন মহৎ এবং জাপানীরা যখন তাহাদিগকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে গ্রহণ করিতে সম্মত নয়, তখন আজাদ হিন্দ ফৌজ ভাঙ্গিয়া দিলে তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইবে।

অতঃপর সাক্ষী কি ভাবে সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন রাসবিহারী বসুর নিকট হইতে কর্মপরিষদের ভারও স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তাহা বর্ণনা করেন।

অফিসারদের অধিকাংশেরই এই মত ছিল যে, তাহাদের পক্ষে আর জাতীয় বাহিনীতে থাকা উচিত নহে। তাহারা প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতাগুলির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে থাকেন। তাহারা রাসবিহারী বসুর তীব্র সমালোচনা করেন। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে বা ফেব্রুয়ারীর প্রথমভাগে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর অফিসারগণকে এই বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। উহাতে সাক্ষী জানান যে, তিনি আর জাতীয় বাহিনীতে থাকিতে প্রস্তুত নহেন। রাসবিহারী বসুর সহিত সাক্ষাৎকালেও তিনি সে জবাবই দিয়াছিলেন। ১৯৪৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী মিঃ রাসবিহারী বসু একটি নির্দেশনামা জারী করেন। উহাতে অন্য কথার সঙ্গে নিম্নোক্ত কথাটিও ছিল "ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর অফিসার যে সকল জবাব দিয়াছেন, সেগুলি আমি সযত্নে পর্যালোচনা করিয়াছি। লক্ষ্য করিয়াছি যে, প্রায় সকল অফিসারই সংগ্রাম করিতে ও মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সকলে ভারতীয় জাতীয় ফৌজে থাকিতে প্রস্তুত নহে! অফিসারগণকে নিম্নোক্ত কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:—(১) ইংরেজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনে যাহারা শঙ্কা বোধ করিতেছে; (২) ভারতের কংগ্রেসের উপর যাহাদের পূর্ণ

আস্থা নাই ; (৩) যাহারা ভারতবর্ষে ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠার বিশ্বাসী ; (৪) যাহারা বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে থাকিতে ইচ্ছুক নহে।

এ সকল মত যদি যুদ্ধবন্দীরা প্রকাশ করিতেন, তবে সেগুলির তাৎপর্য অতি সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু অফিসারগণকে এ ধরণের মত প্রকাশ করিতে দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে এই প্রশ্ন জাগে, একমাত্র ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনার সঙ্কল্প লইয়া যে আন্দোলন আরম্ভ করা হইয়াছে, কি উদ্দেশ্য লইয়া এইসকল অফিসার উহাতে যোগ দিয়াছেন। ডোমিনিয়নের মর্যাদা যাহাই হউক না কেন, উহা বৃটেনের ডোমিনিয়ন হইবে এবং বৃটিশ ডোমিনিয়ন হিসাবে বৃটেনের স্বার্থই রক্ষণ করিবে। বৃটেনের বিরুদ্ধে ভারতের সংগ্রাম এখন এক সঙ্কটজনক অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে।"

রাসবিহারী বসুর সহিত সাক্ষাৎ শেষ হইলে সাক্ষী এবং অপর যে সকল ব্যক্তি জাতীয় ফৌজে যোগ দিতে অসম্মত হইয়াছে, তাহাদিগকে সিঙ্গাপুরে একটি ক্যাম্পে আলাদাভাবে রাখা হয়। মেজর আগাওয়া নামক জনৈক জাপ অফিসার তাঁহাকে সেখানে লইয়া যান। সেখান হইতে তাঁহাদিগকে জোহর-বারুর অপর একটি ক্যাম্পে লইয়া যাওয়া হয়। কিছুদিন সে ক্যাম্পে অবস্থানের পর সাক্ষীকে চিকিৎসার জন্য বিদাদারী হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালে এক মাস অবস্থানের পর সেখানকার কম্যাণ্ডিং অফিসার জানান যে, যে সকল রোগী এখনও ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর ক্যাম্পে অবস্থান করিতে রাজী হইতেছে না, তাহাদিগকে একটি নির্জন ক্যাম্পে প্রেরণ করা হইবে। শেষোক্ত ক্যাম্পে চিকিৎসার কোনই বন্দোবস্ত নাই। সাক্ষী চিকিৎসার সুযোগ হারাইতে পারেন না বলিয়া অগত্যা ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে পুনরায় জাতীয় বাহিনীতে যোগদান করেন।

সাক্ষী ১৯৪৩ সালের মে মাসে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর জজ-এডভোকেট হিসাবে পুনরায় কার্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু লক্ষ্য করেন যে, উহা এক সম্পূর্ণ

ভিন্ন রকমের প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিয়াছে আসামী ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ খান উহার চীফ্ অব্ জেনারেল ষ্টাফ ও আসামী ক্যাপ্টেন সেগল উহার মিলিটারী সেক্রেটারী হইয়াছেন সাক্ষী অতঃপর বলেন যে ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে সুভাষচন্দ্র বসু সিঙ্গাপুর আসেন এবং ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ও ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের পূর্ণ কর্তৃত্ব আপন হাতে গ্রহণ করেন।

সৈন্যদের প্রতি সুভাষচন্দ্রের প্রথম ঘোষণা

সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি এক ঘোষণায়-বলেন : "ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বার্থে আজ হইতে আমি আমাদের সৈন্যদের প্রত্যক্ষ পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছি। আমার পক্ষে ইহা আনন্দ ও গৌরবের ব্যাপার। ভারতের মুক্তিফৌজের সেনাপতি হইবার সম্মান অপেক্ষা বড় কোন সম্মান ভারতবাসীর পক্ষে থাকিতে পারে না। যে কার্য্যভার আমি গ্রহণ করিয়াছি, উহার বিপুলতা সম্পর্কে আমি সজাগ আছি। অবস্থা যতই কঠোর হউক না কেন, কর্ত্তব্য সাধনের ক্ষমতা যেন ভগবান আমাকে দেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ৩৮ কোটি মানুষের সেবক বলিয়া আমি নিজেকে মনে করি। ৩৮ কোটি নরনারীর স্বার্থ যাহাতে আমার হাতে নিরাপদ থাকে এবং মাতৃভূমির আসন্ন মুক্তিসংগ্রামে স্বাধীন ভারতের গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার ও ভারতের স্বাধীনতা সংরক্ষণে নিযুক্ত স্থায়ী সৈন্যদল গঠনে যাহাতে প্রত্যেক ভারতবাসী আমার উপর পূর্ণ আস্থা রাখিতে পারেন, সে ভাবেই আমি কাজ করিয়া যাইব। আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্মুখে এক বৃহৎ কর্ত্তব্য রহিয়াছে। এ কর্তব্য সাধনে আমরা এমন এক সৈন্যদল গড়িয়া তুলিব যাহার একটি মাত্র আদর্শ থাকিবে এবং সে আদর্শ হইবে—ভারতের স্বাধীনতা লাভ।

"স্বাধীনতা লাভের জন্য কর্তব্য সাধন বা মৃত্যুবরণ"—এই একটি মাত্র লক্ষ্য আমাদের থাকিবে। পৃথিবীর সমগ্র মানব সমাজের এক-পঞ্চমাংশ লোকের নিশ্চয়ই স্বাধীনতা লাভের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রহিয়াছে। সহকর্মিগণ! অফিসার এবং সৈন্যগণ! আপনাদের অবিচল আনুগত্য ও পূর্ণ সমর্থন প্রাপ্ত আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের মুক্তি সম্ভব করিয়া তুলিবে। আমরা নিশ্চয়ই জয়ী হইব।"

দিল্লী চলো" ধ্বনি দ্বারা এই ঘোষনার উপসংহার করা হয় এবং সঙ্কল্প ব্যক্ত করা হয় যে, বড়লাট প্রসাদে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করা হইবে এবং পুরাতন লালকেল্লায় বিজয় উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রের তার

আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের সর্বাধ্যক্ষ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু জাপানী ও জাপ নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের অন্যান্য রাজনীতিকদের নিকট যে সকল 'তার' প্রেরণ করিয়াছিলেন, সামরিক আদালত সেগুলিকে সাক্ষী-দলিল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

১৯৪৪ সালের ২১শে জুলাই তারিখে জাপ প্রধান মন্ত্রী জেনারেল কয়সোর নিকট এক তার প্রেরণ করিয়া সুভাষচন্দ্র তাহাকে এক প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়েরা নিপ্পনের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে। জাপান তাঁবেদার "স্বাধীন ব্রহ্ম" গবর্ণমেণ্টের সর্বাধ্যক্ষ ডাঃ বা ম'র কাছে এবং তার প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহাতে তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সকল মূল্যবান সাহায্য লওয়া হইয়াছে এবং এখনও দেওয়া হইতেছে তজ্জন্য ডঃ বা ম' ও স্বাধীন ব্রহ্মের" গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাইয়ছেন। উক্ত তারে আরও বলা হইয়াছে:—

"আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতেছি যে, আমাদের সাধারন শত্রু পর্যুদস্ত হইয়া আমাদের সকলের জয়লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ভারতীয়েরা সকল অবস্থার মধ্যেই স্বাধীন ব্রহ্ম ও নিপ্পনের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া অবিচলিত ভাবে সংগ্রাম চালাইতে সঙ্কল্পবদ্ধ রহিয়াছি।"

জাপ পররাষ্ট্রসচিব সিগমিৎসুর নিকট এক 'তার' পাঠাইয়া সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার "কূটনীতি ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার" উচ্ছসিত প্রশংসা করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র উক্ত তারে আরও বলিয়াছেন, "আমাদের সম্মুখে যদিও দুর্দিন রহিয়াছে, তথাপি আমাদের সকলের জয়লাভ না ঘটা পর্যন্ত আমরা নিপ্পনের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইব।

জাপ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর জবাব

পূর্বোক্ত 'তারে'র জবাবে সিগমিৎসু লিখিয়াছিলেন, "বর্তমান সন্ধিক্ষণে আপনার নিকট হইতে আন্তরিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পাইয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। আমার মনে দৃঢ়বিশ্বাস রহিয়াছে যে, আমাদের সকলের উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং আপনার সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হইবে।"

ব্রহ্মের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও থাইল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর সহিতও সুভাষচন্দ্র বসুর অনুরূপ 'তার' বিনিময় হইয়াছে। থাইল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রেরিত এক তারে সুভাষচন্দ্র এই আশা ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, থাইল্যাণ্ড ও স্বাধীন ভারতের মধ্যে ইতিপূর্বেই যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন সৃষ্টি হইয়াছে উহা আরও দৃঢ় হইবে। তিনি এ নিশ্চয়তাও দিয়াছিলেন যে, সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সকলের যুদ্ধে ভারতীয়েরা থাইল্যাণ্ডের গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের সহিত সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করিবে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের আইন প্রণয়ন

সামবিক আদালতের পুনরধিবেশনে লেঃ নাগের জবানবন্দী পুনরায় আরম্ভ হয়। মামলা আরম্ভ হইলে কতকগুলি প্রশ্নের বৈধতা সম্পর্কে এডভোকেট জেনারেল স্যার এন পি ইঞ্জিনিয়ার এবং আসামীপক্ষের সিনিয়ার কৌসুলী শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাইএর মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে আনীত তৃতীয় মামলার আসামী বালুচ রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেন বুরহানউদ্দীনের বিরুদ্ধে চার্জসীট দাখিল করা হইয়াছে। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার এবং প্রহার করিয়া একজন লোকের মৃত্যু ঘটাইবার অভিযোগে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। পৃথকভাবে তাঁহার বিচার হইবে।

সামরিক আদালতের পুনরধিবেশনে লেঃ নাগ তাঁহার জবানবন্দীতে আরও বলেন যে, ক্যাপ্টেন হবিবর রহমানের উপদেশ অনুসারে তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনী সংক্রান্ত আর্মি এক্টের সংশোধন করা হয়। নিয়ম ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের এবং অন্যান্য অপরাধের জন্য বেত্রদণ্ড দিবার উদ্দেশ্যে এই সংশোধন করা হইয়াছিল। ক্যাপ্টেন হবিবর রহমানের নির্দ্দেশ অনুসারে সাক্ষী আজাদ হিন্দ আর্মি সম্পর্কে একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। রেঙ্গুণে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান হেড কোয়ার্টাসে এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনের পর আজাদ হিন্দ আর্মি এক্টের আরও সংশোধন করা হয়।

স্যার এন পি ইঞ্জিনিয়ার এইরূপ একটি সংশোধনের প্রতি সাক্ষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে ইহার সার মর্ম বিবৃত করিতে বলেন।

শ্রীযুত দেশাই দলিলটি উপস্থাপিত করিতে বলেন। সাক্ষী বলেন যে, দলিল-খানি পাওয়া যায় নাই। শ্রীযুত দেশাই ইহাতে আপত্তি করিয়া বলেন যে, যদি দলিলখানি পাওয়া না যায় তাহা হইলে এই বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা চলিবে না।

আজাদ হিন্দ ফৌজের কোন্ দল কোথায় ছিল

লেঃ নাগ আরও বলেন—১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রেঙ্গুণে আজাদ হিন্দ ফৌজের হেডকোয়ার্টার্স ছিল; সিঙ্গাপুরেও উহার একটি রিয়ার হেডকোয়ার্টার্স ছিল। ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের ১, ২, ৩ ও ৪নং গেরিলা রেজিমেণ্ট ১২নং বাহাদুর গ্রূপ এবং একটি ইনটেলিজেন্স গ্রূপ এ সময়ে রেঙ্গুণে ছিল। সাক্ষী রেঙ্গুণে পৌঁছিলে মিলিটারী সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন সেহগল তাঁহাকে অবিলম্বে মেমিও যাইতে বলেন। ১, ২ ও ৩নং গেরিলা বাহিনী মণিপুর ও আরাকান ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ৪র্থ গেরিলা বাহিনী মান্দালয়ে ছিল। লেঃ কর্ণেল চ্যাটার্জি আজাদ হিন্দ ফৌজ অধিকৃত অঞ্চলসমূহের শাসনকর্তা নিৰ্বাচিত হইয়াছিলেন। সাক্ষী মেমিওতে পৌঁছিলে লেঃ কর্ণেল চ্যাটার্জি কতকগুলি বিধি-বিধান ও নিয়মাদি পড়িয়া দেখিতে বলেন। অধিকৃত অঞ্চল শাসন করিবার জন্য লেঃ কর্ণেল চ্যাটার্জি ঐ খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

লেঃ নাগ ঐ সকল নিয়মাকানুন পাঠ করেন এবং কয়েক সপ্তাহ পরে রেঙ্গুণে ফিরিয়া আসেন এবং ডি এ জি কাজে নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সালের মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুও রেঙ্গুণে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সৈন্যগণের নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা, নিয়োগ ও বদলীর ব্যবস্থা এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ সংক্রান্ত সাধারণ বিধি-ব্যবস্থা করা সাক্ষীর কর্ত্তব্য ছিল। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে নানা বিপর্য্যয়ের পর গেরিলা বাহিনীগুলি মান্দালয়ে ফিরিয়া আসে।

সুভাষচন্দ্রের নির্দ্দেশনামা

গত ১৯৪৪ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু যে নির্দ্দেশনামা জারী করেন, সাক্ষী সুভাষচন্দ্রের স্বাক্ষরিত সেই নির্দ্দেশনামা সনাক্ত করেন উক্ত নির্দ্দেশনামায় বলা হইয়াছিল যে,—

১৯৪৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যভাগে আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রবর্ত্তী ইউনিটগুলি, ইম্পিয়াল নিপ্পনবাহিনী সহ ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে ভারতের মুক্তির জন্য ভারতের মাটিতেই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

নির্দেশনামায় আরও বলা হয় যে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এক শতাব্দীর অধিক কাল নির্মমভাবে ভারতকে শোষণ করিতেছেন; এবং তাঁহাদের জন্য যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বিদেশী সৈন্য আমদানী করিয়াছেন। এইপ্রকারে তাঁহারা আমাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সৈন্যদল নিযুক্ত করিয়াছেন ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আমাদের সৈন্যদল আমাদের দাবী যৌক্তিকতার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া সংখ্যাধিক, অধিকতর সুসজ্জিত অথচ বিভিন্ন জাতীয় ও বিচ্ছিন্ন শত্রু-সৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছে এবং প্রত্যেক যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছে।

অতঃপর এই নির্দেশনামায় বলা হয়, আমাদের অধিকতর সুশিক্ষিত এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ সৈন্যদল স্বাধীনতালাভের জন্য মৃত্যুপণ করিয়া, অবিচল সঙ্কল্প লইয়া শীঘ্রই শত্রুপক্ষের চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে। প্রত্যেকবার পরাজিত হইবার পর শত্রুপক্ষের মনোবল ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। অত্যন্ত কঠোর অবস্থার মধ্যেও যুদ্ধ করিয়া আমাদের অফিসার ও সৈন্যগণ এরূপ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন যে তাঁহাদের সকলেরই প্রশংসালাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। রক্ত ও আত্মদান করিয়া এই সমস্ত বীর যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন ভারতবর্ষের ভাবী সৈনিকগণকে তাহা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। যখন ইম্ফল আক্রমণের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছিল তখন প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং রন কৌশলের দিক হইতে ইম্ফল আক্রমণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রাকৃতিক বাধা বিপত্তির ফলে আমাদিগকে আক্রমণ স্থগিত রাখিতে হয়। আক্রমণ স্থগিত রাখার পর দেখা যায় যে, আমাদের সৈন্যগণ ঐ সময়ে যে স্থান দখল করিয়াছিল সেইসমস্ত স্থান দখল করিয়া রাখা তাহাদের পক্ষে অসুবিধাজনক হইয়া পড়িয়াছে। আত্মরক্ষার পক্ষে অধিকতর অনুকূল স্থানলাভের জন্য আমাদের সৈন্যগণকে

সরাইয়া লইবার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আমাদের সৈন্যগণকে আত্মরক্ষার পক্ষে অধিকতর অনুকূল স্থানে সরাইয়া লইয়া আসা হয়। আমরা এখন বিরতির সময় আমাদের উদ্যোগ আয়োজন এমনভাবে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিব যে, আবহাওয়া ভাল হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পুনরায় আক্রমণ আরম্ভ করিতে সমর্থ হইব।

রণাঙ্গনের কয়েকটি অংশে শত্রুকে একবার পরাজিত করিবার পর চূড়ান্ত জয়লাভ এবং আক্রমণকারী ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যদলের ধ্বংস সাধন সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ১০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমাদের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ হইবামাত্র আমরা পুনরায় উন্নততর রণ-নৈপুণ্য অদম্য সাহস, কর্তব্যের প্রতি আমাদের অফিসার ও সৈন্যগণের অবিচলিত নিষ্ঠা লইয়া শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইব। আমরা নিশ্চয়ই জয়লাভ করিব।

অতঃপর নির্দেশনামার উপসংহারে বলা হয় :—এই যুদ্ধে আমাদের যে সমস্ত বীর নিহত হইয়াছেন তাঁহাদের পরলোকগত আত্মা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামের পরবর্তী অধ্যায়ে আমাদিগকে আরও বীরত্বপূর্ণ কার্য্য করিতে উৎসাহিত করিবে।

জাপ পররাষ্ট্র সচিবের নিকট শ্রীযুক্ত বসুর তার

গত ১৯৪৪ সালের ৭ই জুলাই নেতাজী দিবস উপলক্ষে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এবং ব্রহ্ম ও জাপানী পররাষ্ট্র সচিবের মধ্যে তারবার্তা বিনিময় হয়; লেঃ নাগ আদালতে তাহার অনুলিপি পেশ করেন। জাপ পররাষ্ট্র সচিবের নিকট শ্রীযুত বসুর তারবার্তা নিম্নরূপ :—আমাদের সম্মুখে যে দুর্য্যোগপূর্ণ সময় রহিয়াছে, তৎসত্ত্বেও আমি আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, জয়লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা সকল অবস্থায় জাপানের সহিত একযোগে যুদ্ধ চালাইয়া যাইব।

লেঃ নাগ কর্ত্তৃক উপস্থাপিত আর একটি দলিলে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ ও মার্কিণ সৈন্য বন্দী করা কিংবা নিহত করার ব্যাপারে যে বিশেষ শৌর্য প্রদর্শন করিবে তাহাকে 'শত্রু বিনাশ' নামে একটি পদক দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়াও যাহারা ভারতের স্বাধীনতার শত্রু সৈনিক ব্যতীত অন্যান্য বৃটিশ ও আমেরিকানদের ভারতে কিংবা ভারতের বাহিরে হত্যা অথবা জীবন্ত বন্দী করিতে পারিবে তাহাদিগকেও এই পদক দেওয়া হইবে।

সাক্ষী ১৯৪৪ সালের ৩০শে অক্টোবর লেঃ কঃ আজিজ আহমেদ খাঁ কর্ত্তৃক প্রকাশিত আরও একটি নথি পেশ করেন। ইহাতে 'মিলিটারী সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন সেহ্‌গলের নির্দেশক্রমে' সমরোদ্যম আরও ব্যাপক করিবার জন্য অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের একটি সমর পরিষদ গঠনের কথা বলা হইয়াছে।

কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতকদের তাড়াইবার ব্যবস্থা

১৯৪৫ সালের ১৩ই মার্চ তারিখে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকদের মধ্য হইতে কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করিবার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন হইবে তাহার নির্দেশ দিয়া একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। বিজ্ঞপ্তিতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের আজাদ হিন্দ ফৌজ ছাড়িয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হয়। এই অনুমতি এক সপ্তাহকাল থাকার পর কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতকদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। এইভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনর্গঠিত হইবার পর ইহার প্রত্যেক ব্যক্তিকে মাতৃভূমির মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সাহসের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পুনরায় সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়—'ইহার পর হইতে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং ভারতের মর্য্যাদা ও সুনাম রক্ষাকারী বলিয়া মনে করিবে।' যাহারা কাপুরুষ এবং বিশ্বাসঘাতক লোকেদের সন্ধান

দিবে এবং রণাঙ্গনে এইরূপ লোকদের বন্দী করিতে পারিবে, তাহাদিগকে বিশেষ পুরস্কার দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। বিশ্বাসঘাতক এবং কাপুরুষোচিত আচরণ করিলে পর আজাদ হিন্দ ফৌজের এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে (যে কোন পদমর্য্যাদাসম্পন্নই হউক না কেন) গ্রেপ্তার করিবার অধিকারী ছিল।

আজাদ ফৌজের সমস্ত অফিসার ও সৈন্যদের উদ্দেশে প্রদত্ত একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য করিবার জন্য একটি দিবস পালন করিতে বলা হয়। এই দিবসে শ্রীযুত বসু নাটকাভিনয়, বিশ্বাসঘাতকদের কুশপুত্তলিকা পোড়ান, বক্তৃতা প্রভৃতি করার প্রস্তাব করেন।

সাক্ষী অতঃপর ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত কয়েকটি কাগজপত্র পেশ করেন। ১৯৪৩ সালের ১৩ই মার্চ ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে—'ভবিষ্যতে বিশেষ কার্য্যের জন্য গঠিত বাহিনী বাহাদুর বাহিনী বলিয়া কথিত হইবে। কিন্তু ইহা এমনভাবে প্রচার করা হয় যে, প্রত্যেকটি সৈন্য এই নাম বদলের নিহিতার্থ বুঝিতে পারিয়াছিল। বাহাদুর বাহিনীর কাজ ছিল—গোয়েন্দাগিরি, নাশকতা এবং শত্রুদের মধ্যে প্রবেশ করা। ২৭শে মে তারিখে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত আর একটি বিজ্ঞপ্তিতে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানে ইচ্ছুক ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের গ্রহণ করা এবং বাকী সকলকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে জাপ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দেওয়ার কথা বলা হয়।

সাক্ষী ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত আরও কয়েকটি বিজ্ঞপ্তি আদালতে পেশ করেন। সেগুলি হত্যার অভিযোগ এবং ব্রহ্মে ফৌজের অবস্থা সম্পর্কিত। ইহার একটিতে গ্রামলুণ্ঠনকারী এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপানী সৈন্যদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপন্নকারী দস্যুদলের সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলা হয়।

ইহার পর ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজের ১৯৪৪ সালের এবং ১৯৪৫ সালের ডায়েরী হইতে কিছু কিছু অংশ পাঠ করা হয়।

তিন সপ্তাহ মামলা স্থগিত থাকার পর ২১শে নভেম্বর, লাল-কেল্লায় পুনরায় বিচার আরম্ভ হইলে প্রতিবাদী পক্ষের সিনিয়ার কৌঁসুলী মিঃ ভুলাভাই দেশাই সরকার পক্ষের প্রথম সাক্ষী লেফটেনেন্ট নাগকে প্রায় চার ঘণ্টাকাল জেরা করেন।

শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাইএর এক প্রশ্নের উত্তরে লেঃ নাগ স্বীকার করেন যে, ১৯৪৩ সালের শেষভাগে সুভাষচন্দ্র এক বক্তৃতায় বলেন যে,—'নিজস্ব গভর্ণমেণ্টের নেতৃত্বেই আজাদ হিন্দ ফৌজ অভিযান আরম্ভ করিবে এবং উহা ভারতে প্রবেশ করিলে মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্চলগুলির শাসন ক্ষমতা অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের হাতেই থাকিবে। আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় এবং আত্মোৎসর্গ দ্বারাই ভারতের মুক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে।" অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, জাপানের তাঁবেদাররূপে আজাদ হিন্দ ফৌজকে রাখিবার চেষ্টা করা হইলে ইহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে—গোড়া হইতেই প্রত্যেকেরই এই লক্ষ্য ছিল। ভারতীয়দের জন্য ভারতবর্ষের মুক্তিলাভ করাই তাহাদের আদর্শ ছিল।

জেরার উত্তরে লেফটেন্যাণ্ট নাগ বলেন যে, তিনি প্রথমে ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং পরে ১৯৪৩ সালের মে মাস হইতে শেষ পর্যন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজে কাজ করেন। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৩ সালের মে পর্যন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজে একটি সঙ্কট দেখা যায়। প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ ভাঙ্গিয়া যাইবার পর তাঁহাকে একটি আভ্যন্তরীন শিবিরে আনয়ন করা হয়। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি শুনেন যে, দ্বিতীয় আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের সংবাদ পান।

লেফটেন্যাণ্ট নাগ বলেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজে কাজ করিবার সময় তিনি দুইটি পদ অধিকার করিয়াছিলেন ; একটি হইল আজাদ হিন্দ ফৌজের 'জজ

য়্যাডভোকেট জেনারেল' এবং অপরটি 'ডেপুটি য়্যাডজুট্যাণ্ট জেনারেল'। 'জজ য়্যাডভোকেট জেনারেলরূপে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের আইন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি বলেন, "সর্ব্বপ্রথম আমি আজাদ হিন্দ ফৌজের আইনের খসড়া রচনা করি। ইহার পর আমার কাজ ফৌজের আইনের দিকে লক্ষ্য রাখা, সামরিক আদালতের এবং তদন্ত ও অন্যান্য শাসনমূলক মামলা পর্য্যালোচনা করা। সাধারণভাবে আমি আজাদ হিন্দ ফৌজের আইন পরামর্শদাতা ছিলাম। ১৯৪৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার ঘোষণা করা হয়। এই সরকারের আমি আইন পরামর্শদাতা ছিলাম না, আইন পরামর্শদাতা ছিলাম আজাদ হিন্দ ফৌজের। বঙ্গীয় সিভিল সার্ভিসের প্রাক্তন সদস্য মিঃ সরকার নামে এক ব্যক্তি উক্ত ভারত সরকারের আইন পরামর্শদাতা ছিলেন। আইন সম্পর্কীয় ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার মত উপযুক্ততা তাঁহার ছিল।

সাক্ষী বলেন যে, জাপানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় তিনি পেনাংএ ছিলেন। ১৮৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন সাক্ষী সিঙ্গাপুর অভিমুখে যাত্রা করেন এবং ১৯৪২ সালের ২৬শে জানুয়ারী সিঙ্গাপুরে পৌছান। ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী এক বিমান আক্রমণের ফলে তিনি আহত হন এবং তাহার ফলে নেস্থন ক্যাম্পের এক হাসপাতালে তাঁহাকে প্রায় এক মাস কাল কাটাইতেই হয়। হাসপাতাল হইতে ছাড়া পাইয়া তিনি জানিতে পারেন যে উক্ত ক্যাম্পের কম্যাণ্ডাণ্ট ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ।

মিঃ ভুলাভাই দেশাই:—আপনি কি আপনার পদটি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন?

সাক্ষী:—আমি স্বেচ্ছায় এ্যাডভোকেট জেনারেলের পদ গ্রহণ করি। আমার প্রাথমিক কার্য্য ছিল ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর আইন প্রণয়ন।

প্রশ্ন :—তাহা হইলে আমি মনে করিতে পারি যে আপনি যখন কার্য্যভার গ্রহণ করেন তখন আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুসারে যাহাতে বাহিনীর কার্য্য চলে তাহা আপনার কাম্য ছিল।

উত্তর :—হ্যাঁ ভারতীয় জাতীয় বাহিনী সুসংগঠিত বাহিনী হিসাবে এবং আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুসারে কার্য্য করিবে ইহাই অভিপ্রেত ছিল। উহার কারণেই আইন প্রণীত হয়।

আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার কাহিনী

লেঃ নাগ বলেন, ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর তারিখে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি হাজির ছিলেন। এই সভাতেই অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষিত হয়। সভায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানী এবং অসামরিক ভারতীয় এবং কয়েকজন জাপানী সেনানী ছিল। থাইল্যাণ্ড, জাভা, সুমাত্রা, ইন্দোচীন, হংকং ও মালয় হইতে ভারতীয় প্রতিনিধিরা সভায় উপস্থিত ছিল। ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সাক্ষী যখন প্রথম পর্য্যায়ে গঠিত ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগদান করেন তখন তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের অস্তিত্বের বিষয় অবগত ছিলেন। ভারতীয় প্রতিনিধিরা ঐ সকল দেশের প্রতিনিধিত্ব করিতেছিলেন। সাক্ষী দর্শক হিসাবে ঐ সভায় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক নিযুক্ত মন্ত্রীদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণের সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ না করিলেও অস্থায়ী সরকার গঠনের সংবাদে আনন্দধ্বনি করেন, সভায় প্রায় পাঁচ হাজার লোক উপস্থিত ছিল।

মিঃ ভুলাভাই দেশাই উক্ত ঘোষণা-বাণী পাঠ করিয়া বলেন যে, সাক্ষী উহা শুনিয়াছেন কি?

সাক্ষী বলেন যে, ঠিক ভাষা কি ছিল তাহা তাঁহার মনে নাই। সুভাষ

বসু উক্ত ঘোষণা পাঠ করেন, সাক্ষী উহা রেকর্ডে দেখিয়াছেন, সুভাষচন্দ্র বসুর অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা তিনি শুনিয়াছিলেন।

সাক্ষী বলেন যে, সুভাষচন্দ্র ১৯৪৪ সালের গোড়ায় ব্রহ্মে যান এবং সাক্ষী নিজে ঐ বৎসর এপ্রিল মাসে তথায় উপস্থিত হন।

মিঃ দেশাই: সাধারণ ভাবে আপনি কি সুভাষ বসুর আস্থাভাজন ছিলেন।

উঃ—আমার তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে কোনও সংযোগ ছিল না।

প্রঃ—আপনি কি বলিতে চান যে, আপনার কখনও আলাপ হয় নাই।

উঃ—কয়েকটা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে দুইবার আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছিলাম।

প্রঃ—মেমিওতে ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে আপনি কি সুভাষচন্দ্রের সহিত একই বাড়ীতে ছিলেন।

উঃ—হ্যাঁ।

প্রঃ—সুভাষবাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ কবে হইয়াছিল?

উঃ—১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসের পর কোনও সময়ে। একবার ঐ বৎসরের মে মাসে আলাপ হয় বলিয়া মনে আছে।

প্রঃ—আপনি তাঁহার সহিত এক বাড়ীতে থাকিতেন, আহারও তাঁহার সহিত একত্র করিয়াছেন?

উঃ—হ্যাঁ।

প্রঃ—এসব কাজ কি সম্পূর্ণ নীরবেই চলিত?

উঃ—না, তবে আমি তাঁহার সঙ্গে কখনও আলোচনার সুযোগ পাই নাই।

আজাদ-হিন্দ ব্যাঙ্ক

সাক্ষী বলেন যে, ১৯৪৪ এর এপ্রিল মাসে তিনি রেঙ্গুণে উপস্থিত হইয়া আজাদ-হিন্দ ব্যাঙ্কের কথা জানিতে পারেন। পূর্ব্ব এশিয়ার বিভিন্ন অংশ হইতে

ভারতীয়েরা যথেষ্ট অর্থ এবং জিনিষপত্রাদি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে দান করে এবং এই ভাবে সংগৃহীত অর্থ আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কে জমা রাখা হইয়াছিল বলিয়া তিনি অবগত আছেন। সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ প্রায় সাড়ে আট কোটি টাকা হইবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, তিনি অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে সঠিক খবর জানেন না, তবে উহা যে কয়েক কোটী হইয়াছিল ইহা ঠিক। জজ এডভোকেটের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, বিভিন্ন ঘোষণা এবং সুভাষ বসুর বক্তৃতা হইতে তিনি এই সব সংবাদ পাইয়াছেন। একবার কি দুইবার জনসভায় অর্থসংগ্রহ করিতে তিনি নিজে দেখিয়াছেন।

জজ এডভোকেট বলেন যে, তিনি শুনা কথা বাদ দিতে চান।

শ্রীযুক্ত দেশাই বলেন যে, ব্রহ্ম পুনরধিকারের পর আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্টের কাগজ পত্র এবং উহার বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তি মিত্রপক্ষের হাতে পড়ে, ফলে কেবল মুদ্রিত দলিলের আকারেই এই সম্পর্কে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং এই সাক্ষীর নিকট হইতেই যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করিতে আমি চেষ্টা করিব।

জজ এডভোকেট—সাক্ষীর নিকট হইতে আপনি কেবল এই ধরণের জনশ্রুতিই পাইবেন।

সাক্ষী বলেন যে, অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সংগৃহীত অর্থের উপরই আজাদ হিন্দ ফৌজকে নির্ভর করিতে হইত। এই টাকা আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক হইতে দেওয়া হইত কিনা তাহা তিনি জানেন না; এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্থসচিবের উপর ন্যস্ত ছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের হিসাবরক্ষক মেজর মুর্ত্তি অর্থসচিবের নির্দেশ অনুসারে চলিতেন। ১৯৪৩ সালে সিঙ্গাপুরে লেঃ কর্ণেল চ্যাটার্জ্জি প্রথম অর্থসচিব ছিলেন এবং ১৯৪৪ সালে মিঃ রাঘবন এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সাক্ষী মেমিওতে লেঃ কর্ণেল এসান কাদেরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মিঃ কাদের ঐ সময় আজাদ হিন্দ দলের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। আজাদ

হিন্দ ফৌজ কর্ত্তৃক অঞ্চলগুলি শাসনের ভার এই দলের উপর অর্পিত হয়। অসামরিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সিঙ্গাপুর এবং রেঙ্গুনের কয়েকজন অসামরিকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়; উহাদের লইয়া এই দল গঠিত হয়। অধিকৃত অঞ্চলের শাসন কর্ত্তার পদে লেঃ কর্ণেল চ্যাটার্জ্জী মনোনীত হন। এই সব অঞ্চল শাসনের জন্য রচিত খসড়াটি মিঃ সরকার প্রণয়ন করেন এবং উহা লেঃ কর্ণেল চ্যাটার্জীর হস্তে দেওয়া হয়। সাক্ষী প্রায় পাঁচ সপ্তাহ ধরিয়া এই খসড়াটি পরীক্ষা করেন এবং উহা তাহার নিকট ভাল বলিয়াই মনে হয়। ১৯৪৩ সলের শেষভাগে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করা হয় এবং লেঃ কর্ণেল লোকনাথনের উপর এই এলাকার শাসনভার অর্পিত হয়। তিনি আটমাস কাল এই এলাকায় শাসন করেন।

এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে জার্ম্মাণী, জাপান, ইতালী, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, ক্রোয়াটীয়া, মাঞ্চুরিয়া এবং তৎকালীন ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, সে-কথা সাক্ষীর স্মরণ আছে।

প্রশ্ন :—আপনার কি মনে আছে যে, আইরিশ রিপাবলিক এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট মানিয়া লইয়াছিল কিনা?

উত্তর :—না।

সাক্ষী জানিতেন যে, ব্রহ্ম সরকারের ব্রহ্ম রক্ষা বাহিনী ছিল কিন্তু সেই ব্রহ্মরক্ষা বাহিনী এক্ষণে ব্রহ্মের বর্ত্তমান সেনা দলের সহিত মিশিয়া গিয়াছে কিনা, তাহা সাক্ষী জানেন না। সাক্ষী এক সময় ব্রহ্মরক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক জেঃ আউং সানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

ভারতের মুক্তির জন্য বৃটিশের সহিত যুদ্ধ করা জাতীয় সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল। এই অস্থায়ী সরকারের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতীয়দের জীবন সম্মান ও সম্পত্তি রক্ষা করা। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাস হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ব্রহ্মে ভারতীয়দিগকে

রক্ষা করার চেষ্টা করে। এই সময় রেঙ্গুণ বৃটিশ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। জাপানীরা ব্রহ্ম ও মালয় অধিকার করিলে তথায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট এই সমস্ত দেশের ভারতীয়দিগকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। এই কার্য্যের জন্য কাহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল অথবা জাতীয় বাহিনী কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল তাহা সাক্ষী জানেন না। ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বৃটিশ যখন সিঙ্গাপুরে আত্মসমর্পণ করে তথায় জাতীয় যুদ্ধ বন্দীদের জন্য তিন চারিটি ক্যাম্প ছিল। প্রত্যেক হাসপাতালে পাঁচ শত হইতে সাত শত রোগীর স্থান ছিল। ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ মাসে সাক্ষী চিকিৎসার্থ বিদাদারী হাসপাতালে ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দেশাই :—বিদাদরী হাসপাতাল হইতে পাছে সেলেটারে আপনাকে স্থানান্তরিত করা হয়, সেই ভয়ে আপনি দ্বিতীয় ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগ দেন,—এই মর্মে আপনি কোর্টে জবানবন্দী দিয়াছেন এখন আপনি বলিতেছেন যে, সেলেটারেও একটি হাসপাতাল ছিল।

উত্তর :—আমাকে বলা হয়েছিল যে, আমি সেলেটারের একটি শিবিরে যাইতেছি, সেখানে কোনই হাসপাতাল নাই।

প্রশ্নঃ—তাহা হইলে সেলেটারে একটিমাত্র হাসপাতাল ছিল এবং সেখানে যে কোন সময় বন্দী ভর্ত্তি হইতে পারিত ?

উত্তর :—হ্যাঁ।

প্রশ্ন :—কাজেই আপনাদিগকে সেলেটার ক্যাম্পে পাঠান হইতেছে একথা বলা ঠিক নহে।

উ :—না, যদিও আমরা রোগী ছিলাম তথাপি আমাদিগকে কোন হাসপাতালে পাঠান হয় নাই। ব্যাপারটা এইরূপ দাড়ায় কিনা যে যাহারা জাতীয় বাহিনীতে থাকিতে ইচ্ছুক নহেন তাহাদিগকে সেলেটার ক্যাম্পে পাঠান হইল কারণ সেখানে কোন চিকিৎসকের ব্যবস্থা ছিল না।

উ :—এই কথাই আমি বলিতে চাই।

প্র :—ইহাদ্বারা আপনি কি বুঝাইতে চান ?

উ :—স্বাভাবিক অবস্থায় রোগীদিগকে হাসপাতালে পাঠান হইত। কিন্তু আমাকে বলা হয় যে আমাদিগকে হাসপাতালে পাঠান হইতেছে না।

প্র : - আপনি কি এই কথা বলিতে চান যে কেবলমাত্র আপনাকে হাসপাতালে পাঠান হয় নাই ?

উ :—না, প্রত্যেকের সম্পর্কেই এইরূপ করা হয়। বিদাদরীতে সমস্ত রোগীকে বলা হয় যে তাহারা জাতীয় বাহিনীতে থাকিতে না চাহিলে তাহাদিগকে হাসপাতালে না পাঠাইয়া সেলেটার ক্যাম্পে পাঠান হইবে। অতঃপর সাক্ষী বলেন যে সেই সময় বিদাদরী হাসপাতালে তাহাদের সঙ্গে কয়েকজন ভিসিও ছিলেন কিন্তু তাহাদের নাম তাহার মনে নাই কিম্বা তিনি তাহাদিগকে সনাক্ত করিতে পারেন না। সাক্ষী বলেন—১৯৩২ এর ডিসেম্বরে প্রথম আজাদ-হিন্দ ফৌজ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। এই ফৌজের সেনাপতি ক্যাপ্টেন মোহন সিংহকে ঐ মাসেই জাপানীরা গ্রেপ্তার করে।

শ্রীযুক্ত দেশাই—গ্রেপ্তারের কারণ কি ?

সাক্ষী—গ্রেপ্তারের কারণ আমি জানি না। তবে জাপ কর্তৃপক্ষের সহিত মোহন সিংহের মতানৈক্য ছিল।

শ্রীযুক্ত দেশাই—মতানৈক্য কিরূপ ধরনের ? জাপানীরা তাহাকে বিশ্বাস করিত না, ইহাই কি গ্রেপ্তারের কারণ ?

সাক্ষী—আমি কেবল মতানৈক্যের কথাই জানি ; ইহার বেশী আর কিছুই জানি না।

শ্রীযুক্ত দেশাই—মোহন সিংহের গ্রেপ্তার ব্যতীত প্রথমে গঠিত ফৌজ ভাঙ্গিয়া দিবার আর কোন কারণ আছে কি ?

সাক্ষী—মোহন সিংহের গ্রেপ্তারই একমাত্র কারণ।

ইহার পর শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাইএর জেরা শেষ হয়।

জমাদার আলতাফ রেজ্জাকের সাক্ষ্য

২৩শে নভেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীত্রয়ের বিচারকালে সরকারী সাক্ষী জমাদার আলতাফ রেজ্জাকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। জমাদার আলতাফ রেজ্জাক তাঁহার বিবৃতিতে স্বীকার করেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেওয়া না দেওয়া ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। তিনি আরও বলেন যে, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এক বক্তৃতায় একথাও বলিয়াছিলেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সকল সৈন্য রণাঙ্গনে যাইতে সাহসী হইবে না, তাহারা ইচ্ছা করিলে পিছনে থাকিয়া যাইতে পারিবে।

এ্যাডভোকেট জেনারেলের প্রশ্নের উত্তরে জমাদার আলতাফ রেজ্জাক বলেন যে, সিঙ্গাপুরে তিনি বন্দী হন এবং বিভিন্ন শিবিরে প্রেরিত হন। তিনি এক বৎসরকাল পোর্ট ডিক্সন শিবিরে ছিলেন। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারীতে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ পোর্ট ডিক্সনে আগমন করেন এবং সাক্ষীসহ সমস্ত ভারতীয় বন্দী অফিসারদের উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতা করেন। ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ আজাদ হিন্দ ফৌজের লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেলের ব্যাজ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট তিনি বলেন যে, ক্যাপ্টেন মোহন সিংএর গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অপর একটি বাহিনী গঠন করা হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যিনি যোগ দিতে স্বেচ্ছায় ইচ্ছুক তিনি তাঁহার শিবিরের কম্যাণ্ডাণ্টের মারফৎ সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের সদর ঘাঁটিতে নাম প্রেরণ করিতে পারেন।

শিবিরের অবস্থার উল্লেখ করিয়া সাক্ষী বলেন, ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ খান জানান যে, শিবিরের বাসিন্দাগণ ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে এবং তাহাদিগকে

কুঁড়ে ঘরের মেঝেতে শুইয়া ঘুমাইতে হয়। জামাকাপড়, খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধাবলী সরবরাহের ব্যবস্থাও সন্তোষজনক নয়। যুদ্ধবন্দীদের জন্যই এই রকম ব্যবস্থা থাকিবে, কিন্তু তাহারা যদি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করে, এই সকল অসুবিধা দূরীভূত হইবে। এই সময়ে কেহই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেয় নাই।

সাক্ষী ১৯৪৩ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেন। কারণ, শিবিরে তাঁহার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া যাইতে থাকে এবং জাপগণ তাহাদিগকে বলে যে, চাউর শিবিরের অসুস্থ বন্দীগণকে তাহাদের শিবিরে স্থানান্তরিত করা হইবে। কেবলমাত্র এই কারণেই তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেন। এই একই শিবির হইতে একটি জাঠ রেজিমেণ্টের সাড়ে তিন শত সৈন্যও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করে।

পোপা পাহাড়ে ক্যাপ্টেন সেহ্‌গল

সাক্ষী ও অন্যান্যকে পোর্ট ডিক্সন হইতে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সাক্ষী ৫নং গেরিলা রেজিমেণ্টে ছিলেন। বিদাদরীতে ঐ রেজিমেণ্টের তখন ট্রেণিং চলিতেছিল। কয়েক জায়গায় ঘুরাইবার পরে রেজিমেণ্টটিকে ১৯৪৫ সালের জানুয়ারীতে মিঙ্গালাডনে স্থানান্তরিত করা হয়। এই সময় ক্যাপ্টেন পি কে সেহগল রেজিমেণ্টের পরিচালক ছিলেন। তাঁহার ব্যাজে লেফটেনাণ্ট কর্ণেল লেখা ছিল, সাক্ষী তখন ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর লেফটেনাণ্ট।

সাক্ষী বলেন, ক্যাপ্টেন সেহগল তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত অফিসারকে মিঙ্গালাডনে এক বৈঠকে আহ্বান করিয়া বলেন যে, ঐ রেজিমেণ্ট পোপা পাহাড়ে যাইতেছে। তিনি সকলকে শৃঙ্খলার অনুবর্ত্তী হইতে বলেন। রেজি-

মেণ্টে তিনটি ব্যাটেলিয়ন এবং প্রত্যেক ব্যাটেলিয়নে অনুমান ৬৫০ সৈন্য ছিল। তাহাদের রাইফেল এবং ৩ ইঞ্চি ব্যাসের মর্টার ছিল।

সাক্ষী বলেন যে, তিনি যে রেজিমেণ্টে ছিলেন উহা পোপায় যাওয়ার পূর্ব্বে সুভাষচন্দ্র বসু উহা পরিদর্শন করেন। সুভাষ বাবু তখন বলিয়াছিলেন, গত বৎসর কেহ কেহ জাতীয় বাহিনী ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এবার যেন তাহা না হয়। যিনি সম্মুখ সংগ্রামে যাইতে নিজেকে যোগ্য মনে না করিবেন, তিনি থাকিয়া যাইতে পারেন। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ঐ রেজিমেণ্ট মিঙ্গালাডন হইতে পোপায় যায়। সাক্ষী অপর চারিজনের সহিত ২রা ফেব্রুয়ারী সেখানে পৌছেন। ক্যাপ্টেন সেহগল ১৫ই ফেব্রুয়ারী পোপায় পৌছেন এবং ক্যাপ্টেন ধীলন পূর্ব্বদিন সেখানে পৌছিয়াছেন কিনা সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করেন। নেহরু রেজিমেণ্ট [চতুর্থ গেরিলা রেজিমেণ্ট] এবং ৩০০ সৈন্য ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া পোপায় পৌছে। ক্যাপ্টেন ধীলন এই রেজিমেণ্টের অধিনায়ক। এই রেজিমেণ্টের সৈন্যদের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল ছিল; কাহারও বিছানা নাই, কাহারও বা রাইফেল নাই।

দলত্যাগীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা

১৯৪৫ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী লেফটেনাণ্ট কর্ণেল সেহগল সাক্ষী যে রেজিমেণ্টে ছিলেন সেই রেজিমেণ্টের সেনানীদের এবং রেজিমেণ্টের সদর ঘাঁটী কার্য্যালয়ের ষ্টাফ অফিসারদের এক বৈঠক আহ্বান করিয়া বলেন যে, চতুর্থ গেরিলা রেজিমেণ্টের এরূপ অবস্থা দেখিয়া তিনি লজ্জা বোধ করেন। তাঁহার রেজিমেণ্টের এরূপ অবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তিনি আরও বলেন যে, দল ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া যাহাকে সন্দেহ করা হইবে, তাহাকে রেজিমেণ্টের সদর ঘাঁটিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। ১৯৪৫ সালের মার্চ্চ মাসে লেঃ কর্ণেল সেহগল আর একটি বৈঠক ডাকেন। ২নং ডিভিসনের সকল অফিসারই

ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। লেঃ কর্ণেল সেহগল বলেন যে, ২নং ডিভিসনের সদর ঘাঁটির পাঁচজন অফিসার ১নং ব্যাটালিয়নের এলাকায় নৈশ পর্যবেক্ষণের জন্য গিয়া আর ফিরেন নাই, তাঁহারা আর্দালীসহ সরিয়া পড়িয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে ধরিবার জন্য একদল টহলদার সৈন্য পাঠাইয়াছেন। লেঃ কর্ণেল সেহগল তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত সৈন্য ও সেনানীদের এই ক্ষমতা দেন যে, ভবিষ্যতে কাহাকেও দল ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে দেখিলে তাহার পদের যোগ্যতা বিচার না করিয়া তাহাকে গুলী করিতে পারিবে।

জাপানী ট্যাঙ্কমারা মাইন

১৯৪৫ সালের ১০ই মার্চ ৭০।৭২টি জাপানী ট্যাঙ্কমারা মাইন পৌঁছে। ঐ সকল মাইনের ব্যবহার সম্বন্ধে জাপানীদের নিকট হইতে নির্দ্দেশ লইবার জন্য তিনি সাক্ষীকে বলেন। সাক্ষী নির্দ্দেশ লইয়া তাহা ১নং ব্যাটালিয়নের স্থাপার হাবিলদারকে দেন। তাহাকে ১৬টি ট্যাঙ্কমারা মাইন দেওয়া হয়।

২০শে মার্চ ক্যাপ্টেন সেহগল আর একটি বৈঠক ডাকিয়া বলেন যে, হয় তিনি আক্রমণ করিবেন অথবা মিত্রপক্ষ কর্তৃক আক্রান্ত হইবেন। "শত্রু যদি আমাদের আক্রমণ করিয়া একটি ব্যাটালিয়নের রণাঙ্গণে ব্যূহভেদ করে তাহা হইলে অপর দুইটি ব্যাটালিয়ন দৃঢ়ভাবে ঘাটি আগলাইয়া থাকিবে।" কারণ স্বরূপ তিনি বলেন যে, তাঁহারা পোপা ছাড়িয়া গেলে ১৫ হইতে ২০ মাইলের মধ্যে জল পাইবে না। অতঃপর তিনি ২নং ব্যাটালিয়নের পরিচালক ক্যাপ্টেন সন্ত সিংহকে চকপাডং-এ সসৈন্যে যাইবার নির্দ্দেশ দেন। ঐ ব্যাটালিয়নকে ৩০ হইতে ৩৫ মাইল অতিক্রম করিয়া গন্তব্য স্থানে পৌছিতে হয়। পোপা হইতে অনুমান ১৫ হইতে ২০ মাইল দূরে পিনিবিনে বৃটিশ সৈন্য ছিল।

শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাইর জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, পোর্ট ডিক্সনে পৌছাইবার পূর্বে তিনি জাপানীদের হেফাজতে ছিলেন। জীবন যাপনের

কুব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, সেই ব্যবস্থার জন্য জাপানীরাই দায়ী। জানুয়ারী কিংবা ফেব্রুয়ারী মাসে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ খানকে তিনি প্রথম দেখেন। ক্যাপ্টেন স্বেচ্ছাসৈনিক সংগ্রহের জন্য পোর্ট ডিক্সনে গিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত দেশাই—আপনি ঠিক জানেন আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত ছিল?

সাক্ষী—হাঁ, আমি ঠিক জানি। ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেওয়া না দেওয়ার ভার ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত দেশাই—পোর্ট ডিক্সন ক্যাম্পে যাওয়ার পূর্বে আপনি কাহার হেপাজতে ছিলেন?

সাক্ষী—জাপানীদের।

শ্রীযুক্ত দেশাই—আপনি জীবনযাপনের কুব্যবস্থা সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার জন্য জাপানীরাই কি দায়ী?

সাক্ষী—হ্যাঁ।

প্রশ্ন—ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ খান কেন ক্যাম্পে আসিয়াছিলেন?

উঃ—স্বেচ্ছাসৈনিক সংগ্রহ করার জন্য।

প্রঃ—ইহা কি সত্য যে, ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তিনি এরূপ খাঁটি লোক চান, যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য জাপানীদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করিবে।

উঃ—তিনি খাটি লোকের কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু জাপানীদের কথা বলিয়াছিলেন কিনা আমার স্মরণ নাই। ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রাণদানে প্রস্তুত ও মানসিক শক্তিসম্পন্ন লোক চাহিয়াছিলেন।

প্রঃ—এই বক্তৃতার আটমাস পরে আপনি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেওয়া স্থির করেন?

উঃ—হ্যাঁ।

প্রঃ—নিজের বুদ্ধি-বিবেচনায় আপনি যোগ দিয়াছিলেন ?

উঃ—ক্যাম্পে অনেককে বলিতে শুনিয়াছিলাম যে, এই অবস্থায় থাকার চেয়ে তাহারা ভারতের মুক্তির জন্য প্রাণ দেওয়াই স্থির কবিয়াছে।

সাক্ষী জানিতেন পোর্ট ডিক্সন ক্যাম্পের পরিচালক ক্যাপ্টেন রব নওয়াজ কিংবা করমচাঁদ ব্যাস স্বেচ্ছায় আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেন নাই।

পোপা সদর কার্য্যালয়ে ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয় বৈঠকের পর কয়েকজন আজাদ হিন্দ ফৌজ ত্যাগ করিয়া যায়। পরবর্ত্তী দুই সপ্তাহের মধ্যে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তের পর ক্যাপ্টেন বেদী ব্যতীত আর সকলকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

শ্রীযুক্ত দেশাইর প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ এক সপ্তাহের বেশী ডিভিসন পরিচালনা করেন নাই। শ্রীযুক্ত দেশাই জিজ্ঞাসা করেন, শাহ নওয়াজ ২৩শে ফেব্রুয়ারী আসিয়া ২৪শে ফেব্রুয়ারী চলিয়া যান এবং আবার ১২ই মার্চ আসেন, ইহা সাক্ষী জানেন কিনা।

সাক্ষী—আমি বলিতে পারি না। শাহ নওয়াজ কখন আসিয়া কখন চলিয়া যান স্মরণ নাই। মিঙ্গলাডনে সুভাষ বসু বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, যাঁহারা রণাঙ্গনে যাইতে চাহেন না তাঁহারা থাকিয়া যাইতে পারেন। ইহার পর কি ঘটিয়াছিল আদালত সে সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। "কেহ কি পিছনে রহিয়া গিয়াছেন ?" সাক্ষী বলেন, "সুভাষ বসু রেজিমেণ্ট পরিদর্শন করার পর জিজ্ঞাসা করেন, কেহ থাকিয়া যাইতে চায় কিনা। কেহই থাকে নাই।

নায়ক সন্তক সিং

ইণ্ডিয়ান সিগন্যাল কোরের নায়ক সন্তক সিং তাহার সাক্ষ্যে বলে যে ১৯৪২ সালের ৩১শে জানুয়ারী জোহর বারুতে সে জাপানীদের হাতে যুদ্ধবন্দী হয়।

সে সেপ্টেম্বর মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিলে তাহাকে হিন্দ ফিল্ড ফোর্স গ্রুপের ১নং সিগন্যাল কোম্পানীতে নিয়োগ করা হয়। এই বাহিনীর অ্যাডজুটাণ্ট মেজর সেহগল সিগন্যাল কোম্পানীর সমস্ত সৈন্যদের সমবেত করিয়া বলেন যে, নূতন যে আজাদ হিন্দ-ফৌজ গঠিত হইবে তাহাতে সকলের যোগ দেওয়া উচিত। তবে তিনি ঐ জন্য কাহারও উপর চাপ দিবেন না।

আহমদ নওয়াজ

২৪শে নভেম্বর—সামরিক আদালতে জমাদার আহমদ নওয়াজের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। জমাদার নওয়াজ মালয়ের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

সাক্ষী বলে বলে যে, ১৯৪২ সালের ৭ই জুন তাহাকে তাহার দলের আরও ৫২ জনের সহিত কুয়ালালামপুরের একটা যুদ্ধবন্দীশিবির হইতে সিঙ্গাপুরে লইয়া যাওয়া হয়। যাহারা আজাদ-হিন্দ-ফৌজে যোগদানে ইচ্ছুক ও যাহারা ইচ্ছুক নয় তাহাদের তালিকা তৈয়ারী করার জন্য সাক্ষীকে অনুরোধ করা হয়। তাহার ব্যাটালিয়নের মাত্র চার জন স্বেচ্ছায় যোগদানে রাজী হয়। যাহারা রাজী নহে তাহাদের সিঙ্গাপুর হইতে শেষ পর্য্যন্ত বুলার শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৩ই সেপ্টেম্বর বুলার শিবিরস্থ বড়লাটের কমিশন প্রাপ্ত অফিসারদের এবং একজন হাবিলদার ক্লার্ককে একটা বন্দীশিবিরে লইয়া যাওয়া হয়। দ্বিতীয় গুর্খা রাইফেলসের সুবাদার হরি সিং ঐ দলে ছিল। বন্দীশিবিরে পৌছিলে তাহাদের সারিতে দাঁড় করাইয়া পকেট হইতে কাগজ, ঘড়ি কলম প্রভৃতি সব কিছু বাহির করিয়া লওয়া হয়। উহার পর তাহাদের কাঁটা তারে ঘেরা এবং শসস্ত্র প্রহরী রক্ষিত একটা শিবিরে লইয়া যাওয়া হয়। বন্দীশিবিরে আনীত হওয়ার প্রথম রাত্রে প্রায় ১১টার সময়ে সান্ত্রী সাক্ষীকে আর এক জায়গায় লইয়া যায়। সাক্ষীকে বলা হয় যে, তাহাদের বরাতে অনেক দুর্ভোগ আছে। তাহারা শিক্ষিত লোক. কাজেই তাহারা

সবই বোঝে। আজাদ হিন্দ ফৌজে তাহাদের স্বেচ্ছায় যোগদান করা কর্ত্তব্য। সাক্ষীকে বলা হয় যে সুপ্রীম হেডকোয়ার্টারে মোহন সিংএর নিকট সাক্ষীর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ জমা হইয়াছে। 'যখন আপনি কুয়ালালামপুরে এবং সিঙ্গাপুরে ছিলেন তখন আপনি মুসলমানদের আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।' এইজন্যই সাক্ষীকে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানের জন্য উপদেশ দেওয়া হইতেছে। অন্যথা তাহার প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। সাক্ষী উত্তরে বলে যে, উহাতে সে ভীত নয়। তখন তাহাকে বলা হয় যে, ফৌজে যোগদানে অস্বীকৃতির পরিণাম কি, তাহা সে কাল বুঝিতে পারিবে।

পরদিন বন্দীশিবিরের প্রায় দুইশত কি আড়াই শত বন্দীকে সারিতে দাঁড় করান হইল। উহার পর তিনজন সৈন্য আসিয়া সাক্ষী ও অন্য সকলকে ডাবল মার্চ্চ করিতে নির্দ্দেশ দিল। ডাবল মার্চ্চ করিতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্যেরা লাঠি দিয়া প্রহার করিতে থাকে। মার্চ্চের পরিসমাপ্তিতে সৈন্যেরা তাহাদের থলি, বাঁশ ও টিন দিয়া থলিতে গোবর ভরিতে নির্দ্দেশ দিল। তারপর তাহাদের তিনশত গজ 'ডাবল মার্চ্চ' করিয়া বন্দীশিবিরের মধ্যে গিয়া গোবর ঢালিতে হয়। তাহাদের সঙ্গী সিপাহীরা ক্লান্ত হইয়া মাঝে মাঝে দাঁড়াইতে লাগিল, আর বন্দীরা তাহাদের পাশ দিয়া যাওয়ার সময়ে মারিতে লাগিল। কোনও বন্দী প্রহার এড়াইবার জন্য সিপাহীদের তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিলে, তাহাকে হাত নীচের দিকে নামাইতে নির্দ্দেশ দিয়া প্রহার করা হইতে থাকে।

গোবর সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হওয়ার পর একজন সেনানী সিপাহীদের প্রহার বন্ধ করিতে বলিয়া সাক্ষীদের গোবর, ছাই ও মাটি দিয়া মিশাইতে বলে। সাক্ষী বলে যে, নয়জন লোক ইহা করিতে থাকে। তাহাদের সকাল ৮টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত কাজ করিতে হইত, মাঝখানে বিশ্রাম থাকিত

এক ঘণ্টা। প্রত্যেক সন্ধ্যায় নাম ডাকা হইত। প্রথম সন্ধ্যাতেই সাক্ষীদের বলা হইল যে, যদি কেহ নিজেকে পীড়িত বলে এবং ডাক্তার পীড়া দেখিতে না পায়, তাহা হইলে ঐ বন্দীকে বার ঘা বেত মারা হইবে।

অতঃপর সাক্ষী বলে, একদিন এই অপরাধে একজন বন্দীকে বেত মারা হইল। ছয় ঘা বেতের পর সে অচেতন হইয়া পড়িলে শাস্তি দান বন্ধ করা হয়।

একদিন কাজ করার সময়ে একজনকে কাঁদিতে শোনা গেল। সাক্ষী অগ্রসর হইয়া দেখিল 'প্রায় ষাট গজ দূরে একজন খাকী পোষাক পরিহিত হস্তপদ-বদ্ধ বন্দীকে দুইজন সিপাহী প্রহার করিতেছে। লোকটা বেশী চিৎকার করিতে থাকিলে একজন অফিসার উচ্চৈস্বরে সিপাহীদের বলেন তোমরা ঠিকমত মারিতে জান না। অফিসার আসিয়া বন্দীর মুখ চাপিয়া ধরিতে বলিল, তারপর একজন সিপাহীর লাঠি নিয়া দুইবার মারিল। অফিসার উহার পর বলিল, এইভাবে মারিতে হয়।

সন্ধ্যায় নাম ডাকার সময়ে প্রত্যহ তাহাদের আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা হইত। কিন্তু ছয় দিন শিবিরে থাকার পরও কোনও বন্দী ফৌজে যোগদানে রাজী হইল না।

বন্দীশিবির তাহাদের পোকা ও কাঁকর মিশানো খুব সামান্য পরিমাণে ভাত খাইতে দেওয়া হইত। সঙ্গে থাকিত সামান্য লবণমিশ্রিত কিছু তরকারী সিদ্ধ। সাক্ষী কখনও আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেয় নাই।

শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাইএর জেরার উত্তরে সাক্ষী বলে যে, ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাহাদিগকে বন্দীনিবাসে লইয়া যাওয়া হয়। এই বন্দীনিবাসটি একটি স্বতন্ত্র জায়গায় অবস্থিত ছিল। বুলার ক্যাম্প প্রায় আট মাইল দূরে ছিল। যেখানে তাহাদিগকে রাখা হইয়াছিল সেই স্থানটি দৈর্ঘ্যে প্রায় চারিশত গজ এবং প্রস্থেও প্রায় চারিশত গজ হইবে।

এখানে আড়াই শত বন্দী ছিল এবং অবশিষ্ট সকলেই কর্ম্মচারী। কর্ম্মচারীগণ সকলেই জাতীয় বাহিনীর সদস্য ছিলেন। বন্দী ও কর্ম্মচারী ছাড়া সেখানে আর কেহই ছিল না। যাহারা স্বেচ্ছাসেবক হয় নাই। "বন্দী" বলিতে তিনি তাহাদিগকেই বুঝাইতেছেন! আড়াইশত বন্দীর মধ্যে তিনি দশ বার জনকে চিনিতেন। তিনি যাহাদিগকে চিনিতেন তাহাদের নাম হইতেছে লেঃ পুরুষোত্তম দাস, সুবেদার আমেদ খান, জমাদার সার্ভার খান, জমাদার ফকির মহম্মদ, জমাদার গুলাম মহম্মদ, জমাদর মহম্মদ শরিফ, জমাদার আল্লাবক্স, সুবেদার শের মহম্মদ, সুবেদার মেজর হরি সিং, হাবিলদার মহম্মদ খান এবং হাবিলদার চানান সা।

প্রঃ—অন্য কাহাকেও কি আপনি চেনেন না?

উঃ—না।

প্রঃ—বিশেষ বিবেচনার পর আপনি প্রশ্নের উত্তর দিবেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের সুবেদার আমেদ খানকে চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় কি?

উঃ—তাহাকে বন্দীনিবাসে লইয়া যাওয়া হয় কিন্তু কি অভিযোগে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় তাহা আমি জানি না।

প্রঃ—আপনি যাহাদের নাম করিলেন তাহাদিগকে চুরি অথবা শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। ইহাই কি সত্য?

উঃ—না, তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না।

শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই আদালতকে জানান যে, তাহাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত অভিযোগ ছিল ইহা প্রমাণ করার জন্যই তিনি সাক্ষীকে এই সমস্ত প্রশ্ন করিতেছেন।

প্রঃ—সুবেদার আমেদগণি কি আপনার বন্ধু ছিলেন?

উঃ—তিনি আমার ব্যাটালিয়ানের অন্তর্গত ছিলেন।

প্রঃ—তিনি আপনার বন্ধু ছিলেন কিনা আমি ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

উঃ—'বন্ধু' বলিতে আপনি কি বুঝাইতেছেন ?

প্রঃ—তাহার সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত কোন সম্পর্ক ছিল কিনা ?

উঃ—সুবেদার আমেদ খানের সঙ্গে আমার বিশেষ কোন বন্ধুত্ব ছিল না।

প্রঃ—ক্যাপ্টেন আর্শাদকে আপনি জানেন ?

উঃ—হ্যাঁ।

প্রঃ—ক্যাপ্টেন আর্শাদের হস্তক্ষেপের ফলেই কি সুবেদার আমেদকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় ?

উঃ—স্বতন্ত্র ক্যাম্প হইতে যখন সকলকে মুক্তি দেওয়া হয় তখন সুবেদার আলীকেও মুক্ত দেওয়া হয়। আমি যখন ঐ ক্যাম্পে যাই, সুবেদার আমেদ খান তখনও তথায় ছিল। অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

প্রঃ—কোন অপরাধে তাহকে কি তথায় আটক রাখা হইয়াছিল।

উঃ—আমি জানি না!

প্রঃ—সে কেন তথায় আছে তাহা আপনি কি কখনও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ?

উঃ—একটি স্বতন্ত্র তাঁবুতে তাহাকে রাখা হইয়াছিল। কাঁটা তার দিয়া ক্যাম্পগুলিকে পৃথক করা হয় এবং এক ক্যাম্পের লোক অন্য ক্যাম্প এ যাইতে পারিত না।

প্রঃ—তাঁবুতে সুবেদার আমেদ খানের সঙ্গে কতজন লোক ছিল ?

উঃ—তাহা আমি বলিতে পারি না, কারণ আমি সেখানে কখনও যাই নাই।

প্রঃ—আপনি কি বলিতে চান যে, আপনি যেখানে ছিলেন সেখান হইতে সুবেদার আমেদের ক্যাম্প দেখা যাইত না ?

উঃ—সুবেদার আমেদের তাঁবু এবং আমার তাঁবুর মধ্যে আর এক সারি তাঁবু ছিল।

শ্রীযুক্ত দেশাই-এর আরও কতকগুলি প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলে যে, বন্দী শিবিরে একটি বাগান ছিল। এই বাগানে তরিতরকারি ফলান হইত এবং বন্দীদিগকে এখানে কাজ করিতে হইত।

হাবিলদার ওলির্ত বাহাদুরের সাক্ষ্য

২৬শে নভেম্বর—লাল কেল্লায় সামরিক আদালতের জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকৃত একজন মুসলমান এবং একজন গুর্খা সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হয়। ইহারা উভয়েই সিঙ্গাপুরের পতনের অব্যবহিত পরেই গঠিত প্রথম জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করিয়া বন্দীদের উপর যে মারধোর এবং গুলী চালনা করা হইত তাহার কথা উল্লেখ করে। গুর্খা সাক্ষীটি ২।৯ গুর্খা রাইফেলের হাবিলদার ওলিত বাহাদুর। ১।১৪ বাহাওয়ালপুর পদাতিক বাহিনীর জমাদার মহম্মদ হায়াত বন্দী শিবিরে মারপিটের কথা বলে। সাক্ষী আরও বলে যে, ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ মুসলমানদের জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিতে অনুরোধ করিয়া বলেন যে হিন্দু এবং শিখগণ জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিয়াছে। মুসলমানগণ যদি যোগ না দেয় তাহা হইলে শিখ ও হিন্দুগণ ভারতবর্ষের মুসলমানদের উপর অত্যাচার করিবে। জেরায় সাক্ষী বলে যে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্যও করেন নাই কিম্বা ভয়ও দেখান নাই। শ্রীযুক্ত দেশাই সাক্ষীকে কতকগুলি প্রশ্ন করিলে সে যে জবাব দেয় তাহা বিচার আরম্ভের পূর্ব্বে সাক্ষাতের সময়ে যে সাক্ষ্য দিয়াছিল তাহার সহিত মিলে না।

প্রথম বাহাওয়ালপুর পদাতিক বাহিনীর জমাদার মহম্মদ হায়াত, নিসুন শিবিরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁহার বাহিনীর

অধিকাংশ মুসলমান ফৌজই জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকার করে। হিন্দু, শিখ ও কতিপয় মুসলমান ফৌজ জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিয়াছিল। তিনি আরও বলেন—আমি বরাবরই জাতীয় বাহিনীতে:যোগদানের বিরুদ্ধে ছিলাম। আমি বরাবরই আমার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী এবং সৈন্যদের ইহাতে যোগ না দিতে বলিয়াছি এবং জাতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইয়াছি।

ইহার পর সাক্ষীকে নিস্থন শিবির হইতে বিদাদরী শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু সেখান গিয়াও জাতীয় বাহিনী সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেনাবাহিনীর যে সমস্ত মুসলমান সৈন্য জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকার করে তাহাদের ১৯৪১ সালের জুলাই মাসের কোন এক সময় বন্দী শিবিরে লইয়া যাওয়া হয়। ঐ শিবিরে প্রায় চার শত হইতে ৫ শত সৈন্য ছিল। তাহাদের খানাতল্লাসী করিয়া সঙ্গের জিনিষপত্র এবং ভারতীয় বাহিনীর 'ব্যাজ' কাড়িয়া লওয়া হয়। সাক্ষী বলেন যে অফিসারদের নন কমিশনড এবং অন্য পদমর্য্যাদাসম্পন্ন—পৃথক করিয়া পৃথক পৃথক 'সেলে' বন্দী করিয়া রাখা হয়। তাহারা বিদাদরী শিবিরে পৌঁছিবার পরদিন সকাল বেলা একজন সুবেদার, একজন হাবিলদার, একজন ঝাড়ুদার এবং ছয়জন সিপাহী তাঁহাদের শিবিরে আসে এবং সাক্ষী ও অন্য এগার জনকে পৃথক করিয়া লইয়া যায়। ভাইসরয়ের কমিশনড অফিসার এবং সিপাহীদের সকলের হাতেই পাঁচ ফিট লম্বা এবং দুই ইঞ্চি পুরু লাঠি ছিল। তাহারা ঐ লাঠির সাহায্যে সাক্ষী এবং অনুসঙ্গী এগারজনকে প্রহার আরম্ভ করে। ঝাড়ুদারটি সাক্ষীকে প্রহার দিতে আরম্ভ করে এবং কুড়ি পঁচিশ ঘা খাইবার পর সাক্ষী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তাহার চৈতন্য ফিরিলে সে দেখে যে বাকী এগার জনও সেইখানে পড়িয়া আছে।

সাক্ষী এবং অন্যান্যদের রাস্তায় মাটি ভর্ত্তি করিয়া জোর কদমে প্রায় তিনশ গজ দূরে লইয়া যাইতে হইত। যাহারা জোর কদমে চলিতে

পারিত না, শান্ত্রী কর্ত্তৃক তাহারা প্রহৃত হইত। তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও তাহাদের রাত্রে ঘুমাইতে দেওয়া হইত না; রাত্রে তাহাদের শিবিরের ভিতর পাহারা দিতে হইত এবং বাহিরে অবস্থিত জাতীয় বাহিনীর শান্ত্রী প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর প্রশ্ন করিত। যদি তাহারা খুব জোরে কিংবা খুব আস্তে জবাব দিত তাহা হইলে তাহাদের প্রহার করা হইত এবং এইভাবে তাহাদের সারারাত জাগাইয়া রাখা হইত। তাহাদের জাতীয় বাহিনীর সকল সদস্য এমন কি ঝাড়ুদারদের পর্য্যন্ত সেলাম করিতে হইত।

একদিন সাক্ষী পাশ দিয়া যাইবার কালে জাতীয় বাহিনীর জনৈক শান্ত্রীকে লক্ষ্য না করায় তাহাকে বন্দুকের বাঁটের আঘাতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। তাহাদের সামান্য ভাত দেওয়া হইত এবং তাহাও কাঁকর মিশানো। তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সময় ছাড়া যথেষ্ট পরিমাণ পানীয় জলও দেওয়া হইত না। কাঁকর মিশানো চাল সম্বন্ধে শিবিরের অধিনায়ককে বলা হইলে তিনি বলেন যে তাহাদের ওই রকম খাদ্যই পরিবেশন করা হইবে। সাক্ষী তাহাকে বলিয়াছিল, আমাকে হত্যা করুন আমি আর এ অত্যাচার সহ্য করিতে পারিতেছি না। উত্তরে তিনি বলেন, আমি তোমাকে হত্যা করিব না, তুমি জাতীয় বাহিনীতে যোগ দাও। যদি তুমি জাতীয় বাহিনীতে যোগ দাও, তাহা হইলে তোমাকে এই বন্দীশিবির হইতে সরাইয়া লওয়া হইবে এবং তোমার প্রতি ভাল ব্যবহার করা হইবে; আর যদি যোগ না দাও তাহা হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত তোমার প্রতি এইরূপ ব্যবহারই করা হইবে। সাক্ষী এবং তাহার বারজন সাক্ষীকে ঐ শিবিরে সতেরো দিন রাখা হয়। যখন তাহাদের কেহ জাতীয় বাহিনীর ডাক্তারের নিকট অসুস্থতার কথা জানাইত তখনই তাহাদের "এ" এবং "বি" শ্রেণীভুক্ত করা হইত তাহাদের প্রত্যেককে বার ঘা করিয়া বেত মারা হইত।

বন্দীশিবির হইতে সাক্ষী এবং অন্যান্যদের সেলাতার শিবিরে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে তাহাদের জাতীয় বাহিনীতে যোগ দান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বক্তৃতা দেওয়া হয়; সাক্ষী অস্বীকার করিলে তাহাকে এবং অন্যান্যদের পৃথক করিয়া সেনানিবাসে রাখা হয়। তারপর তাহাদের আবার বন্দীশিবিরে লইয়া যাওয়া হয়। দ্বিতীয়বার সাক্ষী এবং তাহার এগারজন সঙ্গীকে একুশ দিন বন্দীশিবিরে রাখা হয়।

প্রতিদিনই তাহাদের সম্মুখে বক্তৃতা দেওয়া হইত এবং তাহাদের জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিতে বলা হইত। শিবিরের অধিনায়ক তাহাদের বলিতেন যে, তাহারা যদি জাতীয় বাহিনীতে যোগ না দেয় তাহা হইলে তাহাদের আগের ন্যায় ব্যবহারই পাইবে। তাহাদের আগের ন্যায় কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। তাহাদের স্বাস্থ্যের ক্রমশঃ অবনতি সত্ত্বেও কোনরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা তাহাদের জন্য করা হয় নাই। তাহাদের জন্য কেবলমাত্র প্রহারের ব্যবস্থাই বলবৎ ছিল। একদিন সাক্ষী তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল চাহিলে তাহাকে এবং তাহার জনৈক সঙ্গীকে ১৮ ঘা বেত মারা হয়। অসহ্য প্রহারের ফলে তাহারা 'আল্লাহ ও পীরদের স্মরণ করিলে তাহাদের বলা হইল যে, শিবিরের চৌহদ্দিতে আল্লাহ' নাই আছে শুধু শিবির কর্ত্তৃপক্ষ।

বন্দীশিবির হইতে তাহাদের সেলেতার শিবিরে লইয়া যাওয়া হয়। এই শিবিরের "ডি" চিহ্নিত অংশে জাতীয় বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক দল এবং "ডি১" চিহ্নিত অংশে যাহারা স্বেচ্ছাসেবক নয় তাহারা থাকিত। হাসপাতালেও স্বেচ্ছাসেবক দল এবং যাহারা স্বেচ্ছাসেবক নয় তাহাদের আলাদা রাখা হইত। প্রধান ঘাঁটি হইতে মাঝে মাঝে খাদ্য আসিত কিন্তু তাহা কেবল স্বেচ্ছাসেবকদেরই পরিবেশন করা হইত। সাক্ষী সাত আটদিন হাসপাতালে ছিল। হাসপাতাল হইতে তাহাকে পুনরায় সেলেতার শিবিরে লইয়া যাওয়া হয়। এখানেও তাহাকে জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিতে বলা হয় কিন্তু সে

ও তাহার দলের লোকেরা অস্বীকার করে। তাহাদের একমাসের মত সেলেতার শিবিরে রাখা হয়।

সেলেতার হইতে তাহাদের আড়াই হাজার হইতে তিন হাজার লোককে বুলের শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এখানেও তাহারা জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। তাহাদের সম্মুখে বক্তৃতা করা সত্ত্বেও যখন তাহারা অস্বীকার করে তখন সাক্ষী এবং অন্য এগারজনকে আবার বন্দীশিবিরে প্রেরণ করা হয়।

বন্দীশিবিরে আগের ন্যায় অত্যাচার চলিতে থাকে। এবার বন্দী-শিবিরে সাক্ষী কয়েকজন লোককে প্রহার করিতে দেখে, একদিন রাত্রি ৯ টার সময় যখন সে ডিউটীতে ছিল তখন সে একজন সুবাদার ও পাঁচ ছয় জন লোক দ্বারা দুইজন শিখকে প্রহৃত হইতে দেখে। রাত্রি একটা পর্য্যন্ত শিখ দুইটীকে মারধোর করিয়া নিকটবর্ত্তী হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। সুবেদার এবং তাহার জনৈক ঝাড়ূদারকে শিখ দুইটি মারা গিয়াছে কিনা খোঁজ লইতে বলে। শিখ দুইটির অবস্থা তখন অত্যন্ত সঙ্কটজনক ছিল। পরদিন সকালে সাক্ষী শিখ দুইটিকে পা বাধা অবস্থায় মাটিতে মুখ চুমড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখে। এইবার সাক্ষী একুশ দিন বন্দী শিবিরে ছিল। ইহার পর তাহাদের সেলেতারের 'ডি ও' শিবিরে লইয়া যাওয়া হয় এবং পূর্ব্বে যেখানে রাখা হইয়াছিল, এখানে অবস্থান কালে বিমান ঘাঁটি তৈরীর কাজে অর্থাৎ ট্রেঞ্চ খনন ইত্যাদি ব্যাপারে তাহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হয়, তাহারা ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই শিবিরে ছিল।

২৭শে নভেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারকালে সামরিক আদালতে প্রতিপক্ষের কৌঁসুলী মিঃ ভুলাভাই দেশাই হাবিলদার ওলিত বাহাদুরকে পুনরায় জেরা করেন। জেরার উত্তরে হাবিলদার ওলিত বাহাদুর বলে যে, শাস্তিমূলক-ভাবে জাপদের জন্য তাহাদিগকে যে খাটুনী খাটিতে হইবে তাহা লইয়া মতভেদ

দেখা দেয়। যাহারা আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেয় নাই তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য খাটানো হইত। তাহাদের কোন কোন নেতা তাহাদিগকে পরামর্শ দেন যে, এই খাটুনীতে যেন তাহারা আপত্তি না করে। ইহা সত্ত্বেও কেহ কেহ এই পরামর্শ মানে নাই। তাহাদিগকে জানান হয় যে, তাহাদিগকে জাপদের নিকট কাজ করিতে হইবে ; আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে তাহাদের করণীয় কিছু নাই।

মিঃ দেশাই—তোমাদের কেহ কেহ খাটিতে রাজী নও বলিয়া শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য কি প্রহরী পাঠান হইত ?

সাক্ষী—হাঁ।

প্রশ্ন—প্রহরীগণ কি দলের নেতাগণকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আসিয়াছিল ? —হাঁ।

প্রঃ—তোমরা কতজন ছিলে ?—আমরা প্রায় সাড়ে পাঁচ শত লোক ছিলাম।

প্রঃ—প্রহরীদের সঙ্গে কোন বিরোধ দেখা দিয়াছিল ?—হাঁ।

প্রঃ—প্রহরীরা তোমাদিগকে বিরুদ্ধতা না করিবার জন্য সতর্ক করিয়াছিল এবং বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিয়াছিল ?—হাঁ। আমরা যখন প্রহরীদের কথা মানিলাম না তখন তাহারা গুলী চালায়। তাহারা আমাদের নিকট আজাদ হিন্দ ফৌজের কথা বলে।

প্রঃ—প্রথমে তাহারা ফাঁকা আওয়াজ করে। কিন্তু তোমরা যখন তাহাদের কথা অমান্য কর তখন তোমাদের উপর গুলী চালায় ?—হাঁ। গুলী বর্ষণের পর দুই তিনজন লোক আহত হয়।

প্রঃ—তোমরা কি প্রহরীদের অনুসরণ করিয়াছিলে ?—হাঁ।

সাক্ষীকে পুনরায় পরীক্ষা করিতে গিয়া য়্যাডভোকেট জেনারেল স্যার এন, পি ইঞ্জিনিয়ার জিজ্ঞাসা করেন প্রহরীগণ যখন আসে তখন প্রকৃত কি ঘটিয়াছিল ?

মিঃ ভুলাভাই দেশাই—আমি এই প্রশ্নে আপত্তি করি। ইহা পুনরায় পরীক্ষা নয়।

মেজর জেনারেল ব্ল্যাকল্যাণ্ড—সাক্ষী কোন উত্তর দেয় নাই। প্রকৃত চিত্র জানা বাদীপক্ষের দরকার।

জজ অ্যাডভোকেট—জেরার ভিতরই কি প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় নাই?

মিঃ দেশাই—যাহা ব্যাখ্যা করা হয় নাই তাহাই পুনরায় পরীক্ষা করা যায়।

উক্ত আপত্তি বাতিল হইয়া যায়।

অ্যাডভোকেট জেনারেলের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলে যে, প্রহরী ও যুদ্ধ-বন্দীদের মধ্যে বিরোধের কারণ এই যে, বক্তৃতার সময় তাহারা প্রহরীদের আবির্ভাবের প্রতিবাদ জানায়।

অ্যাডভোকেট জেনারেল—বিরোধের আসল কারণ কি তাহা বল?

আদালত এই প্রশ্ন বাতিল করিয়া দেন।

আদালতের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলে যে, একমাস কি দেড়মাস পরে তাহার হাটু হইতে বুলেট বাহির করা হয়। সে তখন বিদাদরী হাসপাতালে ছিল।

রবিলালের সাক্ষ্য

সরকার পক্ষের পরবর্ত্তী সাক্ষী ২০৯ গুর্খা রাইফেল রেজিমেণ্টের রাইফেল-ম্যান রবিলাল বলেন যে, সিঙ্গাপুরের পতনের পর যখন সে বিদাদরী শিবিরে ছিল তখন আজাদ হিন্দ ফৌজে তাহার ব্যাটালিয়ানকে যোগ দিবার অনুরোধ করিয়া বক্তৃতা দেওয়া হয়। বক্তাগণ বলেন যে, ব্যাটালিয়ানের ভাইসরয় কমিশনড ও নন-কমিশনড অফিসারগণকে একটি বন্দী শিবিরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং যাহারা আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ না দিবে তাহাদিগকেও অনুরূপ কোন বন্দী শিবিরে প্রেরণ করা হইবে। সাক্ষী আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে অসম্মত হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের জনৈক অফিসার সাক্ষীর সঙ্গে

আলাপ করেন এবং বলেন যে, সে যদি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ না দেয় তবে তাহাকে বন্দীশিবিরে প্রেরণ করা হইবে।

১৯৪২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় আজাদ হিন্দ ফৌজের জনৈক অফিসার সাক্ষীর ব্যাটালিয়ানের উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতা দেন। ইহার পর ব্যাটালিয়ানের সমস্ত সৈন্যকে একত্রিত করা হয়। ব্যাটালিয়ানের দুই একজন লোক তখন আহার করিতেছিল বলিয়া তাহাদিগকে সকলের সঙ্গে একত্রিত করা হয় নাই। পরে তাহাদিগকে সমবেত ব্যাটালিয়ানের সম্মুখে আনিয়া লাঠি দ্বারা প্রহার করা হয়। সেখানে রাইফেল ও বেয়নেটধারী ১৫ হইতে ২০ জন এবং লাঠিধারী ও ৬।৭ জন প্রহরী ছিল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ব্যাটালিয়ানের ঝাড়ুদার এবং খানসামাগণকে বলেন যে, তাহারা ভারতের অধিবাসী; সুতরাং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করিবার জন্য তাহাদের আগাইয়া আসা উচিত। খানসামাগণ উত্তর দেয়, "আমরা দীর্ঘকাল গুর্খা রেজিমেণ্টের কাজ করিয়াছি। তাহারা যদি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেয় তবে আমরাও যোগ দিব।" উত্তর শুনিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারগণকে প্রহার করিবার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের দুইজন সৈন্যকে আদেশ দেন। প্রহারের ফলে দুইজন খানসামা মাটিতে পড়িয়া যায়।

অতঃপর আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারটি ব্যাটালিয়ানের উদ্দেশ্যে বলেন যে, যেহেতু তাহারা বৃটিশ সরকারের অনুগত সেই হেতু তিনি তাহাদিগকে শত্রু বলিয়া মনে করেন এবং তিনি তাহাদিগকে এই মনোভাবের পরিণতি দেখাইবেন। অফিসার বি ব্যাটালিয়ানের কয়েকজনের নাম ধরিয়া ডাকেন এবং তাহাদিগকে প্রহারের আদেশ দেন। চার জনের প্রহারের পর পঞ্চম ব্যক্তিকে এমনভাবে প্রহার করা হয় যে, সে মাটিতে পড়িয়া যায়। অফিসারটি প্রহার বন্ধ না করিয়া নিজে মাটিতে পতিত ব্যক্তিটিকে লাথি মারেন।

ইহা দেখিয়া সমগ্র ব্যাটালিয়ান মর্ম্মাহত হয় এবং তাহাদের চোখে জল আসিয়া পড়ে। তাহারা তখন দাঁড়াইয়া পড়ে এবং প্রতিবাদে জানায় এবং বলে যে, যদি তোমরা আমাদের হত্যা করিতে চাও তবে সমগ্র ব্যাটালিয়ানটিকেই হত্যা করিতে পারো। কিন্তু আমরা আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিব না। অফিসারটি তখন ব্যাটালিয়ানকে জিজ্ঞাসা করেন যে, বিনা আদেশে তাহারা কেন দাঁড়াইয়াছে এবং প্রহরীগণকে গুলী চালাইবার আদেশ দেন। প্রহরীগণ ফাঁকা আওয়াজ করে। ইহাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের অপর এক অফিসার প্রহরী-গণকে জিজ্ঞাসা করেন, "এই গুর্খারা কি তোমাদের বাবা যে ফাঁকা আওয়াজ করিতেছ? ইহাদের উপর গুলী চালাও। তখন প্রহরীগণ গুর্খাদের উপর গুলী চালায়। গুর্খাদের হাতে কোন অস্ত্র বা লাঠি ছিল না। সুতরাং তাহারা বাঁচিবার কোন আশা দেখিতে পায় না। তাহারা সকলে প্রহরীদের দিকে অগ্রসর হইয়া কাঠের চপ্পল ছুঁড়িতে থাকে। প্রায় আধ ঘণ্টাকাল গুলী চলে, এবং ৮ জন গুর্খা আহত হয়।

গুলী চালনার পর ব্যাটালিয়ানটিকে মার্চ করিয়া একটি বন্দীশিবিরে লইয়া যাওয়া হয়।

সাক্ষী যখন বিদাদরী শিবিরে ছিল তখন তাহার ব্যাটালিয়ানের কয়েকজন লোক আজাদ-হিন্দ ফৌজের অধীনে শাস্তিমূলক মজুরী খাটিতেছিল এবং অন্যান্যেরা পরিখা খনন করিতেছিল। সাক্ষী এই শাস্তিমূলক শ্রমকার্য্যে কখনও আপত্তি করে নাই এবং যতদূর জানে, ব্যাটালিয়ানের অন্য কেহও আপত্তি তোলে নাই।

সাক্ষীকে যখন বন্দী শিবিরে আনয়ন করা হয় তখন শিবিরের ফটকে প্রহরায় রত আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন অফিসার ও তিন-চারজন সৈন্য গুর্খাদের খানাতল্লাস করে। গুর্খাগণকে ছাদ বিহীন কাঁটা তার ঘেরা একটি স্থানে রাখা হয়। ঘেরাও জায়গাটি এত ক্ষুদ্র যে, ব্যাটালিয়ানের অধিকাংশ লোক ইহার

ভিতর বসিতেও পারে নাই এবং সমগ্র রাত্রি তাহাদিগকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। তাহাদের কোন পোষাকাদি ছিল না, এই অবস্থাতেই সমগ্র রাত্রি তাহাদিগকে অতিবাহিত করিতে হয়।

পরদিন বেলা ১০।১১ টার সময় বন্দীশিবিরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ১৪ জনকে পৃথক করিয়া রাখিয়া তাহাদিগকে বিদাদরী শিবিরে পুনরায় যাইবার আদেশ দেন।

বিদাদরি শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া গুর্খা বাহিনীকে পূবের মতই শ্রমসাধ্য কাজ করিতে হয়। বিদাদরীতে এক মাস রাখার পর তাহানিগকে পুনরায় আটক শিবিরে পাঠান হয়। গুর্খাদের আটক- শিবিরে আসার পরদিন হইতে শিবির কর্তৃপক্ষ তাহাদের উপর প্রহার আরম্ভ করেন এবং তাহাদিগকে দিয়া শ্রমসাধ্য কাজ করান হইতে থাকে। পাঁচ দিন এরূপ চলে।

প্রথম দুই দিন তাহাদের জন্য কোন খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল না তৃতীয় দিন তাহাদিগকে আহার করিতে আদেশ দিল গুর্খারা তাহাদিগকে আটকশিবিরে ফিরাইয়া আনার প্রতিবাদ করিয়া বলে যে, তাহাদিগকে কোথায় রাখা হইবে এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাহারা আহার করিবে না। এখানে পাঁচ দিন রাখার পর তাহাদিগকে পুনরায় বিদাদরী শিবিরে লইয়া যাওয়া হয়।

আটক-শিবিরের অধিকাংশ কর্মচারীই আজাদ হিন্দ ফৌজের লোক ছিল।

মিঃ আসফ আলীর জেরা

মিঃ আসফ আলীর জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাস হইতে সিঙ্গাপুরের পতনের সময় পর্যন্ত সাক্ষীর সেনাদল মালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছিল।

মিঃ আসফ আলী—কি শিক্ষা? জঙ্গল যুদ্ধবিদ্যা না পশ্চাদপসরণের বিদ্যা, না উভয়ই? (হাস্য)

সাক্ষী—আক্রমণমূলক যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা।

মিঃ আসফ আলী অতঃপর পরবর্তী ঘটনাবলী, আলোচ্য সেনাদলের পশ্চাদপসরণ ও পশ্চাদপসরণের সময় প্রদত্ত রেশন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিতে থাকিলে সরকার পক্ষের কৌসুলী স্যার নসীরবান ইঞ্জিনীয়ার এই প্রশ্নগুলির প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

মিঃ আসফ আলী —আপনি যে সকল প্রশ্ন করিতেছিলেন, সেগুলি প্রাসঙ্গিক বলিয়া আমি মনে করিতে পারি নাই।

স্যার নসীরওয়ান—তাহা আপনার দুর্ভাগ্য।

মিঃ আসফ আলী—আমার দুর্ভাগ্য, না আপনার? আমি সমগ্র ব্যাপারের ইতিহাস অনুধাবন করিতেছি। রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, নিপীড়ন ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। ঐ সময়ে বাস্তবিক কি ঘটিয়াছিল, আমি তাহাই দেখিতে চাই। স্যার নসীরওয়ান যে দুর্ভাগ্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অহেতুক। আমি দুর্ভাগ্য স্বীকার করিব না।

জজ এডভোকেট—আমাদের শান্তভাবে আদালতের কার্য্য নির্বাহ করা উচিত।

মিঃ আসফ আলী—দুর্ভাগ্যসূচক কোন মন্তব্য শুনিবার মত কিছুই বলি নাই। তাঁহার যতখানি দুর্ভাগ্য, তদপেক্ষা আমার দুর্ভাগ্য বেশী কেন হইবে?

এডভোকেট জেনারেল বলেন যে আদালত যদি মিঃ আসফ আলীকে প্রশ্ন করিবার অনুমতি দেন, তবে তাহার আপত্তি নাই।

মিঃ আসফ আলী তখন রেশন সংক্রান্ত প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করেন।

সাক্ষী বলেন যে, পশ্চাদপসরণের সময় বৃটিশ সৈন্যদের প্রতি খাদ্য ও অন্যান্য স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে পক্ষপাতিত্ব করা হয় নাই।

মিঃ আসফ আলী—আপনি কি বলিতে চান যে, বৃটিশ ও আপনারা একই রেশন পাইতেছিলেন?

সাক্ষী—পশ্চাদপসরণের সময় বৃটিশ ও আমাদের রেশন একই ছিল—আমরা তাহা খাই আর না খাই।

আদালতের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ আসফ আলী বলেন যে, তিনি ইহাই দেখাইতে চাহেন, সাক্ষী সরকার পক্ষকে খুসী করিতে চাহিতেছেন। সাক্ষী বলিতেছেন যে বৃটিশ ও ভারতীয় উভয়কে একই প্রকার রেশন দেওয়া হইত, অথচ এ সকল বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে কত প্রশ্নই না লেখা হইয়া গেল।

মিঃ আসফ আলী জিজ্ঞাসা করেন যে, পশ্চাদপসরণের সময় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কেও বৃটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যে সমব্যবহার করা হইত কি না?—হাঁ।

. মিঃ আসফ আলী —আপনাদিগকে কি অষ্ট্রেলিয়ানদের নিকট রেশন বহন করিয়া লইয়া যাইতে বলা হইত?

সাক্ষী হাঁ বলেন এবং ইহাও বলেন যে তিনি একবার মাত্র রেশন বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

প্রশ্ন—অষ্ট্রেলিয়ান বা বৃটিশ সৈন্যরা কি ভারতীয়দের জন্য রেশন বহন করিত?

উত্তর—আমি জানি না।

সাক্ষী বলেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেওয়া না দেওয়া সম্বন্ধে বিদাদরী শিবিরে বন্দীদের মধ্যে আলোচনা হইত।

প্রশ্ন—আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে বলিলে যাহারা রাজভক্ত তাহারা ক্রুদ্ধ হইত?

উত্তর—ইহা সত্য যে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানের আলোচনায় রাজভক্তরা ক্রুদ্ধ হইত। যাহারা আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়াছে, তাহারা অন্যকে প্ররোচিত করিতে আসিলে, যাহারা যোগ দেয় নাই, তাহারা ক্রুদ্ধ

হইত। সাক্ষী আরও বলেন—আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসাররা যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে আমাদের নিকট বক্তৃতা করিতে আসিতেন, তখন তাঁহাদিগকে আমরা চলিয়া যাইতে বলিতাম না। কিন্তু তাহারা আসিয়া যখন আমাদিগকে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে বলিতেন তখন আমরা অন্তরে ক্রুদ্ধ হইতাম।

সাক্ষী রবিলাল বলে যে, বিদাদরী, শিবিরে তাহারা প্রায় ছয় শত জন ছিল। তাহাদিগকে শ্রমসাধ্য কাজ করিতে দেওয়া হইত এবং তাহারা তাহা করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক ছিল। সাক্ষী শিবিরে কাহাকেও শ্রমসাধ্য কার্যের অবসান ঘটান সম্পর্কে কোন আলোচনা করিতে শুনে নাই।

মিঃ আসফ আলী—ওলিত বাহাদুর কি আপনাদের সঙ্গে শিবিরে ছিলেন।

প্রঃ—ওলিত বাহাদুর আদালতে বলেন যে, শ্রমসাধ্য কাজ করান সম্পর্কে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়।

উঃ—আমি এ সম্বন্ধে কিছু জানি না। শ্রমসাধ্য কাজ করান সম্পর্কে কোন বিবাদ হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। শ্রমসাধ্য কাজ সম্পর্কে আমি ওলিত বাহাদুরের সঙ্গে কোন কথা বলি নাই।

সাক্ষী বলেন যে, হাঙ্গামার সময় প্রায় ১৫।২০ জন রক্ষী ছিল। তাহাদের হাতে রাইফেল ছিল, কতকজনের হাতে লাঠি ছিল।

প্রঃ—কয়েকজন রক্ষী পলাইয়া গিয়াছিল, ইহা সত্য কি?

উঃ—যে সব রক্ষীর হাতে লাঠি ছিল, আমরা আক্রমণ করিলে তাহারা পলাইয়া যায়।

মিঃ আসফ আলী—আপনারা কতজনে মিলিয়া রক্ষীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

উঃ—আমরা ৫০০ হইতে ৬০০ জন ছিলাম। প্রায় ৩ শত হইতে সাড়ে ৩ শত জনের নিকট কাষ্ঠপাদুকা ছিল।

এডভোকেট জেনারেলের দ্বিতীয়বার জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, তাঁহার সাক্ষ্যে উল্লিখিত দুইটি বিবৃতি অভিযুক্ত অফিসারত্রয়ের বিরুদ্ধে মামলা সম্পর্কে গৃহীত হইয়াছিল। আদালতের প্রশ্নের উত্তরেও সাক্ষী ঐ কথার পুনরুক্তি করেন।

সুবেদার রামস্বরূপের সাক্ষ্য

সরকার পক্ষের পরবর্তী সাক্ষী সুবেদার রামস্বরূপ নামক জনৈক সামরিক কেরাণী বলেন যে, সিঙ্গাপুরের পতনের পূর্ব দিন তিনি পলায়নের জন্য দল ত্যাগ করেন এবং বেসামরিক পোষাক পরিয়া বেসামরিক লোকদের সহিত মিশিয়া যান। ১৯৪২ সালের ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত তিনি সিঙ্গাপুরে ছিলেন। এমন সময় তাঁহার জনৈক কেরাণী-বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষী অসুস্থ ছিলেন। বন্ধুটি সাক্ষীকে সেলেটার শিবিরে যাইতে বলে। ঐখানে তখন তাহার দলের অন্যান্য লোক ছিল।

সেলেটারে সাক্ষীকে এক শিবিরে রাখা হয়। যাহারা আজাদ হিন্দ ফৌজে স্বেচ্ছাসেবক হয় নাই, তাহাদিগকে ঐ সকল শিবিরে রাখা হইত। আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে বলিয়া ঐ সকল শিবিরে কয়েকবার বক্তৃতা দেওয়া হয়; কিন্তু সাক্ষী যোগ দেন নাই।

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে সাক্ষী ও অন্যান্য পাঁচ জনকে এক আটক শিবিরে লইয়া যাওয়া হয়। তাহাকে বলা হয় যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ বিরোধী প্রচার কার্য্যের অপরাধে তাহাকে তথায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। সাক্ষী অতঃপর নির্য্যাতন কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলেন, জনৈক অফিসারের উত্তরে তিনি বলেন যে তিনি আরও নির্য্যাতন ভোগ করিতে প্রস্তুত আছেন কিন্তু তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিবেন না।

যে সকল অফিসার সাক্ষীকে জেরা করিয়াছিলেন. তাহারা তাঁহাকে গালাগালি দেয়, হাত বাঁধিয়া রাখে, মুখে ঘুষি মারে, লাথি দেয় ও লাঠি দিয়া প্রহার করে। অবশেষে সাক্ষী অজ্ঞান হইয়া পড়েন। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে অফিসার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে ইচ্ছুক আছেন কি না। সাক্ষী এইবার সম্মত হন। কারণ তিনি মনে করেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেওয়াই ভাল।

শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই কর্ত্তৃক জেরা

শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই-এর জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজে ক্যাপ্টেন এস এন মালিকের অধীনে ছিলেন। তাঁহাকে গুপ্তভাবে ভারতবর্ষে যাইবার আদেশ দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের সীমান্তে পৌছিয়া প্রায় ২০।৩০ দিন পর তিনি বাড়ি ফিরিয়া যান ও ফিরোজপুরে তাঁহার ডিপোতে তাঁহার উপস্থিতি জ্ঞাপন করেন।

প্রশ্ন—কি উদ্দেশ্যে আপনাকে ভারতবর্ষে পাঠান হইয়াছিল ?

উত্তর—দেশের সামরিক অবস্থা জানিবার জন্য।

প্রশ্ন—আপনি কি আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন গুপ্তচর ছিলেন ?

উত্তর—হ্যাঁ।

প্রশ্ন—আপনি আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন বিশ্বস্ত লোক ছিলেন ?

উত্তর—তাঁহারা আমাকে বিশ্বাস করিতেন।

প্রশ্ন—তাঁহারা ভুল করিয়াছিলেন। নয় কি ? (কোন উত্তর নাই)

প্রঃ—তাঁহারা আপনাকে বিশ্বাস করিতেন। এজন্যই তাঁহারা আপনাকে ঐ কাজে পাঠাইয়াছিলেন ?

উত্তর—হ্যাঁ।

প্রঃ—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি বিশ্বস্ত থাকিতে চান নাই।

উত্তর—আপনি যদি আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি বিশ্বাস থাকার কথা বলেন, তবে আমার উত্তর—"না"।

প্রঃ—কিন্তু যাহারা সর্বপ্রথমে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়াছিলেন, আপনি কি তাঁহাদের একজন নহেন?—হাঁ।

প্রঃ—এবং আন্দোলনে আপনার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল?

উত্তর—না। আমাকে যোগ দিতে বলা হইয়াছিল, তাই আমি যোগ দিয়াছিলাম।

প্রঃ—আপনার লেখাপড়া কতদূর?—আমি একজন ম্যাট্রিকুলেট।

প্রঃ—আমার প্রশ্ন অত্যন্ত সরল। আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশ্য কি এই ছিল না যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা এবং আপনি তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন?—হ্যাঁ।

প্রঃ—সুতরাং আজাদ হিন্দ ফৌজে আপনি স্বেচ্ছায় যোগ দিয়াছিলেন। —হ্যাঁ।

প্রঃ—আপনি যখন যোগদান করিয়াছিলেন, তখন আপনি আন্দোলনে আস্থাবান ছিলেন।

সাক্ষী উত্তর দিতে বিলম্ব করিতে থাকিলে শ্রীযুত দেশাই বলেন—"ইহার জন্য এত ভাবিবার কিছু নাই। উত্তর দিন।"

উত্তর—হ্যাঁ।

সাক্ষী বলেন যে, তিনি যখন ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেন তখন ইতিমধ্যেই স্বেচ্ছায় অনেকে যোগ দিয়াছিলেন। সেলেটার শিবিরে তিনি শুনিতে পান যে, আন্দোলন অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। লোক স্বেচ্ছায় আন্দোলনে যোগ দিতেছিল।

মিঃ দেশাই—আপনি আন্দোলনে বিশ্বাস করিতেন।

সাক্ষী—ঐ সময়ে আমি বিশ্বাস করিতাম না।

প্রঃ—কিন্তু পরে আপনি আন্দোলনে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন এবং স্বেচ্ছায় যোগ দিয়াছিলেন। যোগ দেওয়া না দেওয়া নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত।

উত্তর—তখন আমি যোগ দেওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিলাম।

প্রঃ—আমি আপনাকে বলিতেছি, আপনি স্বেচ্ছায় যোগ দিয়াছিলেন। আপনার কোন অভিযোগ ছিল না। আপনি সেনা-বাহিনীতে পুনরায় ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন তাই নিজেকে বাঁচাইবার জন্য আপনি এই কাহিনী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

উত্তর—না আমি কাহিনী উদ্ভাবনা করি নাই।

প্রঃ—আপনি যখন গুপ্তচরের কার্য্য করিতে আসিয়াছিলেন তখন আপনার অভিপ্রায় কি ছিল ?

উত্তর—আমার উদ্দেশ্য ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য সংবাদ সংগ্রহ করা। আমি আজাদ হিন্দ ফৌজ ত্যাগ করিতে চাই নাই।

আদালতের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, আটক-শিবিরে তাঁহাকে যে খাঁচায় রাখা হইয়াছিল তাহার ভিতর তিন জন লোক প্রবেশ করিতে পারিতে। আটক-শিবির বিদাদরী ক্যাম্প হইতে তিন পোয়া মাইল দূর ছিল।

মহীন্দ্র সিং-এর সাক্ষ্য

আজাদ হিন্দ ফৌজের অপর একজন গুপ্তচর ল্যান্সনায়ক মহীন্দ্র সিং বলেন যে তিনি মোহন সিং কর্তৃক গঠিত প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাকে ছদ্মবেশ ধারণের ও ভারতে গিয়া নাশকতামূলক কার্যের জন্য শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। তিনি প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসবান ছিলেন কিন্তু উহার নেতা মোহন সিং গ্রেপ্তার হইলে তিনি দ্বিতীয়

আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যাহা হউক ভারতবর্ষে চলিয়া যাইবার সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে তিনি তাহাতে যোগ দেন। কিভাবে তিনি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন তাহা বর্ণনা করেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যান এবং সীতা হিল নামক নিকটবর্তী এক পাহাড় হইতে তাঁহাকে রেশন আনিবার জন্য পাঠান হইলে তিনি এক বৃটিশ রেজিমেণ্টের সাক্ষাৎ পান এবং উহার নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

সিপাহী দলসা খানের সাক্ষ্য

২৮শে নভেম্বর মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে ১।১৭ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের সিপাহী দলসা খানের সাক্ষ্য প্রথমে গৃহীত হয়। সাক্ষী বলে যে প্রথমে সে আজাদ ব্রিগেডে ছিল, পরে তাহাকে বসু ব্রিগেডের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন শাহনওয়াজ একদিন এইরূপ বক্তৃতা দেন; আমাদের এই ব্রিগেডই প্রথম রণাঙ্গনে যাইবে। নির্ব্বাচিত সৈন্যদের লইয়া এই দল তৈয়ারী হইয়াছে। যুদ্ধে আমাদিগকে বহু কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, এমন কি মৃত্যুও বরণ করিতে হইতে পারে। যদি কেহ কষ্ট সহ্য বা মৃত্যুবরণে ভয় পায়, সে যেন এখনই সরিয়া দাঁড়ায়। আমাদের স্বাধীনতার জন্য লড়িতে হইবে। এ যুদ্ধে আমরা ভীরুদের চাহিনা, আমরা চাই সাহসী লোকদের।

আমাদের মিত্রশক্তি জাপানীদের পাশাপাশি দাড়াইয়া আমরা যখন লড়িব, তখন নিজেদের নিকৃষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়া আমাদের জাতির অবমাননা করিলে চলিবে না। ভারতে পৌছিলে আমরা বহু নরনারীর সম্মুখীন হইব। বয়োজ্যষ্ঠা নারীদের আমরা মাতারূপে এবং কনিষ্ঠদের ভগ্নী ও কন্যারূপে বিবেচনা করিব। যদি কেহ এই নির্দ্দেশ অমান্য করে তাহা হইলে তাহাকে গুলি করিয়া তাহাকে হত্যা করা হইবে। ভারত স্বাধীন হইলে, আমাদের বর্ত্তমান সহযোগী জাপানীরা যদি আমাদের উপর

প্রভুত্ব করার চেষ্টা করে, তাহা হইলে আমরা তাহদের সহিতও লড়াই করিবে। এমন কি, এখনও জাপানীরা যদি আপনাকে এক চড় মারে, তাহা হইলে আপনি তাহাকে তিন চড় মারিবেন, কারণ আমাদের গভর্ণমেণ্ট জাপানী গভর্ণমেণ্টের সমপর্য্যায়ভুক্ত, আমরা কোনক্রমেই তাহাদের অধীন নয়। ভারতে পৌছিয়া যদি দেখি যে, কোনও জাপানী আমাদের দেশের নারীদের উপর অত্যাচার করিতেছে, তাহা হইলে প্রথম তাহাকে সতর্ক করিয়া দিতে হইবে এবং তাহাতেও সে সাবধান না হইলে আমরা তাহাকে গুলি করিব।"

সাক্ষী অতঃপর বলে যে, তাহাদের ব্যাটালিয়ানকে টহলদারীর কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ৩১শে মার্চ্চ (১৯৪৪) সে সরিয়া পড়ে এবং বৃটিশ বাহিনীতে পুনরায় যোগ দেয়। সাক্ষী বলে, সুভাষচন্দ্র বসু যখন তাহাদের ব্রিগেডের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন, তখন সাক্ষী তথায় উপস্থিত ছিল। সুভাষ বসু বলিয়াছিলেন যে, তাহারা স্বাধীনতার সৈনিক, তাহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতকে স্বাধীন করা। সৈন্যদের বহু কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, এমন কি, মৃত্যু বরণও করিতে হইতে পারে। যাহারা উহাতে পশ্চাৎপদ তাহারা সরিয়া দাঁড়াইতে পারে। সুভাষচন্দ্র তখন বলিয়াছিলেন, "আমরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিতেছি, কাজেই অর্থ ও অন্যান্য সম্পদের দিক দিয়া আমাদের অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল নয়। আমাদের সামর্থ্যে যাহা কুলায় তাহাই আপনাদের দিতেছি। খাদ্য প্রভৃতির দিক দিয়া বেশি কিছু দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। আপনাদিগকে অল্প খাদ্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে।"

হাবিলদার নবাবখান জেরার উত্তরে বলে যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ যে পৃথিবীর যে কোন সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার সঙ্কল্প রাখে তাহা সে উহাতে যোগদানের পূর্ব্বেও জানিত; কিন্তু তাহার একান্ত সঙ্কল্প ছিল কোন রকমে সরিয়া পড়া, যুদ্ধ করা নয়।

অতঃপর সাক্ষী বলে যে, সে রেঙ্গুণে সুভাষচন্দ্রের এক বক্তৃতা সভায় উপস্থিত ছিল।

প্রশ্ন—সুভাষচন্দ্র তোমাদের বলিয়াছিলেন যে জাতীয় বাহিনী ভারতের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করিতেছে।—হ্যাঁ।

প্রশ্ন—জাপানীদের সুবিধার জন্য নহে, ভারতের মুক্তিই জাতীয় বাহিনীর মূল উদ্দেশ্য।—হ্যাঁ।

প্রশ্ন—তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যে জাপানের সাহায্য করিতেছেন তাহা শুধু ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সহজ ও সুগম করিবার জন্য।—হ্যাঁ।

প্রশ্ন—তিনি ইহাও বলিযাছিলেন যে, জাতীয় বাহিনীর সামর্থ্য পরিমিত এবং জাতীয় বাহিনী ফুলশয্যা নহে।—হ্যাঁ।

প্রশ্ন—কোনরূপ ঐহিক লাভের লোভ দেখাইয়া কাহাকেও জাতীয় বাহিনীতে ডাকিয়া আনা হয় নাই।—হ্যাঁ।

প্রশ্ন—সত্যকার দেশপ্রেমিক যারা তাহারাই শুধু জাতীয় বাহিনীতে থাকিবে —হ্যাঁ।

প্রশ্ন—যাহারা আগাইয়া যাইতে নারাজ তাহাদের জোর করা হয় নাই।—হ্যাঁ।

সিপাহী সৈয়দুল্লা খানের সাক্ষ্য

২৮শে নভেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের মামলার শুনানীর কালে সরকার পক্ষীয় সাক্ষী সিপাহী সৈয়দুল্লা খান বলে, মামলায় সাক্ষ্য দিবার কালে তাহাকে কি কি বলিতে হইবে তাহা শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তারিখগুলি স্মরণ রাখিতে বলা হইয়াছিল।

সিপাহী সৈয়দুল্লা খান বলে যে, সে ১৯৪০ সালের ১২ই ডিসেম্বর

ভারতীয় বাহিনীতে যোগ দিয়া ১৯৪২ সালের ২৯শে জানুয়ারী মালয় যায় এবং সিঙ্গাপুরের পতন পর্য্যন্ত সেখানেই ছিল। সাক্ষী ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর—অক্টোবর মাসের দিকে জাতীয় বাহিনীতে যোগ দেয় এবং জগদীশ সিংহের অধীনস্থ নেহেরু ব্রিগেডের অন্তর্ভূক্ত হইয়া টহলদারীর কাজ করে। তাহাদের ইউনিট ব্রিগেড কমাণ্ডার গুরুবক্স সিং ধীলন কর্ত্তৃক জাপানী পদাতিক দলের অনুসরণ করিতে এবং তাহাদের নির্দ্দেশ মানিয়া লইতে আদিষ্ট হয়। মিঃ ভুলাভাই দেশাইএর জেরায় সাক্ষী বলে যে, সে নিস্থন শিবিরের একটি হাসপাতালে ছিল। এই শিবিরে যাহারা স্বেচ্ছায় জাতীয় বাহিনীতে যোগ দেয় নাই তাহারাও ছিল এবং এই দলের পীড়িতদের চিকিৎসা ব্যপারে সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা অবলম্বিত হইত।

প্রশ্ন—আপনি কি রোজনামচা রাখেন ?

উঃ—আমি নিরক্ষর, কাজেই কোনও রোজ নামচা রাখি না।

প্রঃ—তাহা হইলে সবগুলি তারিখ কি করিয়া মনে রাখিলেন ? এখানে ত ডজন দুয়েক তারিখ দেখিতেছি !

সাক্ষী নিরব। শ্রীযুক্ত দেশাই পুনরায় বলিলেন, আপনি ত কোনও রোজনামচা রাখেন না। তাহা হইলে তারিখগুলি একের পর এক বলিলেন কি করিয়া ?

সাক্ষী ইতস্ততঃ করিলে শ্রীযুক্ত দেশাই বলিলেন :—আমি আপনাকে সোজা-সুজি একটা প্রশ্ন করিতেছি। আদালতে আসিবার পূর্ব্বে আপনাকে এইরূপ বলিতে শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমার কথা সত্য, না, মিথ্যা, উত্তর দিন।

উঃ—আমাকে কি সাক্ষ্য দিতে হইবে তাহা শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

প্রঃ—এবং সেই জন্যই সবগুলি তারিখ আপনার মনে আছে ?

উঃ—হ্যাঁ।

প্রঃ—আপনাকে এই সমস্ত তারিখগুলি মুখস্থ করানো হইয়াছিল?

উঃ—হ্যাঁ।

হাবিলদার গোলাম মহম্মদের সাক্ষ্য

২৯শে নভেম্বর ১।১৩ ফ্রণ্টিয়ার ফোর্স রাইফেলসের হাবিলদার গোলাম মহম্মদ তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ১৯৪৫ এর জানুয়ারী মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের পঞ্চম গেরিলা বাহিনী পরিদর্শন করিয়া বলেন—আজাদ হিন্দ ফৌজের বর্ত্তমান শ্লোগান 'চলো দিল্লী'র সহিত আজ হইতে আরও একটি শ্লোগান যোগ করিতে হইবে—'রক্ত, রক্ত—আরও রক্তপাত চাই' উহার অর্থ হইতেছে ভারতের ৪০ কোটি নরনারীর স্বাধীনতার জন্য আমরা রক্তপাত করিব এবং ঐ একই উদ্দেশ্যে শত্রুরও রক্তক্ষয় করিব। আর সামরিক ভারতীয়দের শ্লোগান হইবে—'সর্ব্বস্ব বলি দাও, সর্ব্বস্ব দান কর'।

হাবিলদার গোলাম মহম্মদ বলেন যে, ১৯৪২ এর অক্টোবরে আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগদানের পর তাহাকে প্রথম গোলন্দাজ বাহিনীর কোয়ার্টার মাষ্টার নিয়োগ করা হয় পরে তাহাকে পঞ্চম গেরিলা রেজিমেণ্টে স্থানান্তরিত করা হয়। মেজর ধীলন এই বাহিনীর দ্বিতীয় অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৪৪ সালে জুলাই মাসে এই বাহিনী ব্রহ্ম ফ্রণ্টে প্রেরিত হয়। ডিসেম্বরে ক্যাপ্টেন সেহগল বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। পঞ্চম গেরিলা রেজিমেণ্ট পরে দ্বিতীয় পদাতিক রেজিমেণ্টে রূপান্তরিত হয়।

সুভাষচন্দ্রের নির্দ্দেশ

১৯৪৫এর জানুয়ারীতে নেতাজী পঞ্চম গরিলা বাহিনী পরিদর্শন করিয়া একটি ঘোষণায় বলেন—গত বৎসর শত্রুদের সহিত আজাদ হিন্দ ফৌজের রণাঙ্গনে প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। ফৌজ আশাতীত গৌরবজনক কাজ করিয়াছে এবং

শত্রুমিত্র উভয় পক্ষের প্রশংসা লাভ করিয়াছে। শত্রুপক্ষকে আমরা প্রত্যেক যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছি। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়া ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য আমাদিগকে ইম্ফল হইতে সৈন্য সরাইয়া আনিতে হইয়াছে। আমরা এই অসুবিধাগুলি দূরীকরণের চেষ্টা করিয়াছি সত্য কিন্তু প্রত্যেকের মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের ফৌজ একটি বিপ্লবী ফৌজ। শত্রুপক্ষের ন্যায় আমরা জনবলে বলীয়ান নই। শত্রুরা ঠিক করিয়াছে যে ভারতবর্ষ রক্ষার যুদ্ধ ক্ষেত্ররূপে তাহারা আসামে সৈন্য সমাবেশ করিবে। এই অঞ্চলকেই তাহারা ভারতের ষ্ট্যালিনগ্রাডে পরিণত করিয়াছে। এই বৎসরই যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল নির্দ্ধারিত হইবে। ইম্ফলের পার্ব্বত্য অঞ্চলে এবং চট্টগ্রামের সমতল ভূমিতে ভারতের স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ঠিক যে সময় আমরা যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইতেছি তখন আমাদের পক্ষ হইতে কেহ শত্রুপক্ষে যোগদান করে ইহা আমি চাই না, সুতরাং যদি কেহ দুর্ব্বলতা, ভীরুতা অথবা অন্য কোন কারণে রণক্ষেত্রে যাইতে অসমর্থ হন তবে তাঁহাকে তাঁহার রেজিমেণ্টের অধিনায়কের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে এবং তদনুযায়ী তাঁহাকে সদর কার্য্যালয়ে রাখিবার ব্যবস্থা করা যাইবে। আমি আপনাদের সম্মুখে সাচ্ছন্দ্যের ছবি ধরিতে চাহি না; আপনাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অন্যান্য কষ্ট এবং এমন কি মৃত্যুরও সম্মুখীন হইতে হইবে। শত্রুপক্ষ যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুত হইয়াছে, আমাদিগকেও আমাদের সর্ব্বশক্তি সমাবেশের চেষ্টা করিতে হইবে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বর্ত্তমান শ্লোগান 'চলো দিল্লী'র সহিত আজ হইতে আরও একটি 'শ্লোগান' যোগ করিতে হইবে—'রক্ত, রক্ত, আরও রক্তপাত চাই'। ভারতের ৪০ কোটি নরনারীর স্বাধীনতার জন্য আমরা রক্তপাত করিব এবং ঐ একই উদ্দেশ্যে শত্রুরও রক্ত ক্ষয় করিব। আর অসামরিক ভারতীয়দের শ্লোগান হইবে—সর্ব্বস্ব বলি দাও, সর্ব্বস্ব দান কর।

'ইনক্লাব জিন্দাবাদ', চলো দিল্লী, রক্ত, রক্ত, আরও রক্তপাত চাই'—

এই ধ্বনি করিয়া সুভাষচন্দ্র তাহার বক্তৃতা শেষ করেন। ২য় পদাতিক বাহিনীর দুই হাজার তিন শত সৈন্য ও উপস্থিত দর্শকবৃন্দও ঐ ধ্বনিগুলি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করে।

মার্চ্চের তৃতীয় সপ্তাহে পোপাতে এই বাহিনী উপস্থিত হয়; এই স্থানেই কর্ণেল শাহ নওয়াজের সদর কার্য্যালয় ছিল।

সাক্ষী বলে, তাহাদের সৈন্যদল বিভিন্ন অঞ্চলে টহলদারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। সাক্ষী রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার লেফন্যাণ্ট কর্ণেল সেহগলের একজন ষ্টাফ অফিসার ছিলেন। ১৯৪৫ সালের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে প্রথম ব্যাটালিয়ানের এক রিপোর্টে জানা যায় যে, আবদুল্লার খানের নেতৃত্বে ব্যাটালিয়ানের একদল টহলদারী বৃটিশ সৈন্যের সহিত সংঘর্ষ হয়। ঐ সংবাদে জানা যায় যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের টহলদারী সৈন্যগণ দুইখানি জিপ গাড়ী এবং একটি বেতারযন্ত্র হস্তগত করিয়াছে। একখানি জিপ বিভাগীয় হেডকোয়ার্টারে প্রেরণ করা হয় এবং একখানি রেজি-মেণ্টাল হেডকোয়ার্টারে রাখা হয়। লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল সেহগল এবং তাঁহার ষ্টাফ অফিসারগণ উহা ব্যবহার করিতেন। ১৪ই মার্চ তারিখে লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল সেহগল পিনবিন আক্রমণের জন্য দুইদল সৈন্য প্রেরণ করেন। সাক্ষী এবং দুইজন চিকিৎসক, লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল সেহগলের সহিত গমন করেন। সৈন্যদল যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ডিভিসন কমাণ্ডার কর্ণেল শাহ নওয়াজ বিদায় জানাইতে আসেন। কর্ণেল শাহ নওয়াজ বলেন, 'দুই নম্বর রেজিমেণ্টের উপর সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া আছে। ঐ রেজিমেণ্টের দুইদল সৈন্য এই প্রথম রণাঙ্গনে যাইতেছে। গত বৎসরের যুদ্ধে আমার এই অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, শত্রু অত্যন্ত কাপুরুষ। আমি আশা করি যে আপনারা কোন প্রকারেই ভারতের নাম কলঙ্কিত করিবেন না। আমি আপনাদের জন্য প্রার্থনা করিতেছি।"

সৈন্যদল দুইটি ১৬ই মার্চ নিয়েনে উপনীত হয়। সেখান হইতে একটি

দলকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন অফিসারের অধীনে টুঙ্গুনের পশ্চিমে প্রেরণ করা হয়।

সাক্ষী বলেন যে, সদর কার্য্যালয়ে মহম্মদ হোসেন এবং আরও দুইজনকে তিনি বন্দীরূপে দেখিতে পান। মহম্মদ হোসেন নিজে দল ত্যাগ করিতে চেষ্টা করে এবং অপরকে এই উদ্দেশ্যে উস্কানি দেয়, অন্যান্য দুইজনেও দলত্যাগ করিতে চেষ্টা করে। কর্ণেল সেহগল জিজ্ঞাসা করেন, তাহারা দোষী কি নির্দ্দোষ। মহম্মদ হোসেন নিজেকে দোষী স্বীকার করে কিন্তু অপর দুইজন নির্দ্দোষ বলিয়া ঘোষণা করে। এই তিনজনকে ডিভিসনের সদর কার্য্যালয়ে পাঠান হয়।

সরকার পক্ষীয় সাক্ষী সিপাহী জয়গিরি রাম বাহিনী ত্যাগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করায় কি করিয়া মহম্মদ হুসেনকে গুলী করিয়া হত্যা করা হয় তাহা বিবৃত করিয়া বলে যে, তিনজনকে গুলী করার জন্য যে সকল লোক নিযুক্ত করা হইয়াছিল সে তাহাদের একজন। সে আরও বলে যে নিহত ব্যক্তি—মহম্মদ হুসেন পোপা পাহাড় অঞ্চলে কর্ণেল শাহনওয়াজের নিকট স্বীকার করে যে, চরম দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াই সে পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল এবং তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু মহম্মদ হুসেনকে চক্ষু ও হস্ত বদ্ধ অবস্থায় একটা গাছের গুড়িতে ঠেস দিয়া বসাইয়া লেফটেন্যাণ্ট আয়া সিং, সাক্ষী ও অপর দুই জনকে তাহাকে গুলি করিতে আদেশ দেয়। সাক্ষী পরে পলাইয়া বৃটিশ বাহিনীতে যোগ দেয়। অপর সাক্ষী ১।:৩ সীমান্ত বন্দুকধারী বাহিনীর হাবিলদার গুলাম মহম্মদ তাহার সাক্ষ্যে বলে যে, এই বৎসর মার্চ্চ মাসে জনৈক জাতীয় বাহিনী অফিসারের অধীনস্থ একদল জাপানী সৈন্য মিত্রপক্ষের গুলীবর্ষণের শব্দ শুনিয়া পলাইয়া যায়। সাক্ষী এই প্রসঙ্গেই বলে যে একজন জাতীয় বাহিনীর অফিসারের অধীনে একজন জাপানী অফিসার এবং দুইটি জাপানী সৈন্যদল আক্রমণের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল।

ইম্ফল যুদ্ধের প্রস্তুতি

সিপাহী দল সা খানের পর সরকার পক্ষের সাক্ষী ১।১৩ ফ্রণ্টিয়ার ফোর্স রাইফেল বাহিনীর হাবিলদার নবাব খানকে জেরা করা হয়। সাক্ষী বলে যে, সে ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগ দেয়। তাহাকে ১নং গেরিলা রেজিমেণ্টের সুভাষ ব্রিগেডে নিযুক্ত করা হয়।

ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ ছিলেন ব্রিগ্রেড্ কমাণ্ডার। ১৯৪৪ সালের মে মাসে শাহনওয়াজ লেঃ আবদুর রহমানকে ইনতানগীতে জাপানী বিভাগীয় হেড কোয়ার্টার্সে যাইতে বলেন।

শাহনওয়াজ আরও বলেন যে, সাক্ষীর ব্রিগেড ইম্ফল অঞ্চলে যাইবে এবং ৬ মাস ২ শত সৈনিকের জন্য রসদ সরবরাহের জন্য দায়ী থাকিবে। পরবানাদের একটি দল ও গাড়োয়ালীদের একটি দল ১৫ই মে ব্রিটিশদিগকে আক্রমণ করিয়া যতদূর সম্ভব রসদ হস্তগত করিবে ও তারপর ফালাম কালেমিয়ো রাস্তায় মূল ঘাঁটিগুলির কোনও একটিতে ফিরিয়া যাইবে।

৭।৮ দিন ঐ স্থানে থাকিয়া সাক্ষী ব্রিটিশ সেনাদলে যোগদান করে এবং পরে বাড়ী চলিয়া যায়।

শ্রীযুত দেশাই—আপনি যে সকল বিবরণী দিয়াছেন, তাহা হইতে আমি ধরিয়া লইতেছি যে, আপনি একটি সুগঠিত বাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক ছিলেন।—হাঁ।

উত্তর—গেরিলা বাহিনীর একজন লোকও পিছু হটে নাই। পরে রেজিমেণ্ট ও কোম্পানীর সেনাপতিরা নাম চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, কাহারা কাহারা রণক্ষেত্রে যাইতে ইচ্ছুক নয়; কেহ নাম দিয়াছিলেন কি না, আমি জানি না।

অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলে যে, ফালাম ভারত সীমান্ত হইতে প্রায় ৩৫ মাইল দূরে।

প্রশ্ন—আপনি ব্রিটিশ পক্ষে চলিয়া যাইবার পর আপনি কি আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ?

উত্তর—পুনরায় বৃটিশ বাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর আমি বাড়ী চলিয়া যাই।

প্রশ্ন—আপনাকে যাইতে দেওয়া হয় ?—হাঁ।

আদালতের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলে যে, চাউলের বরাদ্দের সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল ১০ বা ১২ আউন্স। রেশনের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিল না। অনেক সময় মোটেই রেশন পাওয়া যাইত না। তখন সৈনিকরা জঙ্গলে যাইয়া কলা বা যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা লইয়া আসিত।

হনুমান প্রসাদের সাক্ষ্য

সিপাহী হনুমানপ্রসাদ নামক জনৈক নার্সিং আর্দালী তাহার সাক্ষ্যে বলে যে, সে ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়াছিল। সে নেহরু ব্রিগেডের ৭ম ব্যাটেলিয়নে ছিল। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর-নবেম্বর মাসে তাহার ব্রিগেড ব্রহ্মের মিনগানে যায়। মেজর ধীলন এই ব্রিগেডের অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৪৫ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী সাক্ষীর ব্রিগেড পোপা যাইতে আদিষ্ট হয়। অতঃপর সাক্ষীকে পোপা হইতে প্রায় ৩৫ মাইল দূরে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার্সে পাঠান হয়। ১৬ই মার্চ সাক্ষী একটি গুলীর শব্দ শুনিতে পায়। প্রায় আধ ঘণ্টা পর বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীর দুইটি ট্যাঙ্ক ও ৪০ জন গুর্খা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। সাক্ষী অতঃপর বলে, "আমাদের সৈনিকরা পশ্চাদপসরণ করিতে আরম্ভ করে। তখন দলের নায়ক আমাদিগকে পলায়ন করিতে নিষেধ করিয়া প্রতি আক্রমণ করিতে বলেন। আমরা তাহা করি। এই গোলাগুলি বর্ষণ চার-পাঁচ মিনিট স্থায়ী হইয়াছিল। আমাদের দলের সেনাপতি নিহত হইলে আমরা আত্মসমর্পণ করি। আমাদের দলে

আমরা ৯০ জন ছিলাম। আহতদের লইয়া আমরা ৪৭ জন গুর্খাদের হাতে বন্দী হই। দলের অন্যান্যের কি হয় আমি জানি না।"

নবাব খানের সাক্ষ্য

অতঃপর ভারতীয় সিগন্যাল বাহিনীর ল্যান্সনায়ক মহম্মদ সৈয়দের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত দেশাই-এর জেরার উত্তরে সাক্ষী বলে—পোপা হিলে এক সভায় লেঃ কর্ণেল সেহগল তাহাদিগকে বলেন যে, যাহারা যুদ্ধের কঠোরতা সহ্য করিতে অক্ষম তাহারা তাঁহার নিকট তাহাদের নাম দিতে পারে; তিনি তাহাদিগকে রণক্ষেত্রের পশ্চাদ্ভাগে পাঠাইয়া দিবেন। তিনি ইহাও জানিতে চান যে কোন অফিসার বা সৈনিক অপর পক্ষে চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক কি না। কেহই এরূপ ইচ্ছা জ্ঞাপন করে নাই। যাহারা অপর পক্ষে যাইতে চাহে তাহাদের নিরাপত্তা রক্ষা করা হইবে বলিয়া লেঃ কর্ণেল সেহগল কিছু বলিয়াছিলেন কি না, তাহা সাক্ষীর স্মরণ নাই। সেহগলের বক্তৃতার পর দুইজন সৈনিক আসিয়া বলে যে, তাহারা পুরোভাগে যাইতে অনিচ্ছুক। তাহাদের একজনের শরীর সুস্থ ছিল না এবং অপর জন বিমান আক্রমণে ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদিগকে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার্সে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

আরও প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলে, "নেতাজী আমাদের নিকট এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া আমাদিগকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করেন। আমি ও অন্যান্যেরা এই উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করিতেছি বলিয়া তৎকালে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম। নেতাজী আরও বলেন যে, আমরা দারিদ্র্য-পীড়িত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর প্রতিনিধি। রাষ্ট্রের যতখানি সাধ্য আছে, তাহা দ্বারা তাহাদের জন্য তিনি যে সামান্য পকেট খরচ ও আহার্য্য যোগাইতে পারিতেছেন, তাহাতেই তাহাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত।"

শ্রীযুক্ত দেশাই—তিনি আপনাদিগকে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই সমগ্র রেজিমেণ্টকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠান হইবে এবং জন্মভূমির জন্য আমাদিগকে আমাদের কর্তব্য পালন করিতে হইবে?—হাঁ।

প্রশ্ন—অন্ততঃ আপনি উহা আপনার কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। নয় কি?

উত্তর—হাঁ।

আগিরী রামকে জেরা

৩০শে নভেম্বর সামরিক আদালতে আসামীপক্ষের কৌসুলী সিপাহী আগিরীরামকে জেরা করেন।

শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই: তোমার বাড়ী কোথায়?

উত্তর: জলন্ধরে।

প্রশ্ন: কতদূর পর্যন্ত লেখাপড়া করিয়াছ?

উত্তর: রোমান উর্দূতে নাম স্বাক্ষর ছাড়া আমি লিখিতে পড়িতে জানি না।

প্রশ্ন: তুমি ইংরাজী ভাষা জান?

উত্তর: না।

প্রশ্ন: এই মামলা সম্পর্কে কাহারও নিকট কখন জবানবন্দী দিয়াছিলে?

উত্তর: আগষ্ট মাসে।

প্রশ্ন: উহাতে তুমি স্বাক্ষর করিয়াছিলে -

উত্তর: হাঁ।

প্রশ্ন: কোন্ ভাষায় উহা লিখিত হইয়াছিল?

উত্তর: ইংরাজীতে।

সাক্ষী সুবেদারকে তাহার জবানবন্দী লিখিয়া লইতে বলে এবং সুবেদার

একখানা টাইপ করা জবানবন্দী তাহার নিকট লইয়া আসে। সে যাহা বলিয়াছিল, টাইপ করা জবানবন্দীতে তাহার অনুবাদ আছে, এই বিশ্বাসেই সাক্ষী উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিল।

প্রশ্ন: যখন তোমার নিকট জবানবন্দী উপস্থিত করা হয়, তখন উহা ইংরাজীতে লিখিত ছিল?

এডভোকেট জেনারেল স্যার নওয়াসিরন ইঞ্জিনিয়ার বলেন যে, সাক্ষী ইতিপূর্বেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে। ইহাতে শ্রীযুক্ত দেশাই বলেন, "কৌশল করিয়া আমরা মনোমত উত্তর আদায় করিব, এ ইচ্ছা আমার নাই। আমি কেবল ব্যাপারটির তদন্ত করিতেছি।

সাক্ষী বলেন যে, সে টাইপ করা বিবৃতিতে স্বাক্ষর করার পূর্বে সুবেদার তাহাকে উহা পড়িয়া শোনায় এবং জিজ্ঞাসা করে যে, সে যাহা বলিয়াছিল, উহাতে তাহাই আছে কি না।

প্রশ্ন: সুবেদার যাহা তোমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিল, তাহা ইংরাজীতে ছিল?

উত্তর: হিন্দুস্থানীতে উহা অর্থ করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

প্রশ্ন: যে কাগজে তুমি স্বাক্ষর করিয়াছিলে, তাহা দেখিয়াছিলে কি?

উত্তর: হাঁ।

প্রশ্ন: জবানবন্দীটি ইংরাজীতে ছিল, যাহা তোমার বোধগম্য নয়?

উত্তর: সুবেদার আমাকে ইহাই বুঝাইয়াছিল যে, উহা সঠিক অনুবাদ।

প্রশ্ন: কিন্তু তুমি যে জবানবন্দীতে স্বাক্ষর করিয়াছিলে, তাহা এমন একটি ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, যাহা তুমি বুঝিতে অপারগ।

উত্তর: আমি নিজে উহা বুঝিতে পারি নাই।

প্রশ্ন: তুমি আগষ্ট মাসে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলে। তারপর হইতে তোমাকে কি সাক্ষ্য দিতে হইবে, তাহা কখনও তোমাকে বলা হয় নাই। (নিরুত্তর)

শ্রীযুক্ত দেশাই : তুমি সাক্ষ্য দিতে আসার দুই একদিন পূর্বে তোমাকে উহা দেওয়া হইয়াছিল কি না। তাঁহা আদালতে বল।

উত্তর : আমি যে জবানবন্দী দিয়াছিলাম, তাহা আমাকে দেখান হইয়াছিল এবং উহা সঠিক ছিল বলিয়া আমি বলিয়াছিলাম।

প্রশ্ন : সুতরাং তোমার স্মৃতিশক্তি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল।

উত্তর : আমি যাহা বলিয়াছিলান, তাহা আমার নিজেরই স্মরণ ছিল।

প্রশ্ন : এই আদালতে আসিবার পূর্ব্বে আজ এবং যেদিন তুমি জবানবন্দীতে স্বাক্ষর করিয়াছিলে সেই দিন—ইহার মধ্যে তোমাকে কি কেহ তোমার সাক্ষ্যের বিষয়বস্তু বলিয়া দেয় নাই ?

উত্তর : আমার জবানবন্দী আমাকে পড়িয়া শুনান হইয়াছিল।

প্রশ্ন : কিভাবে তোমার স্মৃতিশক্তি উজ্জীবিত হইয়াছিল, তাহা আদালতে সমগ্র পন্থাটি আমাদিগকে বল।

উত্তর : আমাকে সমস্ত জবানবন্দীটি পড়িয়া শুনান হয় এবং আমি উহা শুনিবার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, উহা ঠিক আছে কি না।

শ্রীযুক্ত দেশাই : ২।৩ দিন পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে আমি তাহার কথাও বলিতেছি।

উত্তর : গত পরশু আমাকে আমার জবানবন্দী মনে রাখিতে বলা হয় এবং জিজ্ঞাসা করা হয় যে উহার বিষয়বস্তু ঠিক আছে কি না। আমি বলিয়াছিলাম—"হাঁ।"

প্রশ্ন : তুমি যখন "জবানবন্দী" বল, তখন অনুবাদের কথাই বল ত ? ইংরাজীতে বলিয়া তুমি জবানবন্দী বুঝিতে পার নাই।

উত্তর : জবানবন্দীর হিন্দুস্থানী অনুবাদ আমাকে শুনানো হয় এবং পুনরায় আমি আমার জবানবন্দী বলি ও তাহা মিলিয়া যায়।

সাক্ষী বলে যে অস্ত্র ব্যবহারে তাহার কোন শিক্ষা ছিল না। তিনি একটি

এম্বুল্যান্স ইউনিটে যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাহার কাজ ছিল রোগীদিগের ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া এবং তাহাদের বিছানা করিয়া দেওয়া। সৈন্যবিভাগে যোগদানের পূর্ব্বে সে ভৃত্য ও শ্রমিকের কাজ করিত। হাসপাতালে যোগদান করিলে পর তাহাকে রোগীদের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ও তাহাদের বিছানা করার কাজ শেখান হয়। যুদ্ধবিগ্রহের কাজের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না।

প্রশ্ন : তুমি যে মহম্মদ হোসেন ও গাড়োয়ালীর কথা বলিয়াছ, তাহারা কি একটি সৈন্যবাহিনীর লোক ছিল ?

উত্তর : হাঁ।

প্রশ্ন : পলায়ন সম্পর্কিত কথাবার্ত্তার সময় তাহারা উপস্থিত ছিল না ?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : এই তথাকথিত আলোচনার পূর্বে তুমি তাহাদিগকে কখনও জানিতে না ?

উত্তর : তাহাদের পরিচয় আমি জানিতাম না।

প্রশ্ন : তুমি পূর্ব্বে তাহাদের সহিত কখনও কথা বল নাই ?

উত্তর : আমি পূর্ব্বে তাহাদের সহিত কথা বলি নাই।

সাক্ষী বলে, যখন কথাবার্তা হইয়াছিল, তখন সে জাপানী শিবিরে ছিল। সে পূর্বে কখনও বার্মা যায় নাই।

প্রশ্ন : ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে তুমি স্বেচ্ছায় আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিয়াছিলে ?

উত্তর : সৈন্যবিভাগে যোগদানের পূর্বে বন্দরে মাল বোঝাইয়ের ব্যাপারে দিনরাত্রি আমাদিগকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। জনৈক ক্যাপ্টেন আমার নিকট আসিয়া বলেন যে, আমি যদি হাসপাতালে যোগদান করি তাহা হইলে ঐ পরিশ্রমের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি এবং পরে ব্রিটিশ পক্ষে যাওয়ার সুযোগ পাইতে পারি।

প্রশ্ন : ১৯৪২ সালের অক্টোবর এবং ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসের পূর্বে তুমি কি কখনও ব্রিটিশ পক্ষে যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলে ?

সাক্ষী পুনরায় বলে যে, পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে সে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিয়াছিল।

প্রশ্ন : তুমি তারিখ ঠিক করিতে পার ?

উত্তর : না। আমার কোন তারিখের কথা স্মরণ নাই এবং আমি তারিখ বুঝিতে পারি না।

এডভোকেট জেনারেল বলেন যে, সাক্ষীর কোন তারিখের কথা স্মরণ নাই সে তাহার সাক্ষ্যে কেবল মাসের কথা বলিয়াছে। সে বৎসরের বিষয় কিছু বলিতে পারে নাই।

প্রশ্ন : তুমি ইংরাজী মাসের নাম জান ?

উত্তর : আমি ইংরাজী মাসের নাম জানি না তবে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় মাস—এইভাবে বলিতে পারি।

প্রশ্ন : তুমি গাড়োয়ালীর নাম জান কি ?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : তুমি কিরূপে জানিলে যে, সে গাড়োয়ালী ?

উত্তর : কারণ সে গাড়োয়ালী ভাষায় কথা বলিত। সে আমাদের সহিত বাস করিত এবং গাড়োয়ালী কথা বলিত।

প্রশ্ন : তুমি বলিয়াছ যে, পূর্বে কখনও তুমি গাড়োয়ালীর সহিত কথা বল নাই।

উত্তর : মহম্মদ হোসেন যেদিন হেডকোয়ার্টারে যোগদান করে, তাহার পূর্বে আমি কখনও গাড়োয়ালী অথবা মহম্মদ হোসেনের সহিত কথা বলি নাই।

লেঃ কর্ণেল কিটসনের সাক্ষ্য

৭ই ডিসেম্বর, গুর্খা রাইফেলের লেঃ কর্ণেল জে এ কিটসন তাঁহার সাক্ষে বিশেষভাবে ক্যাপ্টেন সেহগলের আত্মসমর্পণের কাহিনী বর্ণনা করেন তিনি বলেন যে, ইরাবতীর বাম তীরের একটি গ্রাম যখন তাঁহার সৈন্যগণ আক্রমণ করে, তখন ক্যাপ্টেন সেহগল প্রায় ৪০ জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং পাঁচশত সৈনিকসহ আত্মসমর্পণ করেন।

কর্ণেল কিটসন বলেন যে, ১৯৪৫ সালের ২৮শে এপ্রিল বেলা প্রায় ১০টার সময় জনৈক অগ্রগামী সৈন্যের নিকট খবর পাইয়া তিনি মাগিগান গ্রামের প্রায় ছয়শত গজ উত্তরে তাঁহার সেনাবাহিনীর গতি বন্ধ করেন এবং আর একদল সৈন্যকে গ্রামের দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে গুলীর আওয়াজ শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে, এই গ্রামে শত্রু আছে এবং এই কথা মনে করিয়া তিনি উত্তর ভাগের সৈন্যবাহিনীকে অগ্রসর হইতে বলেন।

অপর একটি খবর পাইয়া তিনি যখন গ্রামের পূর্ব্বদিকে উপস্থিত হন তখন তিনি তাঁহার দলের অধিনায়কের সহিত ক্যাপ্টেন সেহগল, ভারতীয় জাতীয়বাহিনীর কয়েকজন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী এবং কয়েকজন সাধারণ সৈনিককে দেখিতে পান। জাতীয় বাহিনীর অন্যান্য সকলে ধরা পড়ে। ইহার পর এই সেনাধীনায়কটি কর্ণেল কিটসনের হাতে একখানি চিট কাগজ দেন। এই চিট কাগজে ক্যাপ্টেন সেহগল আত্মসমর্পণের প্রস্তাব জানাইয়া-ছিলেন। প্রায় দুইমাস পরে তিনি উক্ত চিটকাগজখানি নষ্ট করিয়া ফেলেন। উহা বৃটিশ অথবা মিত্র শক্তির সেনাপতির উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছিল। সকলকে নিরস্ত্র করার পর কর্ণেল কিটসনের সহিত ক্যাপ্টেন সেহগলের আলাপ

আরম্ভ হয়। কর্ণেল কিটসন বলেন, ক্যাপ্টেন সেহ্‌গল কেন জাতীয় বাহিনীতে যোগ দেন, তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বিগত দুই বৎসরের যুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনা করেন এবং বলেন যে জাতীয় বাহিনীর সহিত জাপানীদের বনিবনাও হইতেছিল না।

ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজের বিবৃতি

ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ আদালতে একটি বিবৃতিদান প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি এমন কোন অপরাধ করেন নাই, যাহাতে সামরিক আদালত বা অপর কোন আদালতে তাহার বিচার হইতে পারে। তিনি বলেন—"আমি যে যুদ্ধে যোগ দিয়াছি তাহা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের সৈনিক হিসাবেই আমি উহা করিয়াছি। এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট সভ্য জগতের যুদ্ধের নিয়মাবলী অনুসারে মাতৃভূমির উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং বৃটিশ বাহিনী এই গভর্ণমেণ্টকে যুদ্ধরত গভর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।"

হত্যার প্ররোচনা দানের অভিযোগের কথা উল্লেখ করিয়া ক্যাপ্টেন শাহনওয়াজ বলেন যে, তিনি মহম্মদ হোসেনের মৃত্যু ঘটান নাই। তিনি বলেন—"যখন আমি জাতীয় বাহিনীতে যোগ দেই তখন আমি আমার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমি স্থির করি যে, আমার ভাইও যদি আমার বিরুদ্ধে যায় তাহা হইলে আমি তাহার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালাইব। আমি আমার নেতাজীকে এই প্রতিশ্রুতি দান করি যে আমি আমার মাতৃ-ভূমির জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিব। কর্ত্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনিয়াছেন সেগুলি সত্য হইলেও আমাকে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করা চলে না। মহম্মদ হোসেন স্বেচ্ছায় জাতীয় বাহিনীতে যোগ

দেয়। অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ সময়ে সে জাতীয় বাহিনী ত্যাগ করিতে চেষ্টা করে এবং অপরকেও ঐরূপ করিতে বলে। তাহার চেষ্টা সফল হইলে সে আমাদের গোপন খবর বৃটিশকে দিত এবং ইহাতে আমাদের গুরুতর ক্ষতি হইত। ইহা অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ। কেবলমাত্র জাতীয় বাহিনীর আইন অনুসারে নহে, সমস্ত সভ্যজগতের সামরিক আইন অনুসারেও এইরূপ অপরাধে আসামীর প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে। তবে আমি তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছি—এ সংবাদ ঠিক নহে। মহম্মদ হোসেনকে আমার নিকট উপস্থিত করা হইলে আমি তাহাকে বলি যে, সে যে অপরাধ করিয়াছে তাহাতে তাহাকে গুলী করা উচিত। যাহাই হউক আমি তাহার ব্যাপারটা রেজিমেণ্টের অধিনায়কদের হাতে ছাড়িয়া দেই।" জাপানীদের হাতে ধরা পড়িবার পর ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ একসময়ে জাপানীরা জাতীয় বাহিনীকে নিজেদের স্বার্থের জন্য ব্যবহার করিবে—এই আশঙ্কা করিয়া ভিতর হইতে উহা ভাঙ্গিয়া দিবার উদ্দেশ্য লইয়াই জাতীয় বাহিনীতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিয়া শাহ নওয়াজ বলেন যে, আমি একজন সত্যকার নেতার দর্শন লাভ করিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে অনুসরণ করাই আমার কর্ত্তব্য বলিয়া জীবনের চরম সঙ্কল্প বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। 'যখন আমার মনে হয় যে ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী ইংরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মমভাবে শোষিত হইতেছে তখন আমার সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ভারতে বৃটিশ শাসন অন্যায়, অবিচার ও অমর্য্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অনাচার, অত্যাচার ও অবিচার দূর করিবার, আমার জীবন, গৃহ, পরিবার পরিজন ও আজীবনের শাসন সংস্কার বিসর্জ্জন দিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলাম।

"আমি আজ আপনাদিগকে এবং আমার স্বদেশবাসীকে জানাইয়া দিতেছি

যে. আজাদ হিন্দ ফৌজে যে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার আমরা করিয়াছি কোন ভাড়াটিয়া সৈন্য তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। আমরা ভারতের স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করিয়াছি।

ক্যাপ্টেন সেহগলের বিবৃতি

ক্যাপ্টেন সেহগল তাঁহার বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন— বৃটিশ সরকার ইচ্ছা করিয়াই আমাদের সহিত তাহাদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। সুতরাং যে সকল আনুগত্য দিয়া আমরা বৃটিশ সরকারের নিকট আবদ্ধ ছিলাম এখন হইতে আমরা সেই সকল আনুগত্য হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি। জাপানীরা আমাদিগকে ক্যাপ্টেন মোহন সিংহের হস্তে সমর্পণ করেন। ক্যাপ্টেন মোহন-সিংহ তখন ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক ছিলেন। আমরা তখন হইতে মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম যে, যেহেতু বৃটিশ সরকার আমাদিগকে রক্ষা করিতে বিরত হইয়াছে কাজেই বৃটিশ সরকারী আমাদের নিকট হইতে কোন প্রকার অনুগত্য দাবী করিতে পারে না।

অতঃপর ক্যাপ্টেন সেহগল ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে ভারতে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে ৮ই আগষ্ট স্বরণীয় আগষ্ট প্রস্তাব গৃহীত হইলে অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর দিল্লী কেন্দ্র ও বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন ভারতের বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করে। কিন্তু ভারতের কেন্দ্র এবং জাপ ও অন্যান্য অক্ষশক্তি নিয়ন্ত্রিত বেতার কেন্দ্রগুলি হইতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনাবলী এবং উহা দমনকল্পে বৃটিশ সরকারের অমানুষিক পীড়ন ও অত্যাচারের কথা স্বাধীনভাবে বহির্জগতে ঘোষণা করা হইতেছিল। এই বেতার কেন্দ্রগুলির ঘোষণা হইতে ইহা অনুমিত হইয়াছিল যে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর সরকার যে দমননীতির আশ্রয় লইয়াছিল এইবার ভারতে তাহা অপেক্ষা কঠোর দমননীতি চলিতেছে।

ক্যাপ্টেন সেহগল বলেন যে, ভারত রক্ষার ব্যবস্থাদি সম্পর্কে তাঁহারা যে সকল সংবাদাদি পাইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে বৃটিশ সরকারের ভারত রক্ষার ব্যবস্থাদি মোটেও পর্য্যাপ্ত নহে। তাঁহাদের মধ্যে অতি দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিগণও চিন্তা করিয়াছিলেন যে ভারতে জাপদিগকে বাধা দিবার শক্তি বৃটিশ সরকারের নাই। তাহাদের মধ্যে বহুদিন আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, জাপানীদের পাশাপাশি যুদ্ধ করিয়া এক শক্তিশালী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ সশস্ত্র ভারতীয় সেনাবাহিনী ভারতবর্ষ দখল করিবে এবং ভারতে পৌছিয়া তাহারা স্বদেশকে বিদেশীদের শাসনাধিকার হইতে মুক্ত করিবে। জাপানীরা ভারতের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিতে চাহিলে এই বাহিনী তখন জাপানকে প্রবলভাবে বাধা দিবে এবং ভারত হইতে জাপদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

বৃটিশের বিরুদ্ধে জাপানকে শাসন কর্ত্তার গদীতে বসাইতে তাহাদের বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না। জাপানীদের খারাপ ব্যবহারের ভয়ে অথবা ভাড়াটে মনোভাব দ্বারা চালিত হইয়া আমি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করি নাই। ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর আজাদ-হিন্দ-ফৌজের একজন ক্যাপ্টেন হিসাবে আমি মাত্র ৮০ ডলার পাইয়াছিলাম। অথচ বাহিরে থাকিলে আমি মাসে ১২০ ডলার উপার্জ্জন করিতে পারিতাম। আমি একমাত্র স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়াই এই আজাদ-হিন্দ সেনাদলে যোগদান করিয়াছিলাম।

যদিও আজাদ-হিন্দ-ফৌজ তাহাদের প্রধাণতম উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনে সফলকাম হয় নাই তবুও আজাদী বাহিনীর প্রতিই লোকের মনে এই আত্মপ্রসাদ রহিয়াছে যে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সেনানীদল মালয়, ব্রহ্ম এবং অন্যান্যস্থানে ভারতবাসীদের ধন প্রাণ ও সম্মান রক্ষা করিয়াছে। আমাদের বিচার আরম্ভ হওয়ার পর রেঙ্গুণস্থ ভারতীয় খৃষ্টান সমিতির এবং ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয় সমিতির সভাপতিদ্বয়ের নিকট হইতে আমি যে তারবার্ত্তা সমূহ পাইয়াছি ইহা আমার উপরোক্ত মন্তব্যের জাজ্জল্য প্রমাণ।

এমন কি যদিও আমার প্রতি দণ্ডাদেশ দেওয়া হয় তাহা হইলেও আমাকে নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করা যাইতে পারে না। যে চারিজন বিশ্বাস-হন্তার হত্যার কথা বলা হইয়াছে তাহারা স্বেচ্ছায় আজাদী সেনা বাহিনীর প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া সেনাদলে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু আমরা যখন শত্রুর সম্মুখীন হইয়াছিলাম তখন তাহারা আমাদিগকে এমনভাবে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছিল যে, আজাদ হিন্দ সেনা বাহিনীর আইন এবং পৃথিবীর সমস্ত সামরিক আইনানুসারে তাহাদের একমাত্র শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড।

অতঃপর ক্যাপ্টেন সেহগল উপরোক্ত বিশ্বাসঘাতকদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা সম্পর্কে যে সব মিথ্যা ও বিকৃত ঘটনা প্রচার করা হইয়াছে তাহা বিবৃত করেন।

বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ যদি আমাদের আত্মসমর্পণ সর্ত্তাবলী গ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে আমরা কখনও আত্মসমর্পণ করিতাম না। আমরা শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাইতাম। কারণ আত্মসমর্পণের সময়ও আমাদের নিকট ছয় শত সুসজ্জিত ও সশস্ত্র সেনা ছিল। এই সেনানীবৃন্দ তাহাদের স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য শেষ রক্তবিন্দু পাত করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। তিনি যুদ্ধবন্দী হিসাবে ব্যবহার দাবী করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি বৃটিশ সেনাধ্যক্ষের নিকট যে নোট দিয়াছিলেন তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

পত্রোল্লিখিত সর্ত্তাবলী পাঠ করিয়াই বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ তাহাদের আত্মসমর্পণ সর্ত্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্যাপ্টেন সেহগল আরও বলেন ক্যাপ্টেন মোহন সিংহের সংগঠিত জাতীয় বাহিনীতে আমি ভারতের নূতন প্রভাতের আশা দেখিয়াছিলাম। আমি বুঝিয়াছিলাম যে বিশ্বের এই মহাসন্ধিক্ষণে এই শক্তিশালী জাতীয় বাহিনীই ভারতকে পরাধীনতার হাত হইতে মুক্ত করিতে পারে। দেড়শত বৎসর ধরিয়া সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসন আমাদের দেশকে কি অবস্থায় রূপান্তরিত করিয়াছে এই সময়েই আমি সম্পূর্ণভাবে তাহা উপলব্ধি

করিয়াছিলাম। আমার দেশবাসীর মর্ম্মন্তুদ বেদনা আমার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। বৃটিশ শাসন আমাদিগকে আত্মরক্ষায় সমর্থন করিয়া তোলে নাই বরং আমাদিগকে অনেক দিন যাবৎ দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে।

লেঃ ধীলনের বিবৃতি

লেঃ ধীলন তাঁহার বিবৃত প্রসঙ্গে বলেন, সামরিক কলেজে তিনি যে আদর্শের শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিয়া তিনি তাহারই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। অতঃপর লেঃ ধীলন সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতার কথা উল্লেখ করেন। সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতায় তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বেচ্ছাসৈনিক হিসাবেই তাহারা আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। লেঃ ধীলন অতঃপর সরকার পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্যের অসারতার কথা বর্ণনা করেন।

সৈন্যদের মনোবলের কথা উল্লেখ করিয়া লেঃ ধীলন বলেন, যদিও বহু সপ্তাহ ধরিয়া তিনি শত্রু সৈন্যের মাত্র দুই মাইল দূরে অবস্থান করিয়াছেন, তথাপি তাহার কোন সৈন্য কখনও শত্রু শিবিরে যায় নাই বা তাহার অবস্থা সম্পর্কে কোন সংবাদ দেয় নাই।

বহু সময় আমার এমন অবস্থা গিয়াছে যে বিশ হইতে ত্রিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত আমি জলস্পর্শ করি নাই এবং দুই তিন দিন পর্য্যন্ত কোন খাদ্য গ্রহণ করি নাই। সেনা বাহিনীর এক জন নায়ক হিসাবে আমারই যদি এত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার অনুবর্ত্তীদের ইহা অপেক্ষা ঢের বেশী কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাহারা আমার সহিতই চলিয়াছে। যদি চাপে পড়িয়াই ইহাদের এই বাহিনীতে যোগ দান করিতে হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা এতটা কষ্ট সহ্য করিতে স্বীকৃত হইত না।

বা সহ্য করিতেও পারিত না। এ কথা সত্য যে দল ত্যাগ করিবার জন্য এবং শত্রুর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবার জন্য তিনি (ধীলন) চারিজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন এবং তাহাদের বিচারার্থ প্রেরণ করেন।

ক্যাপ্টেন ধীলন আরও বলেন, "এই কথা সত্য নহে যে আমার নির্দ্দেশে আমার লোকেরা ইহাদের গুলী করে। যেদিন যে সময়ে তাঁহাদের গুলি করা হইয়াছে বলা হইতেছে, সেই দিন আমি রোগে শয্যাশায়ী ছিলাম এবং আমার পক্ষে নড়াচড়া করাও অসম্ভব ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ রদ করা হয় এবং তাহাদের এই দণ্ড দেওয়া হয় নাই। আমি যাহা কিছু করিয়াছি, স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার কর্ত্তৃক গঠিত সেনাবাহিনীর সদস্য হিসাবেই করিয়াছি এবং সেই হেতু ভারতীয় সামরিক বাহিনীর আইন অথবা ভারতীয় ফৌজদারী আইন অনুসারে আমার বিচার চলিতে পারে না। আমি যাহা কিছু করিয়াছি, ঐ সেনাবাহিনীর সদস্য হিসাবেই আমার কর্ত্তব্য করিয়াছি।

আমি আরও জানিয়াছি যে, আইনের দিক হইতে সামরিক আদালতে আমার বিচার বে-আইনী। মহান উদ্দেশ্য লইয়াই আমি জাতীয় বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলাম। জাতীয় বাহিনীর সদস্য হিসাবে আমি অনেক যুদ্ধবন্দীকে অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করিতে পারিয়াছি। জাতীয় বাহিনীর সৈন্যগণ সুদূরপ্রাচ্যে অবস্থিত ভারতীয়দের জীবন, ধন সম্পত্তি এবং সম্মান রক্ষা করিয়াছে। আমি বহু বেসামরিক ব্যক্তি এবং জাপানীগণ কর্ত্তৃক মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত বহু যুদ্ধবন্দীর জীবন রক্ষা করিয়াছি। আমার অনুরোধেই জাপানীরা বহুস্থলে অসামরিক ব্যক্তিদের উপর বোমাবর্ষণ হইতে বিরত থাকে। সুদূর প্রাচ্যের অধিবাসীরা আজাদ হিন্দ ফৌজের সেবা কার্য্যে মুগ্ধ হইয়া কোটি কোটী টাকা দান করিয়াছে। তীব্র স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ অস্থায়ী ভারত সরকারের তহবিলে সুদূর প্রাচ্যের ভারতীয়গণ স্বেচ্ছায় কোটী কোটী টাকা দান করিয়াছে।

জাপ পররাষ্ট্র দপ্তরের মিঃ সাবুরো ওতার সাক্ষ্য

৮ই ডিসেম্বর সামরিক আদালতে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অফিসারত্রয়ের বিচারের শুনানীকালে জাপ পররাষ্ট্র দপ্তরের মিঃ সাবুরো ওতা জাপান কর্তৃক অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বীকৃতিমূলক দলিলপত্রাদি পেশ করেন। আসামী পক্ষের প্রথম সাক্ষী হিসাবে মিঃ ওতা বলেন যে, ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষিত হয়। জাপ সরকার এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে স্বাধীন গবর্ণমেণ্টের মর্য্যাদা দিয়া উহাকে সর্বপ্রকার সম্ভাব্য উপায়ে সহায়তা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

১৯৪৩ সালের ২৩শে অক্টোবর জাপ প্রচার বিভাগ এই সম্পর্কে যে ঘোষণাপত্র প্রচার করে, সাক্ষী আদালতে তাহার এক প্রতিলিপি পেশ করেন। উহাতে বলা হয় যে, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেন এবং জাপ গভর্ণমেণ্ট উহা ২৩শে অক্টোবর স্বীকার করিয়া লইয়াছে। মিঃ ওতা বলেন যে, তিনি উল্লিখিত দলিলের খসড়া স্বয়ং রচনা করেন।

মূল দলিলপত্রাদি যে পাওয়া যাইতেছে না, তাহা পরে প্রমাণ করা হইবে বলিয়া আসামীপক্ষের কৌঁসুলী আদালতকে আশ্বাস দিলে আদালত উল্লিখিত দলিল ও অন্যান্য দলিলের প্রতিলিপি স্বীকার করিয়া নেন। অতঃপর সাক্ষী ১৯৪৩ সালের ২৩শে অক্টোবর জাপ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রচারিত এক বিবৃতি পেশ করেন। উহাতে এই মর্মে বলা হয় যে, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহা স্বাধীনতাকামী ভারতীয় জনসাধারণের চির সঞ্চিত আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের পক্ষে যুগান্তকারী অগ্রগতি স্বরূপ হইবে বলিয়া জাপ গভর্ণমেণ্ট আশা পোষণ করে।

১৯৪৩ সালের ৬ই নবেম্বর অনুষ্ঠিত বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া জাতি পরিষদের অধিবেশনে তৎকালীন জাপ প্রধান মন্ত্রী জেঃ তোজো যে বক্তৃতা দেন, সাক্ষী তাহার প্রতিলিপি আদালতে দাখিল করেন। উহাতে জেঃ তোজো বলেন, "অধুনা অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের ভিত্তি অধিকতর সুদৃঢ় হওয়ায় এবং উক্ত গভর্ণমেণ্টের অধীনে ভারতীয় স্বদেশভক্তগণ তাহাদের অভীষ্ট সাধনে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কৃতসঙ্কল্প হওয়ায় আমি এই মর্মে জাপ গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে ঘোষণা করিতেছি যে, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপানী সাহায্যের প্রাথমিক নমুনা হিসাবে জাপ অধিকৃত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শাসনভার অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের উপর ন্যস্ত করা হইবে।" তোজো আরও বলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপান তাহাকে সর্বোপায়ে সাহায্য দান করিবে। তবে এই ব্যাপারে ভারতীয়রাও যাহাতে তাঁহাদের প্রচেষ্টা বিপুল উদ্যমে আরম্ভ করেন তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে জাপানীদের আগ্রহ ছিল।

১৯৪৩ সালের নবেম্বর মাসে টোকিওতে অনুষ্ঠিত বৃহত্তর পূর্ব-এসিয়াস্থিত জাতিসমূহের পরিষদে তৎকালীন জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেঃ হিদেকী তোজো ও অন্যান্য প্রতিনিধিবর্গ ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। উক্ত পরিষদে জেঃ তোজো এ সম্পর্কে যে বিবৃতি দেন, তাহা সামরিক অদালতে 'একজিবিট' হিসাবে দাখিল করা হয়। মিঃ ওতা উক্ত বিবৃতির সত্যতা স্বীকার কনেন। উক্ত বিবৃতিতে বলা হয় যে, ভারত যাহাতে মার্কিণ ও ব্রিটিশ বন্ধনের নাগপাশ ছিন্ন করিয়া চির আকাঙ্খিত অভিলাষ পূরণ করিতে পারে, এরূপভাবে জাপ সাম্রাজ্য সর্বোপায়ে তাহাকে সহায়তা করিবে।'

ফরিয়াদী পক্ষের কৌঁসুলী স্যার এন পি ইঞ্জিনীয়ারের প্রশ্নে মিঃ ওতা বলেন যে, তোজো যে বৈঠকে বক্তৃতা দেন, তাহাতে তিনি উপস্থিত ছিলেন না; তবে বৈঠকের কার্য্য বিবরণী পররাষ্ট্র দপ্তরে নিয়মিতভাবে প্রেরিত হয়।

স্যার এন পি ইঞ্জিনীয়ার—আমি সম্পূর্ণ রিপোর্টটি দেখিতে চাই।

শ্রীযুত দেশাই—টোকিওর মার্কিণ কর্তৃপক্ষ তাহাদের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত দপ্তরের মারফতে উক্ত রিপোর্টের অনুবাদ পাঠাইয়াছেন।

এডভোকেট জেনারেল—এই অনুবাদ যে নির্ভুল, তাহার প্রমাণ কি।

সাক্ষী বলেন যে, তিনি জাপ ভাষায় লিখিত মূল রিপোর্ট এবং উহার ইংরেজী অনুবাদ দেখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিতে পারেন যে উক্ত অনুবাদ নির্ভুল। এই অবস্থায় আদালত দলিলপত্রাদি মানিয়া লইতে সিদ্ধান্ত করেন।

অতঃপর সাক্ষী বলেন যে, জাপ গভর্ণমেণ্ট মিঃ হাচিয়াকে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট কূটনীতিক প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণের সিদ্ধান্ত করেন। এই মর্মে এক ঘোষণাও বাহির হয়। তিনি উক্ত ঘোষণাপত্রের এক প্রতিলিপি আদালতে পেশ করেন।

এডভোকেট জেনারেল কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সাক্ষী বলেন যে, ১৯২৮ সাল হইতে তিনি জাপ পররাষ্ট্র দপ্তরে নিযুক্ত আছেন।

প্রঃ—জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইবার বহু পূর্ব হইতেই টোকিওতে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের একটি শাখা ছিল বলিয়া কি আপনি অবগত আছেন?

উঃ—আমি তাহা অবগত নহি।

প্রঃ—১৯৪২ সালে শুভেচ্ছাজ্ঞাপক মিশনের কথা কি আপনি জানেন?

উ ঃ—আমার স্মরণ নাই।

প্রঃ—আপনি কি তখন আপনার দপ্তরে ছিলেন? শুভেচ্ছাজ্ঞাপক মিশনের সহিত আমার কোন সম্পর্ক ছিল না।

উঃ—আমি পররাষ্ট্র দপ্তরে ছিলাম।

প্রঃ—আপনি কি অবগত আছেন যে, ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের

রাসবিহারী বসু ও অন্যান্য ব্যক্তি তাঁহাদের আন্দোলনে জাপ গবর্ণমেন্টকে সহায়তা করিতে অনুরোধ জানাইতেছিলেন ?

উঃ—সংবাদপত্রের মারফতে আমি তাহা জানিতে পারি।

এই অবস্থায় শ্রীযুক্ত দেশাই আপত্তি করিয়া বলেন যে, সংবাদপত্রের মারফতে কোন কিছু জানাকে সাক্ষ্য বলিয়া গণ্য করা যায় না। আদালত তাহার আপত্তি গ্রাহ্য করেন।

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত সম্মেলন সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না।

প্রঃ—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে জাপ গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত প্রস্তাবে কি ব্যবস্থা করে। সে সম্পর্কে আপনার কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে কি ?

উঃ—না।

মিঃ মাৎসুমতোর সাক্ষ্য

জাপ পররাষ্ট্র দপ্তরের মিঃ সুনিচি মাৎসুমতো অতঃপর সাক্ষ্য দান প্রসঙ্গে বলেন যে ১৯৪২ সালের নবেম্বর হইতে ১৯৪৪ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত এবং পুনরায় ১৯৪৫ সালের মে হইতে যুদ্ধান্ত পর্য্যন্ত তিনি জাপানের সহকারী পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন। উক্ত পদে নিযুক্ত হইবার পূর্বে তিনি জাপ সন্ধি-সম্পাদন সংক্রান্ত দপ্তরের কর্তা ছিলেন। অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার বিষয় তিনি অবগত ছিলেন। উক্ত গবর্ণমেণ্টের স্বীকৃতিমূলক মূল দলিলটি তিনি টোকিওর পররাষ্ট্র দপ্তরে দেখিয়াছেন। মিঃ মাৎসুমতো বলেন যে, ক্রোশিয়া, মাঞ্চুকুয়ো, জার্মাণী, ইতালী, চীন, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন ও ব্রহ্ম আজাদ গভর্ণমেণ্টকে যে স্বীকার করিয়া নেন, তাহা তিনি জানেন।

জাপান কর্তৃক আন্দামান ও নিকোবরের শাসনভার আজাদ গভর্ণমেণ্টের

উপর অর্পণ করা সম্পর্কে শ্রীযুত দেশাই জিজ্ঞাসা করেন যে, এই সম্পর্কিত নির্দেশ দ্বীপস্থ নৌদপ্তরে জানান হয় কিনা। সাক্ষী বলেন যে, এইরূপ নির্দেশ নিশ্চয়ই দেওয়া হইয়াছিল।

এডভোকেট জেনারেলের জেরার উত্তরে মিঃ মাৎসুমতো বলেন যে, কর্তব্য সম্পাদনকালে ইণ্ডিয়া লীগের কোন ব্যাপারে তিনি লিপ্ত ছিলেন না। রাসবিহারী বসুর সহিত তাঁহার কখনও দেখা হয় নাই।

প্রঃ—যুদ্ধের পূর্বে জাপ গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের কর্ম-তৎপরতাকে উৎসাহিত করিয়াছেন বলিয়া আপনি কিছু বলিতে পারেন কি ?

উঃ—আমি উহার কিছুই জানি না।

প্রঃ—আপনাকে বলিতেছি যে, ভারতে গোলযোগ সৃষ্টি করা ও এই সম্পর্কে উৎসাহ দেওয়া যুদ্ধের বহু পূর্ব হইতেই জাপ গবর্ণমেণ্টের নীতির বিশেষ অঙ্গ ছিল।

উঃ—এই জাতীয় নীতির কথা আমি কিছুই জানি না।

প্রঃ—রাসবিহারী বসু জাপানে ছিলেন, একথা কি আপনি জানিতেন ?

উঃ—হাঁ।

সাক্ষী বলেন যে, ১৯৪৩ সালের অক্টোবর বা নবেম্বরে অস্থায়ী আজাদ গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া নেওয়ার বিষয় জাপ গভর্ণমেণ্ট প্রথম বিবেচনা করেন।

প্রঃ—আপনাকে বলিতেছি যে, ১৯৪২ সালের মার্চ হইতেই ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সদস্যরা অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া লওয়ার জন্য জাপ গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ জানান ?

উঃ—আমি উক্ত বিষয়ে কিছু অবগত নহি।

সাক্ষী বলেন যে, শ্রীযুত সুভাষ বসুর সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল; ১৯৪৩

রাসবিহারী বসু ও অন্যান্য ব্যক্তি তাঁহাদের আন্দোলনে জাপ গবর্ণমেন্টকে সহায়তা করিতে অনুরোধ জানাইতেছিলেন ?

উঃ—সংবাদপত্রের মারফতে আমি তাহা জানিতে পারি।

এই অবস্থায় শ্রীযুক্ত দেশাই আপত্তি করিয়া বলেন যে, সংবাদপত্রের মারফতে কোন কিছু জানাকে সাক্ষ্য বলিয়া গণ্য করা যায় না। আদালত তাহার আপত্তি গ্রাহ্য করেন।

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত সম্মেলন সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না।

প্রঃ—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে জাপ গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত প্রস্তাবে কি ব্যবস্থা করে। সে সম্পর্কে আপনার কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে কি ?

উঃ—না।

মিঃ মাৎসুমতোর সাক্ষ্য

জাপ পররাষ্ট্র দপ্তরের মিঃ সুনিচি মাৎসুমতো অতঃপর সাক্ষ্য দান প্রসঙ্গে বলেন যে ১৯৪২ সালের নবেম্বর হইতে ১৯৪৪ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত এবং পুনরায় ১৯৪৫ সালের মে হইতে যুদ্ধান্ত পর্য্যন্ত তিনি জাপানের সহকারী পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন। উক্ত পদে নিযুক্ত হইবার পূর্বে তিনি জাপ সন্ধি-সম্পাদন সংক্রান্ত দপ্তরের কর্তা ছিলেন। অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার বিষয় তিনি অবগত ছিলেন। উক্ত গবর্ণমেণ্টের স্বীকৃতিমূলক মূল দলিলটি তিনি টোকিওর পররাষ্ট্র দপ্তরে দেখিয়াছেন। মিঃ মাৎসুমতো বলেন যে, ক্রোশিয়া, মাঞ্চুকুয়ো, জার্মাণী, ইতালী, চীন, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন ও ব্রহ্ম আজাদ গভর্ণমেণ্টকে যে স্বীকার করিয়া নেন, তাহা তিনি জানেন।

জাপান কর্তৃক আন্দামান ও নিকোবরের শাসনভার আজাদ গভর্ণমেণ্টের

উপর অর্পণ করা সম্পর্কে শ্রীযুত দেশাই জিজ্ঞাসা করেন যে, এই সম্পর্কিত নির্দেশ দ্বীপস্থ নৌদপ্তরে জানান হয় কিনা। সাক্ষী বলেন যে, এইরূপ নির্দেশ নিশ্চয়ই দেওয়া হইয়াছিল।

এডভোকেট জেনারেলের জেরার উত্তরে মিঃ মাৎসুমতো বলেন যে, কর্তব্য সম্পাদনকালে ইণ্ডিয়া লীগের কোন ব্যাপারে তিনি লিপ্ত ছিলেন না। রাসবিহারী বসুর সহিত তাঁহার কখনও দেখা হয় নাই।

প্রঃ—যুদ্ধের পূর্বে জাপ গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের কর্ম-তৎপরতাকে উৎসাহিত করিয়াছেন বলিয়া আপনি কিছু বলিতে পারেন কি ?

উঃ—আমি উহার কিছুই জানি না।

প্রঃ—আপনাকে বলিতেছি যে, ভারতে গোলযোগ সৃষ্টি করা ও এই সম্পর্কে উৎসাহ দেওয়া যুদ্ধের বহু পূর্ব হইতেই জাপ গবর্ণমেণ্টের নীতির বিশেষ অঙ্গ ছিল।

উঃ—এই জাতীয় নীতির কথা আমি কিছুই জানি না।

প্রঃ—রাসবিহারী বসু জাপানে ছিলেন, একথা কি আপনি জানিতেন ?

উঃ—হাঁ।

সাক্ষী বলেন যে, ১৯৪৩ সালের অক্টোবর বা নবেম্বরে অস্থায়ী আজাদ গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া নেওয়ার বিষয় জাপ গভর্ণমেণ্ট প্রথম বিবেচনা করেন।

প্রঃ—আপনাকে বলিতেছি যে, ১৯৪২ সালের মার্চ হইতেই ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সদস্যরা অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া লওয়ার জন্য জাপ গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ জানান ?

উঃ—আমি উক্ত বিষয়ে কিছু অবগত নহি।

সাক্ষী বলেন যে, শ্রীযুত সুভাষ বসুর সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল; ১৯৪৩

সালের এপ্রিলে টোকিওর সরকারী বাসভবনে তাঁহার সহিত সাক্ষীর প্রথম দেখা হয়। শ্রীযুত বসু জার্মাণী হইতে জাপানে আগমন করেন।

প্রঃ—জার্মাণী হইতে তাহাকে জাপানে প্রেরণের জন্য জাপ গভর্ণমেণ্টই কি জার্মাণ সরকারের নিকট প্রথম অনুরোধ জানান ?

উঃ—জাপ গভর্ণমেণ্ট জার্মাণ সরকারের সহযোগে শ্রীযুত বসুকে জাপানে প্রেরণের ব্যবস্থা করে।

প্রঃ—জাপ গভর্ণমেণ্ট জার্মাণ গবর্ণমেণ্টের সহিত কি জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ?

উত্তর:—জাপ গভর্ণমেণ্ট জানিতেন যে, সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। জাপ গভর্ণমেণ্ট মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি যুদ্ধে জাপানের সহায়তা করিবেন এবং জাপ গভর্ণমেণ্টও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের জন্য তাঁহাকে সাহায্য করিবেন।

প্রশ্ন:—আপনি কি এই কথা বলিতে চান যে, অন্য কাহারও দ্বারা অনুরুদ্ধ না হইয়া জাপ গভর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছা-প্রণোদিতভাবে এইরূপ করিয়াছিলেন।

উত্তর:—জাপ গভর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছাক্রমেই এইরূপ করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন:—জাপ গভর্ণমেণ্ট মনে করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে জয়লাভের ইহাও একটি পন্থা ?

উত্তর:—জাপ যুদ্ধাদর্শের সহায়তাকল্পেই এইরূপ করা হইয়াছিল।

প্রশ্ন:—সুভাষ বসুকে যখন ডাকিয়া পাঠান হইল তখন জাপানীরা জানিতেন যে, তিনি স্বাধীন ভারতবর্ষের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান কর্তা হইবেন ?

উত্তর:—আমার সহিত এই বিষয়ের যতটুকু সম্পর্ক আছে তাহাতে আমি এই কথা বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, সুভাষচন্দ্র বসু অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের কর্তা হইবেন।

অতঃপর সাক্ষী বলেন যে, ১৯৪৩ সালে এপ্রিল মাসে সুভাষচন্দ্র বসু জাপানে আসিয়াছিলেন এবং প্রায় এক মাস তথায় ছিলেন। সাক্ষী সরকারীভাবে এই কথা জানিতেন যে, স্বাধীন ভারতবর্ষের একটি অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে এবং সুভাষচন্দ্র বসু এই গভর্ণমেণ্টের প্রধান কর্তা হইবেন এবং জাপ গভর্ণমেণ্ট এই গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইবেন ও ইহাকে সাহায্য করিবেন।

প্রশ্ন :—স্বাধীন ভারতবর্ষের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লওয়া কি জাপ সমর নীতির একটি অঙ্গ ছিল ?

উত্তর :—আমার মনে হয় যে, একমাত্র জাপ যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যেই জাপ গভর্ণমেণ্ট এইরূপ করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন :—জাপানের ব্যবস্থা অনুসারেই কি জাপানের মিত্রশক্তিবর্গ এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন ?

উত্তর :—জাপ গভর্ণমেণ্ট তাহার সমস্ত মিত্র শক্তিকে এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং জাপানের অনুরোধেই তাঁহার মিত্রশক্তিবর্গ এই গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

আরও প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, জাপানের মিত্রশক্তিবর্গ যাহাতে স্বাধীন ভারতবর্ষের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লন তজ্জন্য সুভাষ বসু জাপ গভর্ণমেণ্টের মারফৎ জাপানের মিত্রশক্তিবর্গকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু লিখিতভাবে এই অনুরোধ করিয়াছিলেন বলিয়া সাক্ষীর মনে হয় না; তবে এ সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিতরূপে কিছুই বলিতে পারেন না।

প্রশ্ন :—কিসের উপর নির্ভর করিয়া আপনি এই কথা বলিতেছেন যে, সুভাষচন্দ্র বসু জাপ গভর্ণমেণ্টের মারফৎ জাপানের মিত্রশক্তিবর্গকে এইরূপে অনুরোধ করিয়াছিলেন ?

উত্তর :—আমি ঐ সময়ে বৈদেশিক বিভাগে ছিলাম এবং আমি সরকারী-ভাবে এই কথা শুনিতে পাইয়াছিলাম; কিন্তু এই অনুরোধ লিখিতভাবে করা হইয়াছিল, না—মৌখিকভাবে করা হইয়াছিল তাহা আমি জানি না।

সাক্ষী আরও বলেন যে, ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। সাক্ষী মনে করেন যে, ঐ সময়ে সুভাষচন্দ্র বসু জাপানে ছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসুর এইরূপ অনুরোধ সম্বলিত কোন কাগজপত্র সাক্ষী দেখিয়াছিলেন কি না তাহা তাঁহার মনে নাই।

প্রশ্ন :—আমি আপনাকে বলিতেছি যে, জাপ সরকার সমর কৌশলের অস্ত্র হিসাবে শুধু নিজেরাই মানিয়া লন নাই, পরন্তু তাঁহার মিত্ররাষ্ট্রগুলির দ্বারাও অনুমোদিত করাইয়াছিলেন?

উত্তর :—আমার মনে হয়, জাপান তাহার মিত্ররাষ্ট্রগুলিকে অস্থায়ী গভর্ণ-মেণ্ট মানিয়া লইতে বলিয়াছিলেন, কারণ জাপান মনে করিয়াছিল যে, জাপানের পক্ষে উহা ভাল হইবে।

মাঞ্চুকুয়োর অনুমোদন সম্পর্কে সাক্ষী পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া স্যার নসিরবান জিজ্ঞাসা করেন যে, মাঞ্চুকুয়ো জাপ সামরিক কর্তৃত্বাধীনে ছিল কি না? সাক্ষী উত্তরে বলেন যে, তথায় জাপ সৈন্য ছিল বটে, কিন্তু মাঞ্চুকুয়ো সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া বিবেচিত হইত। সাক্ষী বলেন, নানকিং সরকারও অনুরূপভাবে জাপানীদের সাহায্যলাভ করিত।

প্রশ্ন :—নানকিং গবর্ণমেণ্ট ছিল তাঁবেদার গবর্ণমেণ্ট?

উত্তর :—জাপান নানকিং সরকারকে সাহায্য করিতেছিল। নানকিংও সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া বিবেচিত হইত।

প্রশ্ন :—কাহাদের দ্বারা বিবেচিত হইত?

উত্তর :—জাপান এবং তাহার মিত্ররাষ্ট্রগুলি দ্বারা।

প্রশ্ন :—জাপান এবং তাহার মিত্ররাষ্ট্রগুলির ছাড়া পৃথিবীতে আর কেহ এইরূপ মনে করিত না ?

উত্তর :—স্পেন নানকিং গভর্ণমেণ্টকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। সাক্ষী বলেন, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড এবং ব্রহ্মও স্বাধীন বলিয়া বিবেচিত হইত।

শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই সাক্ষীকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন : আপনি অনুগ্রহ করিয়া ভারত সম্পর্কে জাপানীদের যুদ্ধনীতি বর্ণনা করিবেন কি ?

উত্তর :—ভারত সম্পর্কে জাপানীদের যুদ্ধনীতি হইতেছে ভারতকে স্বাধীন করা।

এখানেই মিঃ মাৎসুমতোর জবানবন্দী গ্রহণ শেষ হয়।

প্রাক্তন জাপমন্ত্রী মিঃ সবাদার সাক্ষ্য

১০ই ডিসেম্বর জাপ পররাষ্ট্র বিভাগের প্রাক্তন সহকারী মন্ত্রী মিঃ রেঞ্জু সবাদা সাক্ষ্য প্রদানকালে বলেন যে, অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারকারকে তিনি জানেন। উহা জাপ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল এবং জাপ সরকারের পক্ষ হইতে মন্ত্রীরূপে মিঃ টি হাচিয়াকে প্রেরণ করা হয়। মিঃ হাচিয়া তাঁহার সাক্ষ্যে উক্ত বিবৃতি স্বীকার করেন।

মিঃ সবাদা বলেন যে, তিনি গত ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের মে মাস পর্য্যন্ত জাপানের পররাষ্ট্র বিভাগীয় সহকারী মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজনীতি কুশলতা সম্বন্ধীয় কার্য্যে প্রবেশ লাভ করেন কিন্তু তৎপূর্ব্বে লণ্ডন ও প্যারিস প্রমুখ বিভিন্ন রাজনৈতিক দূতাবাসে রাজদূতরূপে ২০ বৎসরাধিক কাল কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীযুত দেশাই :—যে সময় আপনি পররাষ্ট্র বিভাগের সহকারি মন্ত্রী ছিলেন

তৎপ্রতি আমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া জানিতে চাই, স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার সম্বন্ধে আপনি তখন কিছু জানিতেন কি?

উঃ—হ্যাঁ।

প্রঃ—উক্ত সরকারকে স্বীকার করিয়া সেখানে কোন নিপ্পন মন্ত্রী নিয়োগ সম্পর্কে আপনি কিছু করিয়াছিলেন কি?

উঃ—হ্যাঁ।

প্রঃ—এই নিপ্পন মন্ত্রী নিয়োগ সম্বন্ধে কবে সঠিক ভাবে স্থির করা হয়।

উঃ—১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে।

প্রঃ—উক্ত কার্য্যের জন্য কাহাকে নিয়োগ করা হয়?

উঃ—মিঃ টি হাচিয়া।

প্রঃ—কবে তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করেন?

উঃ—আমার মনে হয় তিনি ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের রাজধানী রেঙ্গুণ পৌছিয়াছিল।

অতঃপর সরকারী কৌঁসুলী এন পি ইঞ্জিনীয়ার সাক্ষীকে জেরা করেন।

প্রঃ—পররাষ্ট্র বিভাগের সহকারী মন্ত্রীরূপে আপনি কি বরাবর টোকিওতে ছিলেন?

উঃ—হ্যাঁ।

মন্ত্রীরূপে মিঃ হাচিয়ার নিয়োগ সম্পর্কে কোন প্রকার দলিল আছে কি?

উক্ত অস্থায়ী সরকারকে স্বীকার করিয়া লইয়া সেখানে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া জাপ সরকার সেই মর্ম্মে সাধারণের নিকট ঘোষণা করিয়াছিল।

কোথায় এবং কি ভাবে ঐ সম্বন্ধে ঘোষণা করা হয়?

উঃ—সরকারী গেজেটে।

আপনারা নিকটে কি ঐ ঘোষণার নকল আছে?

উঃ—না।

মিঃ হাচিয়াকে রেঙ্গুণ প্রেরণ ব্যবস্থার সহিত আপনি কি ব্যক্তিগত ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ?

পররাষ্ট্র বিভাগীয় সহকারী মন্ত্রীরূপে আমার যতটুকু ক্ষমতা তদনুযায়ী আমি মিঃ হাচিয়ার রেঙ্গুণে প্রেরণ ব্যাপারের সহিত সংযুক্ত ছিলাম।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে মিঃ হাচিয়া রেঙ্গুণে পৌছিবার পর আপনি কি তাঁহার নিকট হইতে কোন চিঠিপত্র পাইয়াছিলেন ?

হ্যাঁ।

আপনার কাছে ওইগুলি আছে কি ?

ওইগুলি এখন আমার সঙ্গে নাই।

চিঠিপত্রগুলি পাওয়া যাইতে পারে কি ?

ওইগুলি সবই টোকিওতে আছে।

মিঃ হাচিয়াকে রেঙ্গুণে প্রেরণ করিবার সময়ে তাঁহার সঙ্গে কোন দলিল পত্র অর্থাৎ ক্ষমতাসূচক নিদর্শন পত্রাবলী দেওয়া হইয়াছিল কি ?

আজাদ হিন্দ সরকার অস্থায়ী বিবেচনায়ই কেবল প্রথমে ওইরূপ ক্ষমতা-সূচক কোন নিদর্শনপত্র তাঁহার সঙ্গে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু মিঃ হাচিয়া রেঙ্গুণে পৌছিয়া শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর নির্দ্দেশ জাপ সরকারকে জ্ঞাপন করিলে উক্ত নিদর্শন পত্রাবলী জাপ সরকার পরে প্রদান করিবেন বলিয়া স্থির করেন। উক্ত দলিলপত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্রাট কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়া ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসের মধ্য ভাগে মিঃ হাচিয়ার নিকট প্রেরিত হয়। কিন্তু ডাক বিভাগের অব্যবস্থার নিমিত্ত উহা কার্য্যতঃ নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিতে পারে নাই।

প্রঃ—তাহা হইলে আপনি জানেন যে, ক্ষমতাসূচক দলিলপত্রের অভাবে মিঃ হাচিয়া প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীরূপে রেঙ্গুণে কাজ করিতে পারেন নাই ?

উঃ—তিনি মন্ত্রীরূপে কাজ করিয়াছিলেন। উক্ত দলিলপত্র পাইবার

পূর্ব্বেই সরকারীভাবে তিনি অস্থায়ী সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং মন্ত্রীরূপে কার্য্য করিবার পক্ষে তিনি সমর্থ ছিলেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

প্রঃ—এইরূপ পারস্পরিক সাক্ষাৎকার ব্যতীত মিঃ হাচিয়া মন্ত্রীরূপে অন্য কোন প্রকার কার্য্য করিয়াছিলেন কি?

উঃ—পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে কি প্রকার আদানপ্রদান কার্য্য তিনি করিয়াছিলেন আমি তাহা জানিনা।

প্রঃ—আপনি কেবল তাঁহার এইরূপ পারস্পরিক সাক্ষাৎকারের সংবাদই জানেন?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—অস্থায়ী সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর নাম আপনি জানেন কি?

উঃ—না।

প্রঃ—মিঃ হাচিয়ার সহিত অস্থায়ী সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী যে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আপনি কি প্রকারে জানিলেন?

উঃ—মিঃ হাচিয়ার নিকট হইতে।

প্রঃ—আমি আপনাকে এই জানাইতে চাই যে, ক্ষমতাসূচক কোন দলিল-পত্র মিঃ হাচিয়ার সঙ্গে নাই দেখিয়া শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহাকে মন্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। একথা ঠিক নয় কি?

উঃ—হাঁ, মিঃ হাচিয়া কর্তৃক প্রেরিত রিপোর্ট হইতে উহা জানিয়াছি।

প্রঃ—কিন্তু আপনি বলেন যে, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর নির্দ্দেশমতে জাপ সরকার উপরোক্ত দলিলপত্র প্রেরণ করিবেন বলিয়া স্থির করেন।

হ্যাঁ।

ঐ অনুরোধ কি লিখিত ভাবে করা হইয়াছিল?

না।

তৎসম্বন্ধে মিঃ হাচিয়ার নিকট হইতে কোন রিপোর্ট পাইয়াছিলেন কি ?

হ্যাঁ।

ক্ষমতাসূচক যে দলিলপত্র প্রেরণ করা হইয়াছিল, উহা রেঙ্গুনে পৌছায় নাই ?

না।

উক্ত দলিলপত্র কবে টোকিও হইতে প্রেরিত হইয়াছিল বলিতে পারেন কি ?

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসের মধ্যভাগে।

বৃটিশ বাহিনী কি রেঙ্গুনে ৩রা মে প্রবেশ করিয়াছিল ?

হাঁ।

জাপ-বাহিনী ৩০শে এপ্রিল রেঙ্গুণ পরিত্যাগ সম্পূর্ণ করিয়াছিল ?

হাঁ।

সুভাষচন্দ্র কি ২৪শে এপ্রিল রেঙ্গুণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ?

আমি জানি না।

আমার মনে হয় এপ্রিলের মধ্যভাগ হইতে বৃটিশ বাহিনী প্রবেশের সময় পর্য্যন্ত রেঙ্গুণে কি ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে আপনার ব্যক্তিগত কোন জ্ঞান নাই।

না, কোন ব্যক্তিগত জ্ঞান আমার নাই।

মিঃ হাচিয়া কবে রেঙ্গুণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ?

এপ্রিলের শেষ ভাগে।

—ক্ষমতাসূচক পত্রগুলি কি মিঃ হাচিয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল ?

—হাঁ, তিনি যেখানে ছিলেন উহা সেইখানেই পাঠাইবার কথা ছিল।

—ঐগুলি বাস্তবিক পক্ষে কোথায় পাঠান হইয়াছিল তাহা আপনার জানা আছে কি ?

—না।

—আসল কথা, রেঙ্গুণ পরিত্যাগের পর মিঃ হাচিয়া কোথায় ছিলেন আপনার জানা নাই।

—না।

—তিনি কি জাপানে ফিরিয়া গিয়াছেন ?

—না, তিনি ব্যাঙ্ককে ফিরিয়া গিয়াছিলেন ?

—তিনি কি যুদ্ধের শেষ অর্থাৎ আগষ্টের মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ককে ছিলেন ?

—হাঁ।

—ব্যাঙ্ককে অবস্থান কালে তাঁহার নিকট হইতে কোন রিপোর্ট পাইয়াছিলেন কি ?

—কোন সংবাদ আদান প্রদান হয় নাই।

মিঃ তেরুরো হাচিয়ার সাক্ষ্য

পরবর্ত্তী সাক্ষী মিঃ তেরুরো হাচিয়া বলেন, অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীরূপে জাপসরকার কর্তৃক তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৯৪৫ সালের মার্চ্চমাসে রেঙ্গুণে পৌছিয়া তিনি আজাদ হিন্দ সরকারের পররাষ্ট্র সচিব কর্ণেল চ্যাটার্জ্জীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১৯৪৫ সালের ২৪শে এপ্রিল পর্য্যন্ত তিনি রেঙ্গুণে ছিলেন। উক্ত আজাদ হিন্দ সরকারের জনৈক সদস্য মিঃ আয়ারের সহিতও তিনি সাক্ষাৎ করেন। মিঃ হাচিয়া রেঙ্গুণ হইতে ব্যাঙ্ককে যান এবং আজাদ হিন্দ সরকারকেও ব্যাঙ্ককে স্থানান্তরিত হয়। দিল্লীতে আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি ব্যাঙ্ককে ছিলেন।

মিঃ দেশাই—রেঙ্গুণে আসিবার সময় ক্ষমতাসূচক পত্রগুলি কি আপনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন ?

মিঃ হাচিয়া—ঐগুলি আমি সঙ্গে আনি নাই। তবে আসিয়াই আমি পররাষ্ট্র সচিব কর্ণেল চ্যাটার্জ্জীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম।

রেঙ্গুণ পরিত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাক্ষী টোকিওতে ছিলেন। জাপ পর-

রাষ্ট্র সচিব মিঃ সিগিমিৎসুর নিকট হইতেই তিনি রেঙ্গুণে আসিবার জন্য আদেশ পাইয়াছিলেন।

আরও প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে আজাদ হিন্দ সরকারে যোগদানের পূর্ব্বে তিনি জাপ কূটনৈতিক বিভাগে কার্য্যরত ছিলেন। তিনি পোলাণ্ডস্থিত জাপ দূতের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, মন্ত্রী হিসাবে বুলগেরিয়ায় ছিলেন এবং কিছুকাল টোকিওর বৈদেশিক কার্য্যালয়ের কৃষ্টি বিভাগের প্রধান ছিলেন। রেঙ্গুণে আসিবার সময় তাহার সঙ্গে কোন ক্ষমতাসূচক পত্র ছিল না কারণ উহা তাহাকে দেওয়া হয় নাই। আজাদ হিন্দ সরকার অস্থায়ী বলিয়াই তাঁহাকে কোন ক্ষমতা সূচক পত্র দেওয়া হয় নাই এবং তিনিও তাহা জানিতেন।

প্রঃ—কিজন্য ক্ষমতাসূচক পত্র আপনাকে দেওয়া হয় নাই তাহা আপনি কি জানিতেন ?

উঃ—কথা প্রসঙ্গে আমাকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, কোন ক্ষমতা সূচক পত্রের প্রয়োজন নাই। পরে উহা প্রেরণের সংবাদ আমাকে তারযোগে জানান হইয়াছিল। কিন্তু আমি আদৌ পাই নাই।

এ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার এন, পি, এঞ্জিনীয়ার কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে মিঃ হাচিয়া বলেন যে, ১৯৩৯ সালে জাপ মন্ত্রী হিসাবে তিনি বুলগেরিয়ায় ছিলেন। পোল্যাণ্ড হইতে তিনি বুলগেরিয়ায় যান এবং তাঁহার ক্ষমতাসূচক পত্রগুলিও টোকিও হইতে বুলগেরিয়ায় পাঠান হয়।

প্রশ্ন—রেঙ্গুণ যাত্রাকালে কোন কাগজ পত্র সঙ্গে লইয়াছিলেন কি ?

উঃ—না।

জাপ সরকারের কোন ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন পত্রাদিও সঙ্গে গ্রহণ করেন নাই।

—না। কোন কাগজ পত্রই আমার সঙ্গে ছিল না। রেঙ্গুনে উপস্থিত হইয়াই আমি আজাদ হিন্দ সরকারের পররাষ্ট্র সচিব কর্ণেল চ্যাটার্জ্জীর সহিত

সাক্ষাৎ করিয়া জ্ঞাপন করি যে, আমি মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছি। ইহার পর আমি মিঃ আয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করি।

—প্রথমে কবে আপনি কর্ণেল চ্যাটার্জ্জীর সহিত সাক্ষাৎ করেন?

—ঠিক কবে তাহা আমার মনে নাই, তবে আমার উপস্থিতির দুই এক দিন পরেই সাক্ষাৎ করিয়া ছিলাম।

কর্ণেল চ্যাটার্জ্জী ও মিঃ আয়ারের সহিত আপনার একবার না দুইবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

আয়ারের সহিত আমি একবার মাত্র সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম এবং কর্ণেল চাটার্জ্জি, একবার মাত্র আমার গৃহে আসিয়াছিলেন।

মিঃ হাচিয়া বলেন যে তিনি সুভাষচন্দ্র বসুকে রেঙ্গুণে দেখেন নাই।

তিনি কি আপনার সহিত দেখা করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন?

হঁ্যা. তিনি আমার সহিত দেখা করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

নিশ্চয়ই আপনাকে দেখান হইয়াছিল?

আমার ধারণা' আমার সঙ্গে কোন ক্ষমতাসূচক পত্র ছিল না বলিয়াই তিনি আমার সহিত দেখা করেন নাই। কর্ণেল চ্যাটার্জ্জি সে কথা আমাকে বলিয়াছিলেন।

প্রঃ—ইহার পর ক্ষমতা পত্রের জন্য জাপ সরকারকে তার করিয়াছিলেন কি?

উঃ—কর্ণেল চ্যাটার্জ্জি শ্রীযুত বসুর অনুরোধ আমাকে জানাইলে পর আমি তার করিয়াছিলাম। রেঙ্গুনে আসিবার ৪।৫ দিন পরে উক্ত তার প্রেরণ করিয়াছিলাম। ক্ষমতাসূচক পত্রাদি প্রেরণের সংবাদসূচক তারও আমি জাপ সরকারের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম।

প্রঃ—আপনি উক্ত তার পাইয়াছিলেন কি?

উঃ—না।

প্রঃ—এই ব্যাপারে আপনি ঐ একমাত্র সংবাদই পাইয়াছিলেন?

উঃ—হ্যাঁ।

সাক্ষী বলেন যে ২৪শে এপ্রিল তিনি চীফ অব ষ্টাফ তানাকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

মিঃ দেশাইএর জেরার উত্তরে সাক্ষী বলে যে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার রেঙ্গুন হইতে ব্যাঙ্ককে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত জ্ঞান আছে। তিনি ব্যাঙ্ককে কর্ণেল চ্যাটার্জ্জির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

জেঃ তাদাসি কাতাকুর সাক্ষ্য

ইহার পর ইম্ফল অভিযান কালীন ব্রহ্ম সর্ব্বোচ্চ সদর কার্য্যালয়ের জেনারেল চীফ অব ষ্টাফ জেঃ তাদাসি কাতাকুকে জেরা করা হয়। তিনি বলেন যে, তিনি ১৯৪৩ সালে রেঙ্গুনে ছিলেন এবং আজাদ-হিন্দ-ফৌজকে জানেন। তিনি স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার সম্বন্ধে শুনিয়াছিলেন তবে ইহার বিশেষ বিবরণ তাহার জানা নাই। অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ সরকারের সম্পর্কে বক্তব্য বিষয় সমূহ প্রেরণ করিবার জন্ত তিনি শ্রীযুত বসুর সহিত রেঙ্গুনে সাক্ষাৎ করিয়া ছিলেন।

মিঃ তাদাসি কাতাকু তাঁহার সাক্ষে বলেন যে, ১৯৪৩ সালে তিনি রেঙ্গুনে ছিলেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজকে জানেন। উক্ত বাহিনী কোন কালেই জাপ তাঁবেদার ছিল না। জাপ সরকার ও আজাদ হিন্দ সরকারের যুক্ত ঘোষণায় আজাদ হিন্দ সরকারের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয় এবং বলা হয় যে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সম্পর্কে আজাদ হিন্দ সরকারকে জানান হইবে ও অধিকৃত ভূভাগ উক্ত সরকারের শাসনাধীনে থাকিবে।

শ্রীযুত দেশাই—অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ সরকারের কার্য্যাবলী সম্পর্কে শ্রীযুত বসু আপনার সহিত কোন কথা বলিয়া ছিলেন কি?

জজ এ্যাডভোকেট বলেন যে, সাক্ষী প্রত্যক্ষভাবে কিছু দেখে নাই। শুনা

কথার উপর সাক্ষ্য চলে না। মিঃ দেশাই তাহার সমক্ষে এভিডেণ্ট এক্টের নজির তুলিবার পর ব্যাপারটী সোজা হইয়া যায়।

পরে সাক্ষী বলেন শ্রীযুক্ত বসু তাঁহাকে জানান যে ভারতের স্বাধীনতা আদায়ের জন্যই তাঁহাদের সৈন্য ও অস্থায়ী সরকার প্রয়োজন। সাক্ষী আরও জাপ দক্ষিণ বাহিনীর কমাণ্ডারের অনুমতি অনুসারে তিনি ইম্ফল অভিযান পরিকল্পনা রচনা করেন।

প্রঃ—উক্ত অভিযান আজাদ হিন্দ ফৌজের কি কার্য্যপন্থা ছিল?

উঃ—আজাদ হিন্দ ফৌজ স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য পৃথকভাবে যুদ্ধ করিয়াছিল। জাপ নিয়ন্ত্রণে উক্ত বাহিনী পৃথক আক্রমণের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ১৯৪৪ সালে জানুয়ারী মাসে রেঙ্গুনে প্রথম গেরিলা রেজিমেণ্ট আসিয়া উপস্থিত এবং ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ উহার অধিনায়ক নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সালের মার্চ্চ মাসে উক্ত রেজিমেণ্ট যুদ্ধ এলাকায় গমন করে। উক্ত বাহিনীকে একটী নির্দ্দিষ্ট ব্যূহ ভেদ করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

প্রঃ—উক্ত এলাকায় আক্রমণ ভার একমাত্র শাহনওয়াজের উপর ন্যস্ত ছিল —না, জাপ অফিসার তাঁহার সহিত ছিলেন?

উঃ—আমি ঠিক কিছু বলিতে পারি না। আমার মনে হয় উক্ত রেজিমেণ্টের সহিত একজন জাপানী যোগাযোগ অফিসার ছিলেন। তবে শাহ নওয়াজই উক্ত রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার ছিলেন।

প্রঃ—আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপ বাহিনীর সম্মিলিত পরিচালনার জন্য কোন ব্যবস্থা বা বুঝাপড়া হইয়াছিল কি?

উঃ—সাধারণতঃ যুদ্ধ অবর্ত্তমানে প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। কেবল যুদ্ধকালে জাপ হাইকমাণ্ডের অধীনে আসিয়াছিল।

প্রঃ—জাপ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারত ভূমিতে পদার্পণ করিলে ভারতের মধ্যে অধিকৃত ভূমি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা বা বুঝাপড় হইয়াছিল কি?

উঃ—ভারতে অধিকৃত সমস্ত ভূভাগই আজাদ হিন্দ ফৌজকে ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

প্রঃ—যে সমস্ত অধিকৃত স্থান আজাদ হিন্দ ফৌজকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে তাহার শাসন ব্যবস্থার জন্য জাপ ও আজাদ হিন্দ সরকারে মধ্যে কোন বুঝাপড়া হইয়াছিল কি?

উঃ—উহা অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার কর্তৃক শাসিত হইবার ব্যবস্থাই হইয়াছিল।

প্রঃ—অধিকৃত ভূভাগের লুণ্ঠীত দ্রব্যাদির সম্পর্কে কি ব্যবস্থা হইয়াছিল?

উঃ—সমস্তই আজাদ হিন্দ সরকারকে দিবার কথা ছিল।

প্রঃ—জাপ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতে প্রবেশের সময় কোন ঘোষণা জারী করা সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত জ্ঞান আছে কি?

উঃ—একটি ঘোষণা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এবং আর একটী জাপ জেনারেল স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। জাপ সরকারের ঘোষণায় বলা হইয়াছিল যে জাপানীরা বৃটিশ ব্যতীত ভারতীয়দের সহিত যুদ্ধ করিবে না। যাবতীয় লুণ্ঠিত দ্রব্যও অধিকৃত ভূভাগ অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারকে ছাড়িয়া দিবে। শ্রীযুক্ত বসুর সাক্ষরিত ঘোষণায় বলা হইয়াছিল না আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছে এবং জাপ অধিকৃত সমস্ত ভূভাগই ভারতীয়দের হস্তে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

সাক্ষী বলেন যে তিনি উক্ত ঘোষণাপত্রগুলি বর্ত্তমানে প্রদান করিতে সক্ষম।

প্রঃ—ইম্ফল অভিযানে যুক্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে কোন বুঝাপড়া হইয়াছিল কি?

উঃ—ইম্ফল অভিযানের প্রাক্কালে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারগণ, জাপ অফিসারগণ ও আমি নিজে একত্র মিলিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। উক্ত

সম্মেলনে একটি যুক্ত কমিটি গঠিত হয়। সংবাদের আদানপ্রদান, সেনাদল প্রেরণ প্রভৃতি ব্যাপারই সম্মেলনের প্রধান বিষয় বস্তু ছিল।

সাক্ষী বলেন ঐ পর্য্যন্তই আমার মনে স্মরণ আছে তবে আজাদ হিন্দ ফৌজের ও জাপ ফৌজের অফিসারগণ প্রায়শঃই মিলিত হইতেন।

স্যার এন পি ইঞ্জিনীয়ার জেরা করিলে সাক্ষী বলে যে, তিনি ১৯৪২ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৪৪ সালের পর্য্যন্ত রেঙ্গুনে ছিলেন পরে তিনি মেমিওতে চলিয়া যান। তিনি ১৯৪২ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৪৪ সালের জুলাই পর্য্যন্ত রেঙ্গুন ও মেমিও জাপ সদর কার্য্যালয়ের ষ্টাফ অফিসার ইনচার্জ্জ ছিলেন।

প্রঃ—১৯৪৪ সালের জুলাইএর পর ব্রহ্মস্থিত জাপবাহিনীর সহিত আপনার কোন সম্পর্ক ছিল না?

উঃ—না।

প্রঃ—১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে রেঙ্গুনে আগত রেজিমেণ্ট ছাড়া আজাদ হিন্দ ফৌজের গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে আপনার কোন জ্ঞান আছে কি?

উঃ—আমি কিছু জানি না, তবে আমি উহার সম্বন্ধে অনেক কিছুই শুনিয়াছি।

সাক্ষী বলে যে, ইম্ফল অভিযান ১৯৪৪ সালের মার্চ্চে আরম্ভ হয়। তবে কখন উহা সমাপ্ত হইয়াছে তাহা তাঁহার জানা নাই কারণ তিনি শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন না। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে ব্রহ্মে সাত ডিভিসন অর্থাৎ প্রায় ২৩০০০ জাপ সৈন্য ছিল।

প্রঃ—ব্রহ্মে ১৯৪৪ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজের সংখ্যা ১০,০০০ ছিল?

উঃ—প্রায় ১০,০০০ই হইবে।

—ইম্ফল অভিযানে যে আজাদ হিন্দ ফৌজ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা আছে কি?

উঃ—উহাতে মোটের উপর তিনটি ডিভিসন ছিল এই ডিভিসনে অনুমান সাত হইতে আট হাজার সৈন্য ছিল।

প্রঃ—আপনি বলিয়াছেন যে জানুয়ারী মাসে ব্রহ্মে আজাদ হিন্দ ফৌজের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। ইম্ফলে যাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা কি দশ হাজারের বেশী ছিল।

উঃ—আমার মনে হয় ইম্ফল অভিযানে দশ হাজারের বেশী আজাদী ফৌজ ছিল।

প্রঃ—তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছিল ?

উঃ—অনেকেই সিঙ্গাপুর হইতে কতক ব্রহ্ম হইতে কতক ভারত হইতে আসিয়াছিল বলিয়া তাঁহার ধারণা।

প্রঃ—আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানের জন্য লোক ভারত হইতে আসিয়াছিল এরূপ ধারণার কারণ কি ?

উঃ—আমি শুনিয়াছিলাম। সিঙ্গাপুর হইতে যাহারা আসিয়াছিল তাহারা ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী হইতেই আসা সুরু করে। ইম্ফল রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ ফৌজের কোন কোন রেজিমেণ্ট যুদ্ধে লিপ্ত ছিল তাহাদের নাম তাঁহার জানা নাই।

প্রঃ—আজাদ হিন্দ ফৌজের এক, দুই ও তিন নম্বর গরিলা রেজিমেণ্ট কি ইম্ফল রণাঙ্গনে ছিল ?

উঃ—আমার অনুমান হয়, উক্ত রেজিমেণ্টগুলি ছাড়াও কয়েকটা ছোট ছোট সৈন্য দল ছিল।

প্রঃ—আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে, ইম্ফল রণাঙ্গনের আজাদ হিন্দ ফৌজের সংখ্যা ১০ হাজার নয় তার বেশী ?

উঃ—প্রায় ১০ হাজার আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রথমে ছিল বলিয়াই আমার ধারণা ; তবে সময় সময় সংখ্যা বৰ্দ্ধিত করা হইয়াছিল।

প্রঃ—উক্ত তিনটী রেজিমেণ্টের সহিত এস এস গ্রুপ, ইণ্টেলিজেন্স গ্রুপ ও রি ইন্‌ফোর্সমেণ্ট গ্রুপ ও ছিল কি ?

উঃ—এস এস গ্রুপের কথা আমার মনে নাই, তবে বাহিনী দুইটির কথা মনে আছে।

প্রঃ—এস এস গ্রুপের আর এক নাম বাহাদুর গ্রূপ ছিল কি ?

উঃ—ইম্ফল রণাঙ্গনে এই তিনটি গ্রুপের কয়েকজন জাপ বাহিনীর সহযোগে কার্য্য করিয়াছিল। বাহাদুর গ্রূপ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নাই।

প্রঃ—ইম্ফল অভিযান কালে আজাদ হিন্দ ফৌজের সংখ্যা কি পরিমাণ আসিয়াছিল সে সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা আছে কি ?

উঃ—না।

অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলে যে ১৯৪৪ সালে তাহার উপস্থিতিতেই ইম্ফল অভিযান স্থির হয় এবং যতদিন তিনি সেখানে ছিলেন উক্ত পরিকল্পনার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। জাপ বাহিনী কোন দিনই আজাদ হিন্দ ফৌজকে শ্রমিকরূপে কাজে লাগায় নাই।

প্রঃ—১৯৪৪ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজকে রাস্তা নির্ম্মাণ ও মেরামত, সেতু মেরামত, জঙ্গল পোড়ান, গরুর গাড়ী চলাচল ও জাপদের জন্য রেশন বহিয়া লইয়া যাওয়ার কাজে ব্যবহার করা হইত কি না।

উঃ—যতদূর আমি জানি, আজাদ হিন্দ ফৌজকে ঐরূপ কোন কাজে লাগান হয় নাই।

অতঃপর শাহ নওয়াজের ডায়েরিতে লিখিত উক্ত কার্য্যে আজাদ হিন্দ নিয়োগ সম্পর্কিত লেখা দেখাইলে সাক্ষী বলে যে এই সকল ঘটনার বিষয় কিছুই তিনি জানেন না।

সাক্ষীকে আর একখানি দলিল দেখান হয়। উক্ত দলিলে আজাদ হিন্দ ফৌজকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম ভাগ খাস আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্তর্গত। দ্বিতীয় ভাগে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ, তাঁহাদের মনে জাতীয় ভাব জাগাইয়া দিতে হইবে। তৃতীয় ভাগে আজাদ হিন্দ

ফৌজে যোগদানে অনিচ্ছুক ও চতুর্থ ভাগে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের নাম। প্রথম দুই দলকে খাওয়া পরা দেওয়া হইবে ও বাকী দুই দলকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে জাপদিগের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

উঃ—শ্রীযুক্ত বসু ও জাপ দক্ষিণ বাহিনীর সেনাপতির মধ্যেই উক্ত বুঝাপড়া হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার ধারণা এ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত কোন জ্ঞান নাই। তবে ফিল্ড মার্শাল তোরুচির নিকট হইতে ঐরূপ আদেশ জে, কাওয়াবির নিকট আসিতে আমি দেখিয়াছি। তারিখ বোধ হয় ১৯৪৪ সালের শরৎকাল হইবে।

প্রঃ—শ্রীযুত বসু ও জাপ সরকারের ঘোষণার কথা আপনি কিরূপে জানিলেন?

সাক্ষী বলেন যে, তিনি উহার বিন্দু বিসর্গ জানেন না।

প্রঃ—আপনি জানেন কি যে হিকারী কিকানকে না জানাইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজের কোন অফিসার বা যে কেহ সংবাদের আদান প্রদান করিতে পারিত না।

উঃ—ঠিক উহার বিপরীতই ছিল। এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না।

প্রঃ—আপনি সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে লুণ্ঠিত দ্রব্য আজাদ হিন্দ সরকারে জমা দেওয়া হইবে। তাহাদের মধ্যে এই ব্যবস্থা হইয়াছিল?

উঃ—ঘোষণা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আমি শ্রীযুক্ত বসু ও হিকারী কিকাণের অধ্যক্ষ জেঃ ইয়ামামোতোর সহিত সাক্ষাৎ হয়। আমি শ্রীযুক্ত বসুর ঘোষণার অনুবাদ ও জাপ সরকারের মূল ঘোষণা দেখিয়াছি। ইহা ১৯৪৪ সালের কথা।

শ্রীযুক্ত দেশাই জেরা করিলে সাক্ষী বলেন যে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ ১৯৪৪ সালের মার্চ্চের শেষে হাকাকালানে আসেন। উহা ইম্ফল অভিযানের অংশ বিশেষ।

প্র :—সে সময়ে কোন যুদ্ধ চলিতেছিল কি ?

উ :—আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত সীমান্ত অতিক্রম করার রিপোর্ট আমি চাহিয়াছিলাম।

অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, শাহ নওয়াজ খানের রেজিমেণ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ভারত সীমান্ত অতিক্রম করার জন্য শাহ নওয়াজ ও তাহার রেজিমেণ্টকে শ্রীযুক্ত বসু অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

আজাদ-হিন্দ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রীর সাক্ষ্য

১১ই ডিসেম্বর সামরিক আদালতে আজাদ হিন্দ সরকারের দুইজন ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীর মিঃ এস, এ, আয়ার ও লেঃ কঃ লোগনাথনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। মিঃ আয়ার তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে, বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষের সময় আজাদ হিন্দ সরকার বাঙ্গলায় একলক্ষ টন চাউল পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন। বৃটিশ সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই।

মিঃ আয়ার অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের প্রচার সচিব ছিলেন।

মিঃ আয়ার বলেন যে, ১৯৪১ সালে যখন জাপানীরা যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন তিনি ব্যাঙ্ককে ছিলেন। ১০ই ডিসেম্বর তিনি ব্যাঙ্কক ত্যাগ করেন এবং বার্ম্মার ভিতর দিয়া ভারতে আসিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি অসমর্থ হন।

১৯৪২ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি থাইল্যাণ্ড, বার্ম্মা, মালয়, সিঙ্গাপুর, ইন্দোচীন, জাভা, সুমাত্রা, ফিলিপাইন, সাংহাই ও জাপান প্রভৃতি স্থানের ভারতীয়বৃন্দ ব্যাঙ্ককে একটি সম্মেলনে সমবেত হয়। এই সমস্ত দেশে ভারতীয়দের সংখ্যা হইবে ২৬ হইতে ৩০ লক্ষ। সাক্ষীও দর্শক হিসাবে এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে প্রাচ্য এসিয়ার ব্যাঙ্ককস্থ ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের কেন্দ্রীয় অফিসে তিনি যোগদান করেন। ভারতের স্বাধীনতা লাভই

এই লীগের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। সাক্ষী স্বাধীনতা লীগের প্রচার-সচিব নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষে তিনি লীগের সভাপতি শ্রীরাসবিহারী বসুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। শ্রীযুক্ত বসু সাক্ষীকে বলেন যে, স্বাধীনতা লীগের প্রধান অফিস সিঙ্গাপুরে যত শীঘ্র সম্ভব স্থানান্তরিত হইবে। ১৯৪৩ সালে এই স্থানান্তরিত করিবার কার্য্য সুরু হয় এবং সাক্ষীও ব্যাঙ্ককে অবস্থিত তাহার লোকদের এই সম্পর্কে উপদেশ দেন।

সাক্ষী আরও বলেন যে, থাইল্যাণ্ড, মালয়, সিঙ্গাপুর ইন্দোচীন প্রভৃতি স্থানে স্বাধীনতা লীগের শাখা ছিল। ইহার প্রতিস্থানেই লীগের সভ্য ছিল। লীগের সভ্য সংখ্যা ছিল ৭৫০০০০ জন।

সাক্ষী ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত একখান ইস্তাহার পেশ করেন। উক্ত ইস্তাহারে বলা হয় যে 'পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতীয়গণ আজ আর বিদেশী শাসনের অধীন নয়। তাহাদের নিজস্ব আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয়দের এই বিষয়ে সচেতন করার জন্য ও প্রত্যেক ভারতবাসীকে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য বলা হয়। ২৩২৫৬২ জন ভারতীয় এই আনুগত্য শপথ গ্রহণ করে। ভারতীয়দের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই সরকারের ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইত। এই সমুদয় অর্থ রেঙ্গুনে প্রতিষ্ঠিত আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কে রাখা হইত। এই ব্যাঙ্কের জনৈক ডিরেক্টর মিঃ দীননাথ এক বিবৃতিতে জানাইয়াছিলেন যে ১৯৪৪ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এই ব্যাঙ্কে ছিল ১৫,৪৫৩,১৪৪ ডলার এবং ডলারের মূল্য যুদ্ধের পূর্ব্বে ছিল এক টাকার কিছু বেশী। ইহা ব্যতীত সোনা রূপা পয়সা প্রভৃতিতেও প্রচুর অর্থ পাওয়া গিয়াছিল।

সাক্ষী বলেন যে, সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় বাহিনীর অধিনায়ক হন এবং পরে তিনি জাতীয় বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। একটি প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে জাতীয় বাহিনীতে যোগ দেওয়া না দেওয়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন ছিল।

বেসামরিক শাসন সম্পর্কে একটি ট্রেনিং স্কুলও স্থাপিত হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুর আসিলে এই স্কুল স্থাপিত হয়।

জাপ ও আজাদ হিন্দ সরকারের সম্পর্ক

সাক্ষী বলেন যে সমশক্তি সম্পন্ন দুইটি মিত্র রাষ্ট্রের ভিতর যেরূপ সম্পর্ক থাকে নিপ্পন সরকার ও আজাদ হিন্দ সরকারের মধ্যে সেইরূপ সম্পর্কই ছিল। উভয় সরকারের মর্য্যাদাই সমান ছিল। এই বিষয়ে সাক্ষী একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। ১৯৪৪ সালের মার্চ্চ মাসে সুভাষচন্দ্র বসু ও জাপদের মধ্যে এক সম্মেলন হয়। যুদ্ধ সহযোগিতা পরিষদের জন্য প্রথমে একজন জাপ সভাপতির নাম জাপানীরা প্রস্তাব করে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের চাপে ঐ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। আর এক বার শ্রীযুত বসু জাপ সরকারকে জানান যে মুক্ত অঞ্চল সমূহে কোন জাপানী ব্যবসা চলিতে পারিবে না এবং আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্য কোন ব্যাঙ্কও সেখানে থাকিতে পারিবে না। আজাদ-হিন্দ সরকারের চারিটি বেতার কেন্দ্র ছিল। এই সমস্ত কেন্দ্রের ভার ছিল সাক্ষীর উপর। জাতীয় বাহিনীতে মালয়ের বহু বে-সামরিক অধিবাসীও ছিলেন। ব্যবসায়ীগণ নগদ অর্থ ব্যতীত বহু খাদ্য দ্রব্যাদিও আজাদ-হিন্দ সরকারকে দেন।

আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষ হইতে বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় বাংলার সাহায্যের জন্য একলক্ষ টন চাউল দিবার প্রস্তাব করেন।

ব্যাঙ্ককে সম্মেলন সম্পর্কে ভারতীয়দের জাপ সরকারের মনোভাব কি তাহা করিতে বলা হয়। সম্মেলনে একটি কর্ম্ম পরিষদ গঠন করে। ১৯৪২ সালে গুজব উঠে যে কর্ম্ম পরিষদের সদস্যরা পদত্যাগ করিয়াছে। কেন তাহারা পদ-ত্যাগ করিলেন সাক্ষী তাহা জানেন না। সাক্ষী বলেন যে তিনি তখন ব্যাঙ্ককে ছিলেন না। সুতরাং তিনি এ সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারেন নাই। অন্য একটি প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে বার্মা হইতে যে সমস্ত ভারতবাসী অন্যত্র

চলিয়া গিয়াছিলেন জাপ সরকার তাহাদের সম্পত্তি অনুপস্থিত ভারতীয় সম্পত্তি সমিতির হাতে দেন এবং তাহারা ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এই সমিতি ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত এবং ইহা স্বাধীনতা লীগের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করিত। সাক্ষী বলেন যে প্রচার সচিব হিসাবে তাহার কর্ত্তব্য ছিল অস্থায়ী সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে সংবাদ প্রচার করা, ভারতীয় জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচার করা এবং সভা সমিতির বিষয় বস্তু প্রচার করা। ভারতীয়দের সম্পত্তি অনুসারে স্বেচ্ছায় তাহারা স্বাধীন ভারত সরকারকে তাহাদের উপার্জ্জনের কিছু অংশ দান কবিতেন, যাহাদের এই অর্থ সংগ্রহের ভার ছিল তাহারা ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং কি ভাবে অর্থ আদায় করা হইবে ধনী ব্যক্তিদের সহিত এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন এবং তাহারও আলোচনা হইত। তাহাদের মত অনুসারে কতক অংশ আদায় করা হইবে তাহার একটি হার নির্দ্ধারণ করা হয়। এই হার সর্বত্র সমান ছিল না। এই জন্য মালয়ে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং বার্ম্মাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া একটি নেতাজী কমিটি গঠিত হয়।

অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী ও এপ্রিলের মধ্যে আবদুল গনি নেতাজী তহবিল সমিতির সভ্য হন। নেতাজীর জন্মদিবস উপলক্ষে অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কিছুদিন আটক রাখা হয়। দ্রব্যাদির সংগ্রহ ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। সৈন্য বাহিনীতে যাহারা যোগদান করে তাহারা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাতেই যোগদান করিত। কোনরকম বাধ্যতার প্রশ্ন ছিল না। সাক্ষী বলেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনে জাপানীদের কোন হাত ছিল বলিয়া তাঁহার জানা নাই। সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে জাপানীরা কোন সীমা নির্দ্ধারণ করে নাই। জাপ সরকার যে অস্থায়ী সরকারকে স্বীকার করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র নিজে তাহা ঘোষণা করেন এবং আজাদ হিন্দ সরকারের গেজেটে জাপ সরকারের এই ঘোষণা প্রকাশিত হয়।

সাক্ষী বলেন যে, বেতার কেন্দ্রগুলি জাপ নিয়ন্ত্রণে ছিল না। আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার স্বেচ্ছায় গণমত প্রচারের জন্য বক্তৃতা করিতেন এই সম্বন্ধে কোন বাধাবাধকতা ছিল না।

বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সাক্ষী বলেন যে বাংলায় চাউল পাঠাইবার প্রস্তাব বেতারযোগে ভারতের অধিবাসী এবং বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ১৯৪৩ সালের আগষ্ট মাসে সিঙ্গাপুর হইতে ঘোষণা করা হয়। বেতারযোগে বলা হয় যে যদি বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ চাউল পাঠাইবার দায়িত্ব নিতে রাজী হন তবে বার্ম্মার যে কোন বন্দর হইতে এই চাউল পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইতে পারে।

লেঃ কর্ণেল লোগনাধনের সাক্ষ্য

স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রি সভার সদস্য এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের চীফ কমিশনার লেঃ কর্ণেল এ, ডি, লোগনাধনের সাক্ষ্য অতঃপর গ্রহণ করা হয়।

লেঃ কর্ণেল লোগনাধন বলেন যে সিঙ্গাপুর পতনের সময় তিনি ১৯ নম্বর ভারতীয় হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেন। সাক্ষী ব্যাঙ্কক সম্মেলনেও উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে ৬০।৭০টি প্রস্তাব পাশ করা হয়। ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের ধন সম্পত্তি রক্ষাকরার জন্য আবেদন জানান হয়। একটি সৈন্য বাহিনী গঠন করিবার জন্যও একটি প্রস্তাব করা হয়। অপর একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য স্বাধীনতা লীগ যাহা কিছু করিবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শেই করিবে। যদি কংগ্রেস আজাদ হিন্দ ফৌজকে ভারতে যাইতে বলে তবেই তাহা করা হইবে।

সাক্ষী বলেন, ১৯৪২ সালে সুদূর পূর্ব্ব এশিয়ায় আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ অস্থায়ী ভারত সরকারের হাতে আসিলে তিনি পোর্ট ব্লেয়ারে যান। সাক্ষী

উক্ত দ্বীপের ভার গ্রহণ করেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সাক্ষীকে ইহার চীফ কমিশনার নিযুক্ত করেন।

১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত সাক্ষী আন্দামান শাসন করেন। পরে তিনি সিঙ্গাপুরে গিয়া তাহার শাসন সম্পর্কে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নিকটে এক বিবরণ দেন। প্রথমে নেতাজী তাহাকে উক্ত বিবরণ সহ টোকিও যাইতে বলেন। কিন্তু অসুস্থ হওয়ায় উক্ত আদেশ পালন করিতে পারেন নাই। নেতাজী টোকিও হইতে ফিরিয়া আসিলে সাক্ষী তাহাকে উক্ত দ্বীপের শাসন সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ প্রদান করেন।

সাক্ষীর অনুপস্থিতিতে মেজর অলভি চীফ কমিশনারের কার্য্য করেন। সাক্ষীর শাসনকালে উক্ত দুইটি দ্বীপের নাম রাখা হয় শহীদ (আন্দামান) ও স্বরাজ (নিকোবর)।

সরকার পক্ষের কৌঁসুলী স্যার এন. পি. ইঞ্জিনিয়ারের এক জেরার উত্তরে সাক্ষী জাপান কর্ত্তৃক স্বাধীন ভারতীয় অস্থায়ী সরকারের নিকট আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ছাড়িয়া দেওয়া সম্পর্কে টোকিও বেতার হইতে যে ঘোষণা করা হইয়াছিল তাহা সমর্থন করেন। সাক্ষী উক্ত বেতার ঘোষণার সঠিক বাক্যাবলী স্মরণ করিতে অসমর্থ হন।

প্রশ্ন—আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে, জাপানীরা কখনও স্বাধীন ভারতীয় অস্থায়ী সরকারের নিকট আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ছাড়িয়া দিয়াছিল?

উত্তর—জাপানীরা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ছাড়িয়া না দিলে আমি সেখানে যাইতাম না।

প্রঃ।—ছাড়িয়া দেওয়ার সময়ে এইরূপ সর্ত্ত মানিয়া লওয়া হইয়াছিল কি যে যুদ্ধাবসানে সেইগুলি পুনর্ব্বার জাপানীদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।

উঃ—না।

প্রঃ—জাপানীরা এইরূপ বলিয়াছিল কি যে যুদ্ধ কালীন সময়ে দ্বীপপুঞ্জের নিরাপত্তা ও ক্ষতির সহিত সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি ছাড়া আর অন্যান্য সমস্ত বিভাগগুলিই তাহারা সরাইয়া লইয়া যাইবে।

উঃ—হ্যাঁ, ইহা সত্য।

প্রঃ—শিক্ষা বিভাগটি তাহারা একমাত্র সম্পূর্ণভাবে আপনাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল ইহা সত্য কি?

উঃ—আমিই শিক্ষা বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। স্যার এন, পি, ইঞ্জিনিয়ার উপরোক্ত প্রশ্নটি দুইবার জিজ্ঞাসা করেন এবং একটু রাগতভাবে লেঃ লোগনাধনকে বলেন—প্রশ্নের জবাব দিবার পূর্ব্বে আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি তাহা ভাল ভাবে শুনুন। লেঃ লোগনাধন তখন বলেন—আপনি 'পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দেওয়া' এই কথার কি অর্থ করিতেছেন তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

প্রঃ—আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, শিক্ষা বিভাগই কি সম্পূর্ণভাবে আপনার হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল?

উঃ—আমি একমাত্র শিক্ষা বিভাগেরই ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম।

প্রঃ—আপনি কি অন্য বিভাগের ভার গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন?

উঃ—পুলিশ বিভাগ আমার হস্তে ছাড়িয়া না দিলে আমি অন্যান্য বিভাগের ভার গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলাম।

প্রঃ—পুলিশ বিভাগও আপনাদের নিকট ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই।

উঃ—আমার আন্দামান পরিত্যাগের সময় পর্য্যন্ত উহা ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই।

প্রঃ—অন্যান্য বিভাগ কি আপনাদের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই?

উঃ—আমি অন্যান্য বিভাগের ভার গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলাম। দেওয়া এবং লওয়ায় তফাৎ অনেক।

এডভোকেট জেনারেল—কি রকম তফাৎ তাহা এখন দেখিব।

প্রঃ—শিক্ষা বিভাগ সম্পর্কে জাপানীরা সকল বালক বালিকাদিগকেই নিপ্পনীগো স্কুলে পাঠাইবার জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য পক্ষপাতী ছিল।

উঃ—ইহা সবটা সত্য নহে। তাহাদের নিপ্পনীগো স্কুলে কিছু ছাত্র ছিল। আমাদের শিক্ষাবিভাগের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না।

প্রঃ—আন্দামানে থাকাকালীন আপনি কি জাপানীদের মারফত ব্যতীত সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত কোনরূপ পত্রালাপ করিতে পারিতেন না?

উঃ—আমি প্রধান অধ্যক্ষের নিকট মাসিক রিপোর্ট প্রেরণ করিতাম।

প্রঃ—আমি কি ইহা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

উঃ—আমি আপনার প্রশ্ন বুঝিতে পারিতেছি না।

এডভোকেট জেনারেল পুনর্ব্বার প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেন।

তখন সাক্ষী বলেন—পত্রালাপের অন্য কোন সুযোগ সুবিধা না থাকায় বাধ্য হইয়া আমাকে জাপানীদের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত।

প্রঃ—জাপানীরা কি আপনার রিপোর্টগুলি সেন্সার করিত।

উঃ—আমি মোহরাঙ্কিত করিয়া পত্রগুলি জাপানীদের হাতে দিতাম এবং সেইগুলি সর্ব্বাধ্যক্ষ সুভাষচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিতে বলিতাম।

প্রঃ—ইহা সত্য নহে। ইহা কি সত্য যে জাপানীরা আপনার রিপোর্টের কিছু কিছু অংশ পরিবর্ত্তন করিয়া দিত।

প্রঃ—এক সময় জাপানীরা একটি রিপোর্টে আমার নিকট ফেরত পাঠাইয়া এইঅনুরোধ জানাইয়াছিল যে আমি যেন ইহার দুই তিনটি অংশ পরিবর্ত্তন করিয়া দেই কারণ ঐ অংশগুলি শত্রুর হস্তে পড়িলে বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে।

প্রঃ—আপনাকে একটি রেডিও সেট ব্যবহার করিতেও তাহারা অনুমতি দেয় নাই।

উঃ—আমি একটি রেডিও সেট চাহিয়াছিলাম। জাপানীরা তাহা দিতে সম্মত হইয়াছিল। কিন্তু জিনিষপত্রের অভাব থাকায় তাহারা তাড়াতাড়ির মধ্যে আমাকে রেডিও সেট দিতে পারে নাই।

প্রঃ—দেশরক্ষা সম্বন্ধীয় কোন কার্য্যাবলী আপনাকে পরিদর্শন করিতে দেওয়া হইত না।

উঃ—আপনার প্রশ্নে মনে হইতেছে যে আমি দেশরক্ষা সম্বন্ধীয় কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিতে চাহিয়াছিলাম এবং জাপানীরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। কিন্তু আমি দেশরক্ষা সম্বন্ধীয় কার্য্যাবলী পরিদর্শনে মোটেও উৎসুক ছিলাম না।

সাক্ষী আরও বলেন যে সুভাষচন্দ্র বসুই তাহাকে আন্দামানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আন্দামানে প্রেরণ করিবার সময়ে তাঁহাকে ক্ষমতাপত্র ও পরিচয়পত্র দেওয়া হইয়াছিল।

এডভোকেট জেনারেল তখন সুভাষচন্দ্র বসুর পত্র হইতে একটি অংশ পাঠ করিয়া সাক্ষীকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন যে—"আপনাকে কি এইরূপ ক্ষমতাই দেওয়া হইয়াছিল ?

শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই তখন উপরোক্ত প্রশ্নে আপত্তি করিয়া বলেন যে একমাত্র আদালতই উপরোক্ত প্রশ্ন করিতে পারেন। আদালত এডভোকেট জেনারেলকে উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অনুমতি দিলে এডভোকেট জেনারেল সাক্ষীকে পুনরায় ঐ প্রশ্ন করেন।

সাক্ষী বলেন যে ঐ পত্রের মধ্যে তাহার কার্য্যাবলী সম্পর্কে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নেতাজী তাঁহাকে আরও ব্যাপক ক্ষমতা দিয়াছিলেন। সাক্ষী আরও বলেন যে এই পত্র ব্যতীত ও আন্দামানে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি নেতাজী নিকট হইতে অনেক মৌখিক নির্দ্দেশ পাইয়াছিলেন। উক্ত মৌখিক নির্দ্দেশে সুভাষচন্দ্র এইরূপ আদেশ দিয়াছিলেন

যে, স্থানীয় জরুরী অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সাক্ষী যেন ধীরে সমস্ত দ্বীপের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের চীফ কমিশনার হিসাবে সাক্ষী সুভাষচন্দ্রের নিকট কতকগুলি মাসিক রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সাক্ষী অতঃপর প্রেরিত রিপোর্টগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং এডভোকেট জেনারেলও এই সম্পর্কে সাক্ষীকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন।

সাক্ষী অতঃপর শিক্ষা ও স্বয়ং সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখা করেন। সাক্ষী আরও বলেন জাপানীদের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে তিনি অসামরিক চীফ জষ্টিস মহম্মদ ইকবালের নিকট হইতে সংবাদাদি পাইয়াছিলেন।

১২ই ডিসেম্বর—সামরিক আদালতের অধিবেশনে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের অধীনে নিযুক্ত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের চীফ কমিশনার কর্ণেল লোগনাধনের আরও জেরা চলিতে থাকে।

কর্ণেল লোগনাধন বলেন যে, তাঁহার শাসনকালে লেঃ মহম্মদ ইকবাল আন্দামানে বেসামরিক মামলার বিচার করিতেন। তিনি প্রায়ই টাকা পয়সা ঋণ, ঘরবাড়ী বন্ধক এবং সামাজিক সম্পর্ক সংযুক্ত পারিবারিক কলহ বিবাদ প্রভৃতি সংক্রান্ত ছোট ছোট মামলার বিচারই করিতেন। এসম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ সাক্ষীর স্মরণ নাই, কারণ মামলার সংখ্যা প্রচুর ছিল। সাক্ষী যে সময়ে আন্দামানে যান, সে সময়ে জাপানীদের একটি সরবরাহ বিভাগ ছিল। সাক্ষী সেখানে পৌছিবার পরও ইহার কার্য্য চলিতে থাকে। সাক্ষী গতকল্য যে স্বয়ং সম্পুর্ণতামূলক কার্য্যসূচীর কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন জাপানীদের উক্ত সরবরাহ বিভাগের পরামর্শ অনুসারেই তাহা ব্যবস্থাপিত হয়। সাক্ষীকে অতঃপর তাঁহার সাক্ষরিত ১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসের বিবরণী দেখান হয়।

প্রশ্ন—বিবরণীতে আপনি উল্লেখ করিয়াছেন, "ফলে অধিকতর বিশ্বাস

উৎপাদিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।" আপনি যতদিন সেখানে ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত আপনার ও জাপানীদের মধ্যে কোন বিশ্বাস ছিল না।

স্যার নসিরবান "অধিকতর বিশ্বাস" কথাটি বিকৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন বলিয়া শ্রীযুত ভুলাভাই অভিযোগ করেন। স্যার নসিরবান উহা অস্বীকার করেন এবং উক্ত অভিযোগ বাতিল হয়।

সাক্ষী বলেন যে ঐ বিশেষ ব্যাপারে মিঃ ইকবাল একটি গোয়েন্দাগিরির তদন্ত করিতেছিলেন এবং অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের হস্তক্ষেপে জাপানীরা আদৌ সন্তুষ্ট ছিল না। জাপানী ও আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যাপারেই বিশ্বাসের অভাব ছিল না এই ব্যাপারটি কেবল পুলিশের কার্য্যে হস্তক্ষেপ মাত্র। ১৯৪৪ সালের সেপ্টম্বর মাসে শ্রীযুক্ত বসুর নিকট হইতে আহ্বান আসায় তিনি আন্দামান পরিত্যাগ করেন। আন্দামানে আজাদ হিন্দ সরকারের কার্য্যাবলী কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে তৎসম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বসু তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। সাক্ষী অনুপস্থিতিকালে মেজর আলভিকে আন্দামানের অস্থায়ী কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। সাক্ষী সিঙ্গাপুরে ফিরিবার পূর্ব্বে মেজর আলভি তাঁহাকে একখানি পত্র দেন। মেজর আলভি আন্দামানে পড়িয়া থাকা অপেক্ষা রণক্ষেত্রে যাইতে ব্যগ্র ছিলেন।

মেজর আলভি যে পত্রখানি দিয়া ছিলেন সাক্ষীকে তাহা দেখান হয়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উক্ত পত্রে—আজাদ হিন্দ সরকারের সহিত জাপানীদের বনিবনা না হওয়ার কথা ও জাপানীদের নিষ্ঠুরতার কথা বলা হইয়াছে "আমি যদি জনসাধারণকে সাহায্য করিতে না পারি তাই হইলে তাহাদের মধ্যে স্বদেশ-প্রেমের উন্মাদনা আশা করা যাইতে পারে না ও তাহারা আজাদ-হিন্দ সরকারের যুদ্ধসম্পর্কীয় ব্যাপারে পরিপূর্ণ ভাবে সাহায্য করিতে সক্ষম হইবে না।

প্রশ্ন :—ইহা কি সত্য যে আপনি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের জন্য মেজর আলভিকে আপনাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ছিলেন।

উঃ—আন্দামান পরিত্যাগের পূর্বে আমার কর্ত্তব্য সম্পর্কে আমার নিজের কোন ধারনা ছিল না। সেইজন্য আমি আমার সঙ্গে কেবল শিক্ষিত লোকই লইয়াছিলাম যাহাতে তাহারা যে কোন কার্য্যের উপযুক্ত হইতে পারে। আমার উপস্থিতির সময় আন্দামানে ৬০ জন স্বেচ্ছাসেবিকা ছিল। ইহার পর আর সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই। ট্রেণিং লইবার জন্য আর স্বেচ্ছাসেবক না আসা সম্পর্কে মেজর আলভি যে উক্তি করিয়াছেন তাহা কোন একটি বিশেষ মাসে হইয়া থাকিবে বলিয়া মনে হয়।

এই সময় শ্রীযুত দেশাই বলেন যে, আসল কথা হইতেছে যে, জাপানীরা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জকে আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিল কিনা। শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা যাইতে পারে বটে, তবে এক্ষেত্রে উহার কোন মূল্য নাই। আদালত কিন্তু ঐ সকল প্রশ্নের মূল্য স্বীকার করেন।

প্রঃ—সর্বপ্রকার চেষ্ট সত্ত্বেও মানুষের জীবন ও স্বাধীনতা আদৌ নিরাপদ ছিল না, নয় কি?

উঃ—কেবল গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারেই জীবন নিরাপদ ছিল না।

প্রঃ—আন্দামান পরিত্যাগের পূর্বে ঐ স্থান হইতে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারকে চলিয়া আসিবার জন্য সুপারিশ করিতেছেন বলিয়া আপনি ভাইস এ্যাডমিরাল ও বেসামরিক শাসন কর্তাকে কিছু জানাইয়াছিলেন?

উঃ—না।

আরও প্রশ্ন করিলে সাক্ষী বলেন যে, সিঙ্গাপুর পৌছিবার পর আজাদ হিন্দ সরকারকে আন্দামান হইতে চলিয়া আসিবার জন্য শ্রীযুক্ত বসুকে কোন তার করেন নাই।

প্রঃ—অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার আন্দামান হইতে সরিয়া আসুক এরূপ ধারণা আপনার ছিল না? শ্রীযুক্ত দেশাই ও আমি এই প্রশ্নে বাধা দিতে চাই। সাক্ষী পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন যে আন্দামান হইতে তাহাদের চলিয়া আসার

ইচ্ছা আদৌ ছিল না এবং পক্ষান্তরে সমগ্র বেসামরিক শাসনকার্য্য চালাইবার ইচ্ছাই তাহাদের ছিল, এই প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর।

এডভোকেট জেনারেল: পাঁচ মিনিটেই দেখাইয়া দিব উহা অবান্তর কি না।

সাক্ষী বলেন যে তাঁহারা পুলিশ বিভাগ হস্তগত করিবার জন্তই চেষ্টা করিতেছিলেন।" যদি তাহারা উক্ত বিভাগ হস্তান্তর না করে, তখন চলিয়া আসার প্রশ্ন বিবেচনার বিষয় হইবে।"

আরও প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, টোকিও হইতে শুভেচ্ছা মিশন ফিরিয়া আসিলে বিদাদারীতে অফিসারদের একটি বৈঠকে আজাদ-হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে আলোচনা হয়। কোন জাপ অফিসার ঐ সময়ে উপস্থিত ছিল না।

বস্তুতঃ দেখা যাইতেছে যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কিত সকল পরিকল্পনা জাপানীরাই করিয়াছিল, নয় কি?

প্রঃ—অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের কার্য্যাবলী সম্পর্কে কোন স্পষ্ট জ্ঞান আছে কি?

উঃ—এ প্রশ্ন অত্যন্ত ফাকা এবং ইহার সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীযুক্ত দেশাই—ইহা অনেকটা বর্তমানে ভারত সরকার কি করিতেছেন প্রশ্নের মত। (হাস্ত)

প্রেসিডেণ্ট পরিষ্কার করিয়া বলেন যে মন্ত্রীসভার কোন অধিবেশন হইয়াছিল কিনা এবং কোন কোন বিষয় লইয়া আলোচনা হইয়াছিল।

সাক্ষী বলেন যে, স্বাধীন লীগ শাখাগুলির কার্যধারা, সৈন্তবাহিনীর প্রসার, সেনা সংগ্রহ ও তাহাদের ট্রেণিং দেওয়া, জাতীয় সঙ্গীত ও ভাষা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছিল।

আসমীপক্ষে

কৌঁসুলীগণ

শ্রীযুক্ত দীননাথের সাক্ষ্য

পরবর্তী সাক্ষী আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত দীননাথ সাক্ষ্য দান করেন। তিনি ব্রহ্মে কাঠের ব্যবসা ও ইঞ্জিনিয়ারিং কণ্ট্রাক্টর ছিলেন এবং পরে আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার হন। তিনি বলেন যে রেঙ্গুণে ৯৪নং পার্ক রোডে উক্ত ব্যাঙ্কের রেজিষ্টার্ড অফিস ছিল এবং উহা ব্রহ্মদেশীয় আইন মতে রেজিষ্টারী করা হইয়াছিল। রেঙ্গুণে নেতাজী ফাণ্ড কমিটি নামে একটী প্রতিষ্ঠান ছিল। অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের সাহায্যকল্পে চাঁদা তোলাই উহার কার্য্য ছিল। সংগৃহীত অর্থ আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কে অথবা আজাদ হিন্দ সরকারের রাজস্ব বিভাগে জমা হইত। অর্থ ও দ্রব্য উভয়ই সংগৃহীত হইত। উক্ত অর্থ সময় সময় সরকারী কার্য্যের জন্য ব্যয় করা হইত। উক্ত অর্থের পরিমাণ রেঙ্গুণে ১৫ কোটী টাকা ও মালয়ে ৫ কোটী টাকা ছিল। এই সংগৃহীত অর্থ ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবেও অনেকে এই ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখিত এবং উহার পরিমাণও প্রায় ৩০।৪০ লক্ষ টাকা ছিল। ১৯৪৪ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৪৫ সালের মে মাস পর্যন্ত ব্যাঙ্ক চালু ছিল। রেঙ্গুণ অধিকৃত হইবার পর বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যাঙ্ক বন্ধ করিয়া দেন। এই সময় আজাদ হিন্দ ফৌজের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৩৫ লক্ষ টাকা।

আরও প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, অধিকৃত ভূভাগের যাবতীয় উৎপন্ন আজাদ হিন্দ সরকারে জমা হইত।

ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের কার্য্যাবলী সম্পর্কে সাক্ষী বলেন যে, পূর্ব্ব এশিয়ার প্রায় সকল স্থানেই লীগের শাখা স্থাপিত ছিল এবং বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন কার্য্য করিত। যেমন, সৈন্য সংগ্রহ করা, ট্রেণিং দেওয়া, প্রচার, এ, আর, পি, বালসেনা প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করা। অনুপস্থিত ভারতীয়দের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করা, দুঃস্থদের সাহায্য করা, এ আর পি ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা ও শিশুদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় পরিচালনা করাই প্রধান প্রধান কার্য্যাবলীর মধ্যে গণ্য ছিল।

শ্রীযুক্ত দীননাথ তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ অসংখ্য বেসামরিক অধিবাসীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। বৃটিশ গোয়েন্দা বলিয়া জাপানীরা যে সকল লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছিল উহারা তাহাদের উদ্ধার করিয়াছে। একবার ৫০ জন গণ্যমাণ্য ভারতীয়কে জাপানীরা গ্রেপ্তার করিয়া ভীষণ শাস্তি দেয়, পরে আজাদ হিন্দ সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে তাহারা মুক্তিলাভ করে। ইহার পর হইতে ঐ সকল ব্যাপার আজাদ হিন্দ সরকারের অজ্ঞাতসারে আর হইত না। আর একবার একজন ইংরাজ চিকিৎসক মিঃ জন ও তাহার স্ত্রীকে জাপানীদের হাত হইতে রক্ষা করা হইয়াছিল।

জাপানীদের ব্রহ্ম দখলের পর তথায় ভারতীয়দিগকে হত্যা তাহাদের ধন-সম্পত্তি লুন্ঠিত হইতেছিল আজাদ হিন্দ সরকার রেঙ্গুণে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এ সকল অত্যাচার বন্ধ হইয়া যায়।

হাবশিব সিংএর সাক্ষ্য

পরবর্ত্তী সাক্ষী, আজাদ হিন্দ ফৌজের লেঃ হাবশিব সিং বলেন আমি আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন সভ্য ছিলাম এবং এখনও আছি।

সাক্ষী ব্রহ্মস্থিত জীয়াবাদী রাজ্যের আজাদ হিন্দ ফৌজ ট্রেণিং ক্যাম্পের কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। তিনি জীয়াবাদী সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন:— আমাদের ট্রেণিং ক্যাম্প ছাড়া সেখানে আজাদী ফৌজের একটী হাসপাতাল একটি চিনির কারখানা ও আজাদ হিন্দ দলের কার্য্যালয় সমূহ ছিল। এই আজাদ হিন্দ দলের কার্য্য ছিল আমাদের সৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত ভূভাগ ও এলাকাধীন স্থান সমূহ শাসন করা। তহশীলদারগণ কয়েকটি করিয়া গ্রামের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন এবং রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন ও ছোটখাট বিবাদ মীমাংসা বা বিচার করিতেন। বড় বড় বিবাদ সমূহ বিচারের জন্য আজাদ হিন্দ দলের নিকট প্রেরণ করা হইত। আজাদ হিন্দ সরকার জীয়াবাদীতে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র

প্রসাদকে উক্ত রাজ্যের ম্যানেজার, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মিশ্রকে পুলিশ বিভাগের কর্ত্তা, শ্রীযুক্ত বি, ঘোষকে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট, কৃষি ও স্বাস্থ্য বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শত্রু কবলমুক্ত এলাকা সমূহের শাসনকর্ত্তা জেঃ চ্যাটার্জ্জীর সদর কার্য্যালয় এই জীয়াবাদীতেই ছিল।

সরকারী পক্ষে কৌসুলীর প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সরকারকে জাপানীরা স্বীকার করার পর হইতে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেন।

প্রঃ—১৯৪৪ সালের শেষভাগে অথবা ১৯৪৫ সালের প্রথম দিকে আপনি ইংরাজ পক্ষকে সংবাদ সরবরাহ করিয়াছিলেন কি না?

উঃ—না, তবে আমি আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সরকারের জন্য কিছু কিছু কার্য্য করিয়াছি, যে সামরিক আদালতে আমার বিচার হইবে, তথায় সকল কথা খুলিয়া বলিব। মিঃ ব্রাউনকে আমি চিনি তবে তাঁহাকে সংবাদ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিই নাই।

প্রঃ—জীয়াবাদী আজাদ হিন্দ সরকারের অধীনে কিরূপে আসিল?

জাপসরকার ও আমাদের সরকারের মধ্যে চুক্তি ছিল যে, ভারতীয়দের যাবতীয় সম্পত্তি আজাদ হিন্দ সরকারের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

শ্রীযুক্ত দেশাই—জাপানীদের যুদ্ধাদর্শ সম্পর্কে সাইতো কি বিবৃতি দিয়াছিলেন এবং উক্ত বিবৃতিতে ভারত সম্বন্ধে কি বলা হইয়াছিল?

সাক্ষী—সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়ার মুক্তির জন্য জাপান যুদ্ধ করিতেছে এবং ভারতবর্ষও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

ক্যাপ্টেন আর্শেদের সাক্ষ্য

১৩ই ডিসেম্বর—সামরিক আদালতে দ্বাদশ সাক্ষী ক্যাপ্টেন আর্শেদের জেরা সমাপ্ত হইবার পর আসামীপক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ কার্য্য বন্ধ হয়।

এই দিনের সাক্ষ্য প্রধানতঃ আজাদ হিন্দ ফৌজ ও অস্থায়ী সরকারের শেষ পর্য্যায় সম্বন্ধে এবং গত বৎসর মে মাসে বৃটিশ বাহিনী কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ পুনরধিকৃত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মিত্রপক্ষীয় ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্যবৃন্দ রেঙ্গুনে শান্তি সংরক্ষণ কার্য্যে কিরূপ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে আজাদ হিন্দ ফৌজে আসামী ক্যাপ্টেন সেহগলের সহকর্ম্মী ও কলেজের সহাধ্যায়ী ক্যাপ্টেন আর্শেদ প্রায় ১৫০০ বর্গ মাইলব্যাপী মনিপুর এবং বিষ্ণুপুরের 'মুক্ত অঞ্চলে' শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলেন যে, উক্ত অঞ্চল জাপানী এবং আজাদ হিন্দ সরকার প্রভাবান্বিত সামরিক শাসনের অধীনে ছিল।

আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতে প্রবেশ করিলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও ব্রহ্মস্থিত জাপ সেনাপতি একটি ঘোষণা করেন। রণক্ষেত্রে যাইবার পূর্ব্বে উক্ত ঘোষণা আমি দেখিয়াছিলাম। উক্ত ঘোষণায় বলা হইয়াছিল যে, শত্রুকবল মুক্ত অঞ্চল সমূহ অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার কর্ত্তৃক শাসিত হইবে।

মণিপুরে যে সময় যুদ্ধ চলিতেছিল তখন মুক্ত এলাকা সমূহের শাসনভার ১নং ডিভিসন কম্যাণ্ডার মেজর কিয়ানীর উপর ন্যস্ত ছিল। মোরে অঞ্চলে আজাদ হিন্দ দলের সৈন্য ছিল তবে তাহারাও মেজর কিয়ানীর অধীন ছিল। ঐসময়ে কোহিমায় মোরে হইতে পালেল পর্য্যন্ত ১৫০০ বর্গমাইল ভূভাগ অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের অধীন ছিল।

ষ্টাফ অফিসার হিসাবে তিনি জানিতেন যে, সৈন্যদলসহ শাহ নওয়াজ কোহিমা অঞ্চলে যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন। জাপানীরা ২৩শে এপ্রিল রেঙ্গুণ পরিত্যাগ

আরম্ভ করে এবং শ্রীযুক্ত বসু ২৪শে এপ্রিল রেঙ্গুণ ত্যাগ করেন। রেঙ্গুণ পরিত্যাগের পূর্ব্বে তিনি কর্ণেল লোগনাধন্‌কে ব্রহ্মে জি. ও, সি ও সাক্ষীকে তাঁহার চীফ অব ষ্টাফ নিযুক্ত করেন। শ্রীযুক্ত বসু তাঁহাদিগকে বলেন যে, রেঙ্গুনে ভারতীয় বেসামরিক অধিবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ রাখিয়া যাইতেছেন।

সাক্ষী আরও বলেন, বৃটিশ বাহিনী রেঙ্গুনে না আসা পর্য্যন্ত এই বাহিনী সমস্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণ করিবে বলিয়া শ্রীযুত বসু আদেশ দেন। তারপর মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধির হস্তে আত্মসমর্পণ করিবার আদেশ দেন। এই আদেশ পাইবার পর চীফ অব ষ্টাফ হিসাবে আমি সকল প্রকার ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়াছিলাম। ঠিক এই সময়ে জাপবাহিনী ব্রহ্ম ত্যাগ করিতেছিল। ব্রহ্ম-দেশীয় কোন সৈন্যদলও বর্ত্তমান ছিল না। ব্রহ্মরক্ষী বাহিনী বলিয়া একটি সৈন্যদল ছিল বটে তবে তাহারা হয় লুকাইয়া ছিল না হয় রেঙ্গুনের বাহিরে ছিল। রেঙ্গুনে সশস্ত্র বাহিনী বলিতে যাহা ছিল তাহা এই আজাদ হিন্দ ফৌজের ৫।৬ হাজার সৈন্য।

বিভিন্ন সেনানিবাসে এই আজাদ হিন্দ ফৌজ থাকিত। তিনি এই সকল সেনানিবাসের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হস্তে লইয়া পাহারা দিবার এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই পাহারা কেবল ভারতীয় অধিকৃত এলাকায় ব্যবস্থা করা হইল। জি, ও, সি লোগনাধনের অনুমোদনের পর উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হয়। ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে জাপানীরা সম্পূর্ণভাবে রেঙ্গুন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। তখন রেঙ্গুনে শান্তি ও শাসন ব্যবস্থার কোন আয়োজন ছিল না। রেঙ্গুনে ব্রহ্ম সরকারের একজন অস্থায়ী মন্ত্রী ছিলেন বটে তবে তাঁহার হাতে কোন পুলিশ বাহিনী ছিল না। তিনি তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্যের আশা দেন। উক্ত মন্ত্রী মহাশয় আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিকল্পনায় সম্মতি প্রকাশ করেন এবং পরদিন তাঁহার প্রধান পুলিশ অফিসারকে পাঠাইয়া দেন।

উক্ত পুলিশ অফিসারের সহিত আলোচনা করিয়া ব্রহ্ম দেশীয় পুলিশ যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সাহায্যে রাত্রে টহলদারী কার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

চলিয়া যাইবার সময় জাপানীরা খাদ্য অঞ্চল ও খাদ্যশস্যের সমস্ত গুদাম খুলিয়া দিয়া চলিয়া যায়। ইহাতে গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা ছিল। যেখানে যেখানে গুদাম ছিল সেই সেই জায়গায় আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রহরী মোতায়েন করা হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশীয় মন্ত্রীসভা কর্ত্তৃক আহুত সভায় সাক্ষী যোগদান করিয়াছিলেন এবং আজাদ-হিন্দ ফৌজের কার্য্যধারা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এপ্রিল মাসের ২৫শে ২৬শে নাগাত সাক্ষী জানিতে পারেন যে, চলিয়া যাইবার সময় জাপানীরা সেন্ট্রাল জেলে অবরুদ্ধ বৃটিশ বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছে। সাক্ষী উক্ত জেলে গিয়া প্রাচীন অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করেন, ও তাঁহার নিকট আজাদ হিন্দ ফৌজের দাখিলা বিবৃত করেন। তাঁহার নিকট আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মসমর্পণের কথা উল্লেখ করায় তিনি তাঁহাকে যথা কর্ত্তব্য পালন করিতে বলেন। ঐ সময়ে ব্রহ্মরক্ষী বাহিনীর একজন অফিসার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাহাদের লইয়া উপরোক্ত বৃটিশ অফিসারের নিকট যান। এই ব্রহ্মরক্ষী বাহিনী বৃটিশ সৈন্যের সহযোগে কার্য্য করিতেছিল ও জাপানীদের সহিত ইহাদের অহিনকুল সম্বন্ধ ছিল। বর্ম্মী অফিসারটী রেঙ্গুনের দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উপরোক্ত বৃটিশ অফিসার তাঁহাকে সন্দেহ করেন এবং যে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে তিনি কার্য্য করিতেছেন তাঁহার লিখিত ক্ষমতাপত্র দেখাইতে না পারায় আজাদ হিন্দ বাহিনী তাঁহার কার্য্য চালাইয়া যাইতে থাকে।

৩রা মে সাক্ষী জানিতে পারেন যে, মিঙ্গালাওনের নিকটে আজাদ হিন্দ ক্যাম্পের কমাণ্ডার ইঙ্গিত করিয়া একখানি বৃটিশ উড়োজাহাজ নামান। এই

সংবাদ পাইবামাত্র আমি তাহাদের উইং কম্যাণ্ডার হাডসনের নিকটে লইয়া যাইতে বলে। হাডসন আমাদের জানান যে, ৪ঠা মে মিত্রবাহিনীর রেঙ্গুণ আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প স্থির আছে। চারিদিক হইতে গোলাগুলি বোমা প্রভৃতি বর্ষণ করা হইবে। তিনি এখানে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারকে এয়ারবোর্ড অফিসারের সঙ্গে রেঙ্গুনের বাহিরে অপেক্ষমান বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজে এই সংবাদ দিতে পাঠাইয়াছেন যে, রেঙ্গুন বর্ত্তমানে খোলা সহরে পরিণত হইয়াছে।

পরদিন ব্রিগেডিয়ার লয়ডার রেঙ্গুনে প্রবেশ করেন এবং তাহার আদেশে আজাদ হিন্দ ফৌজ টহলদারী কার্য্য হইতে বিরত হয় তবে তিনি ভারতীয় অধ্যুষিত টাঙ্গিয়াঙ্গিয়োগ জেলায় টহলদারী কার্য্য চালাইতে বলেন। পরে ১৩ই মে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম দল ভারত অভিমুখে রওনা হয়।

শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাইয়ের সওয়াল

১৭ই ডিসেম্বর প্রথম সামরিক আদালতে শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই তাঁহার সওয়াল আরম্ভ করেন। উক্ত সওয়াল উপলক্ষে তিনি বলেন যে, ক্যাপ্টেন শাহ্ নওয়াজ, ক্যাপ্টেন সেহগল, ও লেঃ ধীলনের বিরুদ্ধে : সংগ্রাম পরিচালনা করার যে অভিযোগ আনা হইয়াছে, তাহার দ্বারা বিদ্রোহী আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক আইনের নজীর দেখাইয়া শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই বলেন যে, সংগ্রাম পরিচালনার কথা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রাম পরিচালনাকারী বিদ্রোহী সরকারকে স্বীকার করার কথা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে, এবং এই স্বীকৃতির অর্থ আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম করার অধিকার মানিয়া লওয়া আর এই সংগ্রাম করার অধিকার স্বীকারের অর্থ সুষ্ঠুভাবে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজকে প্রদত্ত সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা ও স্বাধীনতাকে মানিয়া লওয়া।

শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই আধুনিক আন্তর্জ্জাতিক আইনের ব্যাখ্যা আইনের গ্রন্থাবলী হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার যুক্তি সমর্থন করেন। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় ইংলণ্ডের ইতিহাসের বিস্তৃত নজীর উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, ভারতীয় সৈনিকেরা যদি ইংলণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জার্ম্মানী, জাপান ও ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে তবে পরাধীন শক্তির হাত হইতে স্বদেশ মুক্ত করিবার জন্য তাহারা কেন যুদ্ধ করিতে পারিবে না? আজাদ হিন্দ সরকার সুসম্পূর্ণ ও সংগঠিত ছিল। বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে আজাদ হিন্দ সরকারের এই যুদ্ধ ঘোষণা সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জ্জাতিক আইনসঙ্গত। এখানে কোন সাধারণ অসামরিক আইনের প্রশ্ন উঠে না। যুদ্ধকালীন জরুরী

অবস্থার পট-ভূমিকায়ই ইহার বিবেচনা হইবে। সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুসারে যুদ্ধাবসানে কখনও এই অফিসার-ত্রয়ের বিচার চলিতে পারে না।

শ্রীযুত দেশাই তাঁহার সওয়াল জবাবের শেষাংশে আসামীত্রয়ের বিরুদ্ধে আনিত নরহত্যার অভিযোগগুলি অস্বীকার করেন। শ্রীযুত দেশাইয়ের মতে সরকার পক্ষের সাক্ষীরা আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত হত্যার অভিযোগগুলি সপ্রমান করিতে পারে নাই। তিনি আরও বলেন যে, অফিসারত্রয়ের বিরুদ্ধে আনিত এই বিচার সম্পূর্ণ বে-আইনী। এই উপলক্ষে তিনি প্রিভিকাউন্সিলের এক সিদ্ধান্তের নজীর উল্লেখ করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন এবং সকল সময়েই পরাধীন জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের অধিকাব সমর্থন করেন। তিনি বলেন, "রাজার প্রতি প্রজার আনুগত্যের কথা মূল্যহীন। আইনগত আনুগত্য কখনও চিরকাল বজায় থাকিতে পারে না। উক্তরূপ আনুগত্য চিরকাল বজায় রাখিতে গেলে পরাধীন জাতিকে কোন কালে স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে না।"

শ্রীযুক্ত দেশাই বলেন যে, সংক্ষেপে বলিতে গেলে আসামীদের বিরুদ্ধে ২টি অভিযোগ করা হইয়াছে,—রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, এবং হত্যা করা ও হত্যাকার্য্যে সাহায্য করা। কয়েকজন দলত্যাগীর বিচার হইয়াছিল, তাহাদিগকে গুলী করিয়া হত্যার আদেশ দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে গুলী করিয়া হত্যাও করা হয়। আসলে আসামীদের বিরুদ্ধে এই আদালতে একটি অভিযোগই আছে। কারণ, হত্যা ও হত্যাকার্য্যে সাহায্য করার অপরাধকে প্রথম অভিযোগের অংশ বলা যাইতে পারে। আমার এইরূপ বলার হেতু এই যে, রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিযোগ আনা হইলে গুলী করিয়া হত্যা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগও প্রথম অভিযোগের অন্তর্ভুক্ত করা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। আমার মতে পৃথক অভিযোগের উল্লেখ অবান্তর।

দণ্ডাদেশ প্রয়োগ করা হয় নাই

শ্রীযুক্ত দেশাই বলেন যে, যথা সময়ে তিনি দেখাইবেন যে, দ্বিতীয় অভিযোগ (অর্থাৎ হত্যা ও হত্যাকার্য্যে সাহায্য) সম্বন্ধে যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে যে চারি ব্যক্তিকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া বলা হইয়াছে, দলিল-পত্রে দেখা যায় যে, তাহাদের বিচার হইয়াছিল এবং দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া উল্লিখিত অভিযোগের আর কোন ভিত্তি নাই। মহম্মদ হোসেনের সম্বন্ধে কাগজপত্রে এমন কোন প্রমাণ নাই যে, তাহার প্রতি দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। এই সমস্ত ব্যাপারে আমি ইহা বলিতে বাধ্য যে, যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আদালত এই সিদ্ধান্তে আসিতে বাধ্য, যদিও এক ক্ষেত্রে দণ্ডাদেশ প্রদান করা হইয়াছিল, এবং অন্যক্ষেত্রে মোটেই প্রদত্ত হয় নাই, তথাপি কোন ক্ষেত্রেই কার্য্যতঃ দণ্ডাদেশ প্রয়োগ করা হয় নাই।"

শ্রীযুক্ত দেশাই বলেন, এই মামলায় এমন সব ব্যাপারের উদ্ভব হইতেছে, যাহা স্বাভাবিক ধরণের নহে এবং সম্ভবতঃ এই জন্যই সামরিক আদালত এই সকল বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন না। সাধারণতঃ সামরিক আদালতে ব্যক্তি বিশেষের কর্ত্তব্য কার্য্যে উপেক্ষা বা তৎসংক্রান্ত অপরাধেব বিচার হইয়া থাকে। আমি ইহা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি, এবং দলিলপত্রেও ইহা সমর্থিত হয় যে, বর্ত্তমান মামলা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অভিযোগে অভিযুক্ত নির্দ্দিষ্ট তিন ব্যক্তির মামলা নহে। সাক্ষ্য প্রমাণে যথেষ্টভাবে এই সত্য, নির্দ্ধারিত হয় যে, অভিযোগের বিবরনানুসারেই অত্র আদালতে অভিযুক্ত এই তিন ব্যক্তি রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত এক সুসংগঠিত বাহিনীর অংশ মাত্র। কোনও পরাধীন জাতি দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য যুদ্ধ করিয়া অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে কি না, ইহাই এখন আদালতের বিচার্য্য বিষয়। আন্তর্জ্জাতিক বিধানানুসারে আমি এমন নজীর দেখাইতে পারিব যে, কোন

জাতি বা ঐ জাতির অংশ এমন একটা অবস্থায় পৌছিতে পারে, যখন তাঁহারা দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য যুদ্ধ করিবার অধিকারী। আমি যথোপযুক্ত প্রমাণ দিয়া আদালতের সন্তোষ বিধান করিতে পারিব।

আর একটি বিষয় আছে যাহা আমি বেশ একটু ঐকান্তিকতার সহিত উল্লেখ করিতে চাই। জনসাধারণ যথেষ্ট পরিমানে এই মোকর্দ্দমার ফলাফল সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত। ইহা ভাল কি মন্দ সে-সম্বন্ধে কোন কথা আমি বলিতে চাহি না —তবে উহা সত্য। জনসাধারণ ও বড়লাট প্রমুখ রাজপুরুষগণ স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। আপনারা অভিযুক্তদিগের প্রতি ন্যায় বিচার করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আপনাদের সমক্ষে সকল প্রকার প্রমাণাদি রহিয়াছে এবং আমি আশা করি আপনারা কোন মতামতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া স্বীয় বিবেকের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আপন আপন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। এই জাতীয় বিচারে (এইরূপ অনেক মামলার বিচারের সময় আমার উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছে) যথার্থ ন্যায় বিচারের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মানসিক সাম্য বজায় রাখা বড় কঠিন।

জুরিগণকে আমি সাবধান করিয়া দিতে চাই যে, তাঁহারা যেন জনসাধারণের মতামতের দ্বারা প্রভাবিত না হন। তাঁহারা যেন মনে রাখেন যে বিচার তাঁহাদিগকেই করিতে হইবে। আদালতের কার্য্যবিধি অনুশীলন দ্বারা আমি যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে আপনারাই বিচারপতি। জজ এ্যাডভোকেট আপনাদের পরামর্শদাতা এবং আমি অথবা বাদী পক্ষের কৌসুলী আপনাদের সম্মুখে যে কোন আইন ও তথ্য হাজির করি না কেন। তিনি তাহার যথার্থ বিচার করিবেন। তাঁহার পরামর্শ আপনাদের নিকট মূল্যবান সন্দেহ নাই। তবে একথা আপনারা সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন যে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার স্বাধীনতা ও দায়িত্ব আপনাদের উপর ন্যস্ত। এই জাতীয় বিচারালয় অপেক্ষা শিক্ষা প্রাপ্ত বিচারকের আদালতে

আইনের জটিল প্রশ্নের আলোচনা সহজ একথা আমি অবশ্যই স্বীকার করি। অপর পক্ষে আমার সান্ত্বনা যে আমি অন্ততঃ এই ব্যাপারে আপনাদিগকে সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হইব।

শ্রীযুক্ত দেশাই কয়েকটী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলেন, "১৯৪১ সালের জাপান, বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে। তারপর কয়েকটি ঘটনা ঘটে সেগুলির উল্লেখ অদ্য আদালতের নিকট বিতর্কের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী বৃটিশ ভারতীয় বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং উক্ত ফেব্রুয়ারী মাসের ১৭ই তারিখে ফ্যারার পার্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ১৯৪২ সালে প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয় ও ১৯৪২ সালে উহা :ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হইয়া দ্বিতীয় আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ভার গ্রহণ করেন।

ভারতের স্বাধীনতা লীগ ও সুদূর প্রাচ্যের রাষ্ট্র সমূহের বহু প্রতিনিধিকে লইয়া বৃহত্তর পূর্ব্ব এসিয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য উক্ত সম্মেলনে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৪৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোবণা করা হয় ও রাষ্ট্রপতি হিসাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে বিভিন্ন দপ্তর সহ মন্ত্রীগণ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

অতঃপর অদ্য অস্থায়ী সরকার বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং নূতন রাষ্ট্রের অধীনে দ্বিতীয় আজাদ হিন্দ ফৌজ কার্য্য সুরু করে। ইহা পরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইতেছে আজাদ হিন্দ ফৌজ কর্ত্তৃক ব্রহ্ম অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ ও কোহিমা পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া।

সমস্ত ঘটনার বিষয় লক্ষ্য করিলে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা ও ঘোষণার বিষয় বস্তুকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এই ব্যাপার সম্পর্কে কাহারও কোন

সন্দেহ থাকিতে পারে না এবং প্রত্যেক সাক্ষীই তাহার অস্তিত্ব পরিষ্কার ভাষায় স্বীকার করিয়াছে।

আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণা

শ্রীযুক্ত দেশাই অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণাপত্র হইতে অংশ বিশেষ পাঠ করেন। উহাতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ এবং তাহার মিত্রগণকে ভারতভূমি হইতে বিতাড়িত করয়া এই অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারে কর্ত্তব্য হইতেছে ভারতীয় জনসাধারণের মতানুযায়ী একটি অস্থায়ী ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করা। আজাদ হিন্দ সরকার যে তাহার প্রস্তাবিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারে নাই তাহা এই আদালতের বিচার্য্য নহে।

দ্বিতীয় কথা হইতেছে যে, উক্ত সরকার অস্থায়ী হইলেও সুনিয়ন্ত্রিত। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য যুক্তিতর্কের অবতারণার প্রয়োজন নাই। বিভিন্ন মন্ত্রীকে বিভিন্ন কার্য্যের ভার দেওয়ার কথা এবং ভারতায় স্বাধীনতা লীগের অধীনে উক্ত সরকার পরিচালিত হওয়ার কথা এবং যুদ্ধকালে যতদূর সম্ভব জন সাধারণের সুখ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখাও উক্ত সরকারের কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগনিত ছিল বলিয়া সাক্ষীদের জবানবন্দীতেই ব্যক্ত হইয়াছে। সাক্ষ্য হইতে একথাও জানা গিয়াছে যে, ১৯৪৪ সালের জুন মাসে একমাত্র মালয়েই ২,৩০,০০০ নরনারী উক্ত আজাদ হিন্দ সরকারের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। লোক সংখ্যার কথা উল্লেখ করার আমার একান্ত উদ্দেশ্য হইতেছে যে,আমার বিরোধী পক্ষকে বুঝাইয়া দেওয়া যে উক্ত অস্থায়ী সরকার কতকগুলি বিপ্লবী বা বিদ্রোহীর সমষ্টি ছিলনা। আমার উদ্দেশ্য তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যে, উক্ত সরকার সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত ছিল নতুবা ২৩০০০০ নরনারী আনুগত্য স্বীকার করিত না।

শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই বলেন যে, আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট কখনও জাপ

তাঁবেদার ছিল না। ইহা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল এবং অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্র কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে। দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের পরস্পর যুদ্ধ ঘোষণার অধিকার রহিয়াছে। সুতরাং যুদ্ধাবসানে পরস্পর রাষ্ট্র কর্ত্তৃক যুদ্ধের সৈনিকদিগকে অভিযুক্ত করা আন্তর্জ্জাতিক আইনানুসারে অসঙ্গত। অতঃপর ভুলাভাই দেশাই বলেন যে, আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্টের সেনাবাহিনী বেশ সুসংবদ্ধ ও সুগঠিত ছিল। এই সম্পর্কে প্রত্যক্ষ দলিলপত্রাদিও রহিয়াছে। কাজেই ইহাদের যুদ্ধ করিবার অধিকার সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্নই উঠে না। ইহা ব্যতীত এই অফিসারত্রয়ের কতকগুলি সামান্য অপরাধ সম্পর্কে এডভোকেট-জেনারেল যে যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, ভারতরক্ষা আইনানুসারে তাহাও বাতিল হইয়া যায়।

সবদিক বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের যুদ্ধকালীন ভারতীয় আইন পরিষদ দৈহিক শাস্তি প্রদানের পক্ষপাতী। অতএব আমি এই বলিতে চাই যে, ভারতীয় সামরিক আইনাবলী যে উদ্দেশ্যে রচিত যথাযোগ্যভাবে সুগঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের আইনাবলীও তদুদ্দেশ্যেই রচিত। অতএব আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য রচিত আইন সমূহের সমালোচনা ভারতীয় সামরিক আইনাবলীর সমালোচনার সমতুল্য বলিয়া আমি এই বলিতে চাই যে, বর্ত্তমান মামলায় সরকারের তেমন উদ্দেশ্যে নহে।

এইবার যে বিষয়টি নিঃসন্দেহরূপে প্রতিষ্ঠীত করিতে চাই তাহা হইতেছে অস্থায়ী সরকারের যুদ্ধ ঘোষণা করিবার মুল উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে স্বাধীন করা। যে দ্বিবিধ উদ্দেশ্য লইয়া উক্ত সরকার গঠন সম্পর্কিত গুরুত্বপুর্ণ বিষয়টি সুস্পষ্ট-রূপে প্রমাণিত হইয়াছে তাহার প্রথমটী ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা। দ্বিতীয়টী— তৎকালে পূর্ব্ব এসিয়ার অবস্থিত ব্যক্তিবর্গের প্রাণ, মান ও সম্পত্তি সংরক্ষণ করা।

আমার পরবর্ত্তী প্রামাণ্য বিষয় হইতেছে যে, (১) জাপ সরকারই নব-

গঠিত ভারত সরকারের হস্তে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সমর্পণ করিয়াছিল (২) প্রায় ৫০ বর্গ মাইল ব্যাপী জিয়াবাদী অঞ্চলটীর অধিকার অস্থায়ী সরকারের হস্তে আসিয়াছিল এবং (৩) প্রায় ১৫০০ বর্গমাইল ব্যাপী মণিপুর ও বিষ্ণুপুর অঞ্চলদ্বয় চারি হইতে ছয় মাস ধরিয়া উক্ত সরকার শাসন করিয়াছিল। প্রথমে আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জদ্বয় সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া শ্রীযুত দেশাই বলেন যে, সরকার পক্ষের সাক্ষী লেঃ নাগ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে উক্ত দ্বীপপুঞ্জদ্বয় অস্থায়ী সরকারের হস্তে সমর্পিত হইয়া ছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সাহায্য প্রদানকল্পে আন্তরিকতার প্রাথমিক প্রমাণ স্বরূপ জাপ সরকার যে ভারতীয় অস্থায়ী সরকারের এলাকাধীনে সংশ্লিষ্ট দ্বীপপুঞ্জদ্বয় অনতিবিলম্বে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন লেঃ নাগের সাক্ষ্যে জেনারেল তোজোর এই মর্ম্মে ঘোষণা সম্বন্ধে বেশ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। পরবর্ত্তীকালে সংঘঠিত ঘটনাবলী হইতে পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, এতদুদ্দেশ্যে যথাযত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। নবগঠিত ভারত সরকারকে একজন কমিশনারের অধীনে উক্ত দ্বীপপুঞ্জদ্বয়ের শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আহ্বান করা হইলে। তিনি তথায় পৌছিবার পর ভারত সরকারের প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহার হস্তে তত্রত্য নৌ ও সামরিককর্ত্তৃপক্ষ পোর্ট ব্লেয়ারে আনুষ্ঠানিক ভাবে সমগ্র ক্ষমতা তাহার হস্তে অর্পন করেন। সরকার পক্ষীয় ও আসামী পক্ষীয় সাক্ষীদের সাক্ষ্যে যে সমান্য পার্থক্য রহিয়াছে উহা ঐ দ্বীপপুঞ্জদ্বয় শাসন ব্যবস্থার প্রকৃত গঠনপ্রণালী ও উহার ব্যপকতা সম্বন্ধে। শ্রীযুত দেশাই বলেন যে সেখানে তৎকালীন্ অবস্থানুযায়ী তত্রত্য সর্ব্ববিধ শাসন ব্যবস্থার ভার গ্রহণ এবং উক্ত অঞ্চলদ্বয়ের শাসন ভার সমর্পণ এতদুভয়ের মধ্যে বুঝিবার গোলযোগের জন্যই ঐরূপ ভ্রান্তিজনিত পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে। এই সম্পর্কে তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন, একটি বাড়ীর স্বত্ব সম্পূর্ণ ভাবে বিক্রয় করিবার পরও উহাদের সর্ব্ববিধ অধিকার প্রদান করিতে কিছুকাল কাটিয়া যায় তবে একথা সত্য যে কর্ণেল লোগনাধন সেখানে শাসন

কার্য্যের দুইটি বিষয়েরই ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল অন্যতম।

আলোচ্য দ্বীপপুঞ্জের স্বল্পায়তন, অল্পব্যয় এবং কমসংখ্যক বিদ্যালয়ের বর্ণনায় উক্ত দ্বীপপুঞ্জের অধিকার ও ক্ষমতা গ্রহণ সম্বন্ধে কোনরূপ ভিন্নমত প্রকাশ করে না। "আমার মনে হয় শতকরা ৯৯ জন যে দেশে শিক্ষিত তথাকার বিদ্যালয়েব সংখ্যা নিশ্চয়ই শতকরা আনুমানিক ১৫ জন শিক্ষিত ব্যক্তি অধ্যুষিত আমাদের এই দেশের চেয়ে অনেক বেশী।"

শ্রীযুত দেশাই বলেন, একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় হইতেছে এই যে, "শহীদ" এবং 'স্বরাজ' নামে উক্ত দ্বীপপুঞ্জদ্বয়ের নূতন নামকরণ করা হইয়াছিল।

তারপর প্রায় ১৫,০০০ জন অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই ভারতীয় অধ্যুষিত জিয়বাদী অঞ্চলটী অস্থায়ী সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন দ্বারা শাসিত হইত এবং আজাদ-হিন্দ দলের এলাকাধীন ছিল। নিপ্পন সরকার এবং অস্থায়ী সরকারে মধ্যে পারস্পরিক সর্ত্তনুযায়ী মুক্ত অঞ্চলের অন্যতম অংশরূপে এই অঞ্চলটী আজাদ-হিন্দ দলের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল।

আদালতে ইহা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবামাত্র দুইটী ঘোষণাপত্র প্রচার করা হইয়াছিল—উহা একটি অস্থায়ী ভারত সরকারের সর্ব্বাধিনায়ক কর্তৃক স্বাক্ষরিত; উক্ত ঘোষণাপত্রদ্বয়ে বলা হইয়াছিল যে জয় করিয়া কিংবা অন্য যে কোন উপায়েই হউক ভারতের কোন অংশ জাপবাহিনী অধিকার করিলে উহা মুক্ত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তরূপে শাসন করিবার উদ্দেশ্যে আজাদ-হিন্দ সরকারের অধীনে সমর্পিত হইবে।

আজাদ-হিন্দ রাষ্ট্রের আয় ও সম্পদের উল্লেখ করিয়া শ্রীযুত দেশাই বলেন যে, সাক্ষ্য প্রমানাদি হইতে আদালতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্টকে বিভিন্ন স্থান হইতে মোট ২০ কোটি টাকা দান

করা হইয়াছিল। উক্ত সংগৃহীত অর্থ হইতেই গভর্ণমেণ্ট ও সৈন্যদলের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। এইখানে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্টের অধীনে ব্রহ্ম, মালয় প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত বিচারকার্য্য করা হইত তৎসম্বন্ধে সমস্ত দলিল পত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ হইতে প্রেরিত মাসিক রিপোর্টগুলিও এই দলিলপত্রগুলির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। দলিলপত্রাদি হইতে ইহাও জানা গিয়াছে যে আজাদ-হিন্দ-সরকার পূর্ণভাবেই সংগঠিত হইয়াছিল।

অতঃপর শ্রীযুত দেশাই একটি দলিলের কথা উল্লেখ করেন।

দলিলখানি এডভোকেট জেনারেল স্যার এন, পি ইঞ্জিনিয়ারের আপত্তিতে আদালতে পাঠ না করিয়া সামরিক আদালতে দাখিল করা হয়। ইহা একটি প্রবন্ধ।

"ষ্টাম্প কালেকটিং" নামক সাপ্তাহিক পত্রে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত দেশাই প্রবন্ধটি পাঠ সম্পর্কে এডভোকেট জেনারেলের উক্তিতে আপত্তি করেন।

শ্রীযুত দেশাই বলেন যে, ঐ সময়ে প্রকাশিত সাহিত্য, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি যে কোন গ্রন্থাবলীই আদালতের নজীর হিসাবে গ্রহণ করার জন্য আদালতে পাঠ করিবার প্রয়োজন। ঐ সব সাহিত্যের প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কাজেই এই দলিল পত্রাদি পাঠ করা সম্পর্কে এডভোকেট জেনারেল যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহার কোন অর্থই হয় না। বিচারপতি অতঃপর শ্রীযুত দেশাইকে আদালতে উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুমতি দেন।

শ্রীযুত দেশাই অতঃপর উক্ত সাপ্তাহিক পত্রের প্রবন্ধটি পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধে উক্ত সাময়িক পত্রের এক সংবাদদাতা ইম্ফল পরিদর্শনে গিয়া এক নূতন রকমের ডাকটিকিট দেখিয়া আসিয়াছিলেন। ডাক টিকিট দুই রকমের ছিল—

তিন পয়সা ও এক আনার। এই ডাক টিকিট আজাদ-হিন্দ-সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। ডাক টিকিটে দিল্লীর মুঘলযুগের পুরাতন দুর্গ প্রাকারের ছবি অঙ্কিত এবং "দিল্লী চলো"—এই বাণী লেখা ছিল। ডাক টিকিটের উপরে —"স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার" ইহাও ছাপ মারা ছিল। উক্ত প্রবন্ধে আরও বলা হইয়াছে যে, ইম্ফল বিজয়ের পরে এই স্বাধীন ভারতের গভর্ণমেণ্টর ইম্ফল ডাকটিকিটগুলি যখন মূল্যহীন হইয়া পড়ে; তখন এই ডাক টিকিটের বহু পাতা পোড়াইয়া ফেলা হয়। আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্টর নিজস্ব সামরিক ও অ-সামরিক গেজেট ছিল। এই সব ঘটনাবলী হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্ট এক বিশেষ অবস্থার মধ্যে গঠিত হইয়াছিল এবং স্বদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের উদ্দেশ্যেই তাহারা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। শ্রীযুত দেশাই এখানে আইনগত প্রশ্ন বিস্তৃতভাবে বলেন যে, যুদ্ধ সাধারণতঃ মিউনিসিপ্যাল আইনের চক্ষে অন্যায়। কিন্তু দুইটি কিংবা তদতিরিক্ত জাতিসমূহ যখন যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন ইহার ব্যতিক্রম ঘটে। এখানে একটি দৃষ্টান্ত ধরা হউক যে, একটি জার্ম্মাণ দুই তিনটি বৃটিশকে হত্যা করিয়াছিল। এখন যুদ্ধাবসানে যদি তাহাকে লণ্ডনে দেখা যায়, তাহা হইলে কি তাহাকে নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করা হইবে? আমি বলিব, তাহা কখনও হইতে পারে না। কারণ, ইহা অতি সহজ ও সাধারণ কথা যে, যুদ্ধকালীন সেই ব্যক্তি তাঁহার প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করিয়াছিল মাত্র। বর্ত্তমান পৃথিবীতে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ অনিবার্য্য। সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুসারে যুদ্ধের পর কোন সৈনিককে হত্যার অপরাধে কখনও অভিযুক্ত করা যাইতে পারে না। আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুসারে দুইটি জাতি পরস্পর যুদ্ধ ঘোষণা করিলে যুদ্ধপরবর্ত্তী সময়ে যুদ্ধের অংশ গ্রহণকারী কোন সৈনিককে বিচার করা যাইতে পারে না। অবশ্য এখানে যুদ্ধাপরাধীদের কথা স্বতন্ত্র। অতঃপর ভারতীয় দণ্ডবিধির ৭১ ধারায় এই বিচার চলিতে পারে না। উক্ত

ধারায় ইহা লেখা আছে যে, আইনগত সমর্থন লইয়া যদি কোন অপরাধ করে, তাহা হইলে সেটা অপরাধ নহে। সুতরাং এই কারণে আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুসারে যুদ্ধ স্বীকৃত হইলে উক্ত বিচার কখনও চলিতে পারে না। এখানে আমার দৃষ্টান্তে উল্লিখিত জার্ম্মণটিকে যদি নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় তাহা হইলে সে তখন বলিতে পারে যে জার্ম্মাণ রাষ্ট্র তখন বৃটেনের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের আদেশানুসারেই সে যথারীতি যুদ্ধ করিয়াছিল। সুতরাং সাধারণ আইনের নিকট নরহত্যা গভীর অপরাধ হইলেও যুদ্ধকালীন নরহত্যা কোন অপরাধ নহে।

শ্রীযুত দেশাই অতঃপর দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেন—ইহা অতি স্বাভাবিক সত্য যে যুদ্ধকালীন অবস্থার সহিত অসামরিক সাধারণের কখনও প্রয়োগ চলিতে পারে না, অতঃপর সামরিক আদালতের বিচারপতিদিগকে সম্বোধন করিয়া শ্রীযুত দেশাই বলেন—আপনারা যদি যুদ্ধকালে কোন নরহত্যা করিয়া থাকেন তাহা হইলে যুদ্ধাবসানে অপর-পক্ষের সামরিক আইন অনুসারে আপনাদিগকে অভিযুক্ত করা যাইতে পারে কি? আপনারা এক সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রের সুসংগঠিত সেনাবাহিনীর প্রতি আনুগত্যে আবদ্ধ থাকিয়াই সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যুদ্ধকালে আপনারা আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। আপনাদের রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের সহিত আইন অনুসারে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। এই উপলক্ষে শ্রীযুত দেশাই আন্তর্জ্জাতিক আইনের গ্রন্থাবলীর বিস্তৃত আলোচনা করেন। হোয়েটনের লিখিত আন্তর্জ্জাতীয় আইন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া শ্রীযুত দেশাই তাঁহার বক্তব্যের দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করেন। উক্ত আইনের গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে:—

"আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্বের অনুপস্থিতিতে যদি দুই রাষ্ট্রের পরস্পর যুদ্ধ ঘোষণা হয় তাহা হইলে আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুসারে উহা সম্পূর্ণ আইনগত। উক্ত যুদ্ধ সময়ের কোন কার্য্য কলাপের সহিত শান্তিকালীন কোন কার্য্য-কলাপের তুলনা করা যাইতে পারে না।

আজিকার দিনে আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্ক এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ করা বড় কঠিন। কোন বিশেষ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য নহে। সমগ্র বিশ্বব্যাপী এই অবস্থা। কাজেই সমস্ত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই উপরোক্ত আইন প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা রাজনীতি নহে, ইহা আইন। যে কোন স্থানেই যদি স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়, তাহা হইলে উহা আধুনিক আন্তর্জ্জাতিক আইনের অবশ্যই সমর্থন যোগ্য। উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে ইহাই বুঝা যায় যে, যদি ভারতীয় সৈনিকেরা ইংলণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে জার্ম্মাণী ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইতে পারে তাহা হইলে ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশের হাত হইতে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য ভারতীয় সৈনিক কেন যুদ্ধ করিতে পারিবে না? সুতরাং আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধ ঘোষণা সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ইহা সম্পূর্ণ আইনানুগতই হইয়াছিল। প্রাচীন আইনানুসারে ইহা হইয়াছিল যে স্বাধীন এবং সার্ব্বভৌম অধিকার সম্পন্ন রাষ্ট্র না হইলে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে আইনতঃ সমর্থ নহে। কিন্তু বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক আইনানুসারে ইহা সম্পূর্ণরূপে বাতিল হইয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র না হইলেও পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে। গবর্ণমেণ্ট ও জনগণের মধ্যেও যুদ্ধ হইতে পারে। এ আদালতের নিকট আমার বিশেষ আবেদন এই যে, আপনারা যাঁহারা বৃটিশ ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন. তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রথম চার্লসের মৃত্যুদণ্ড, ম্যাগনাকার্টার স্বাক্ষর এবং দ্বিতীয় জেমসের রাজত্বের ঘটনাবলীর সহিত বিশেষভাবে অবগত আছেন। এই সব ঐতিহাসিক ঘটনাবলী কি আমার যুক্তিকে সমর্থন করে না?

বিচারকদের সম্বোধন করিয়া শ্রীযুত দেশাই বলেন, আমিও আপনাদের ঐরূপ করিতে অনুরোধ করিতেছি। ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্মান অসম্মান বা কাহার কি হইল না হইল সে প্রশ্ন অবান্তর। অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনারা মনে

রাখিবেন যে আপনারা রাজনীতিবিদ নন, আপনারা বিচারক। আপনারা যদি দেখিতে পান যে প্রচুর জনবল ও অর্থবল সহ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যুদ্ধ ঘোষণা করিবার মত একটি সুগঠিত শক্তিশালী বাহিনী সহ এই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। তাহা হইলে আপনারা নিশ্চয়ই এই বাহিনীর স্বপক্ষে রায় দিবেন। আপনাদের দেশেও যাহারা এই অবস্থায় অন্য লোককে হত্যা করিতেছে তাহাদের জন্য আপনারা যেরূপ গর্ব্ব অনুভব করেন ইহাঁদের জন্যও তেমনিই করিবেন।

শ্রীযুত দেশাই যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি ফুলারের একটি রায়ের উল্লেখ করেন। মিঃ ফুলার বলিয়াছেন, "যদি কোন দেশে গৃহযুদ্ধ চলিতে থাকে, তাহা হইলে দুই পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ দোষী বা নির্দ্দোষী, কোন বিদেশী সরকার সে বিচার সাধারণতঃ করিতে যায় না। যদি সে পক্ষ তদানীন্তন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে চায়, তাহারা সফলকাম হয় এবং তাহাদের কর্তৃক স্থাপিত প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত হয় তাহা প্রথম হইতে তাহাদের সমস্ত কার্য্যাবলী স্বীকৃত বলিয়া গ্রহণ করা হয়। আর যদি তাহারা ব্যর্থও হয় তবুও এই গৃহযুদ্ধের ফলে তাহাদের কাহাকেও ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা যায় না।

অতঃপর শ্রীযুত দেশাই ১৯৩৭ সালের আন্তর্জ্জাতিক আইন সম্পর্কে বৃটিশ ইয়ার বুকের কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করেন। ঐ অংশে উল্লিখিত আছে, 'যখন কোন দেশকে শত্রুদেশ বলিয়া ঘোষণা করা হয়, তখন সেই দেশের প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করার প্রশ্ন হইতেও বড় প্রশ্ন হইতেছে যে সেই দেশ যুদ্ধে লিপ্ত।"

এমন একটা সময় আসে যখন সেই দেশ নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। এস্থলে বলা যাইতে পারে এই বাহিনীই যদি তাহাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিত, তাহা হইলে আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুসারে এই সার্থক বিদ্রোহকেই আইনানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত সরকার বলিয়া স্বীকৃত হইত। কিন্তু

ইহার পূর্ব্বেও এমন একটা সময় এই বিদ্রোহী রাষ্ট্রের পক্ষে আসে যখন সেই রাষ্ট্র যুদ্ধে রত এ কথা স্বীকার পাইতে হইবে এবং এই স্থলে তাহাই আমি বলিতে চাই। যদি আমি সম্যকরূপে বুঝাইয়া দিতে পারি যে ইহারা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল এবং আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুসারে ইহারা যুদ্ধরত শত্রু দেশ বলিয়া পরিগণিত; তাহা হইলে তুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৈন্য বাহিনী যে সুযোগ সুবিধা পাইবার অধিকারী ইহারাও তাহা পাইবার অধিকারী। যদি এই কথাই যোষণা করা হয় যে বিদ্রোহীরা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছে তাহা হইলে বিদ্রোহীদের গভর্ণমেণ্টকেও স্বীকার করতে হইবে, কেন না একমাত্র গভর্ণমেণ্টই যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে এবং প্রতি যুদ্ধেই অন্ততঃ তুইটি পক্ষ থাকিবে। এই সত্যকে অনুধাবন করিতে না পারার জন্যই স্পেনের গৃহযুদ্ধের ব্যাপারে এত ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে।

কোন রাষ্ট্র যদি যুদ্ধরত শত্রু দেশ বলিয়াই ধরা হয় তাহা হইলে সেই দেশের সরকারকে স্বীকার করুন আর আর নাই করুন, যুদ্ধ চলা কালীন সেই রাষ্ট্রের বাহিনীকে আইন অনুযায়ী সুযোগ ও সুবিধা দিতে হইবে।

‘স্পেনীয়, আমেরিকান উপনিবেশগুলির যুদ্ধেরত হইবার অধিকারকে স্বীকার করিয়াছিল। অথচ তাহারা স্বাধীনতার জন্য গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল।

পৃথিবীর ইতিহাসের এই যুগে এই কথা কাহাকেও নূতন করিয়া বলিতে হইবে না যে পরাধীন দেশের নিজেকে স্বাধীন করিবার অ৷ধকার আছে। আনুগত্যের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। আইন অনুযায়ী তাহা একটা চিরস্থায়ী কিছু হইলে কোন পরাধীন জাতি কোন দিনই স্বাধীন হইতে পারিবে না। গণতন্ত্রের জন্য আজ যখন সমগ্র পৃথিবীতে সংগ্রাম চলিতেছে। তখন আনুগত্যের প্রশ্ন এখানে উঠিতে পারে না।

এই কথা অবশ্য নিঃসন্দেহ যে জাপান কোন কোন অঞ্চলের উপর অধিকার

দান করিয়াছিল, কিন্তু শুধু আমি বলিতে চাই, কোন রাষ্ট্রকে যুদ্ধরত বলিয়া ঘোষণা করিলেই যে ধরিয়া লইতে হইবে, সেই রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত অঞ্চলও আছে, ইহার কোন প্রয়োজন হয় না। গত যুদ্ধের সময় দেখা গিয়াছে, লণ্ডনে এমন অনেক বিদেশী গভর্ণমেণ্টের কেন্দ্র ছিল, যাহাদের কোন অধিকারভুক্ত অঞ্চল ছিল না—যেমন, লণ্ডনে অবস্থিত ফ্রান্স বা বেলজিয়ম সরকার। সাময়িকভাবে তাহাদের কোন অধিকারভুক্ত অঞ্চল না থাকিলেও কিছুই আসে যায় না। ১৫০ শত বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীদেরও কোন নিজ অধিকারভুক্ত অঞ্চল নাই, কিন্তু ইতিহাসের এই যুগে 'আঞ্চলিক' প্রশ্নের উপর জোর দিবার কোন প্রয়োজন নাই। বিভিন্ন জাতির মধ্যে কার্য্যকলাপের যেখানে প্রশ্ন সেখানে সময়ের প্রশ্ন কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না। যদি এমন হইত যে সমস্ত বিদেশী গভর্ণমেণ্ট সাময়িকভাবে যুদ্ধের সময় লণ্ডনে অবস্থিত ছিল তাহারা তাহাদের অঞ্চলগুলি ফিরিয়া না পাইত, তাহা হইলে কি কোন বৃটিশ আদালতে এই কথা বলা চলিত যে তাহাদের সৈন্য বাহিনী যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতেছে তাহাদিগকে তাহা দেওয়া হইবে না। আমরা ভারতবাসী বলিয়াই যেন আমাদের সম্বন্ধে ভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়।

জেনারেল আইসেনহাওয়ারের একটি ঘোষণার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুত দেশাই বলেন, "ফ্রান্সের ম্যাকুইদের সম্বন্ধে জেনারেল আইসেনহাওয়ার বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধকাহিনী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। উত্তরে জর্ম্মানী বলিয়াছিল যে, ফ্রান্সের দেশভক্তগণ আইন অনুযায়ী ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে, কাজেই তাহাদের একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধবাহিনী বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। শ্রীযুক্ত দেশাই বলেন, "আমার মনে হয় জেনারেল আইসেনহাওয়ারের অভিমতই ঠিক। যদি ম্যাকুইরা নিজ দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য যুদ্ধরত বাহিনী বলিয়া পরিগণিত হইয়া সমস্ত

সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করিতে পারে তবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্যরাও বা কেন পারিবে না ?

অতঃপর শ্রীযুত দেশাই পার্লিয়ামেণ্টে সহকারী ভারত সচিব মিঃ হেণ্ডারসনের একটি বিবৃতির উল্লেখ করেন। মিঃ হেন্ডারসন বলিয়াছেন, "রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ব্যতীত, আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সমস্ত সদস্য গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে কেবল মাত্র তাহাদেরই বিচারার্থ উপস্থিত করা হইবে।

কোন সরকারী বিবৃতির আশ্রয় আমি নিতে চাই না। কিন্তু এই বিবৃতিতে প্রকারান্তরে ইহাই স্বীকার করা হইয়াছে যুদ্ধ ঘোষণার অপরাধ গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।"

যদি আনুগত্যের প্রশ্ন সম্বন্ধে শ্রীযুত দেশাই বলেন সিঙ্গাপুর পতনকালীন সব চেয়ে বড় ঘটনা হইল এই যে ভারতীয়রা বৃটিশবাহিনী ও বৃটিশ অফিসারদের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। লেঃ কর্ণেল হাণ্ট ভারতীয়দের মেজর ফুজিয়ারার হাতে অর্পণ করেন। মেজর ফুজিয়ারার ভারতীয়দের বলেন যে যদি ভারতীয়রা দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে চায় তবে তাহারা তাহা করিতে পারে।

মোহন সিং ঘোষণা করেন যে ভারতের স্বাধীনতার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হইবে ওখানকার সমস্ত ভারতবাসী তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করে।

ক্যাপ্টেন আর্শেদ বলেন, একমাত্র আমাদের দেশের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নই আমাদের সম্মুখে ছিল।

জন আমেরির সাম্প্রতিক বিচারের উল্লেখ করিয়া শ্রীযুত দেশাই বলেন যে, ইংলণ্ডে দেশ ও রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া গণ্য হয়। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় এ প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে আনুগত্যের সীমানা কতখানি, দেশ হইতে যদি রাজাকে পৃথক করিয়া ধরা হয় তবেই সমস্যা কঠিন হইয়া উঠে।

দেশ এবং রাজা যদি একই দেশ সম্পর্কে হয় তাহা হইলে দেশ ও রাজার বিরুদ্ধে যাওয়া মানেই বিশ্বাসঘাতকতা। কিন্তু যখন যাহারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছে এবং সাময়িকভাবে তাহাদের উপর বিদেশী রাজার প্রতি আনুগত্য স্বীকারের কর্ত্তব্যভার চাপান হইয়াছে, তখনই প্রশ্ন উঠে।

মানুষের অধিকার সম্পর্কে বর্ত্তমান পৃথিবী যে কতখানি অগ্রসর হইয়াছে, পরে আমি এই বিষয়ে কতকগুলি অনুচ্ছেদের উল্লেখ করিব। যখন আপনি নামে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছেন, আনুগত্যের প্রশ্ন সেখানে উঠে কি? দেশের জন্য আপনি সংগ্রাম করিতেছেন, তখন অন্য কাহারও প্রতি আনুগত্যের প্রশ্ন আপনার সংগ্রামের পথে বাধা সৃষ্টি করিবে কি? বৃটেন কর্ত্তৃক যাহাদের আত্মসমর্পণ করিতে বলা হইল, অবস্থার চাপে পড়িয়া দেশ না রাজার প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নের সম্মুখীন তাহাদের হইতে হইয়াছিল।"

"বলা হইয়াছে যে আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানীদের হাতের পুত্তলী ছিল। এখন ইহাই বিচার্য্য বিষয় হইতেছে যে, আজাদ-হিন্দ-ফৌজ একটি পূর্ণাঙ্গ ভাবে গঠিত বাহিনী ছিল কি না। সরকার পক্ষ হইতে বারবার বলা হইয়াছে যে, জাপানী বাহিনীর তুলনায় আজাদ-হিন্দ-ফৌজ অত্যন্ত ছোট ছিল। ছোট হউক বড় হউক, একথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আজাদ-হিন্দ-ফৌজ জাপানের মিত্রবাহিনী হিসাবেই সংগ্রাম করিয়াছিল। ইহা এমন কোন অসঙ্গত ছিল না—কেন না উভয় বাহিনীই ভারতকে বৃটিশের কবল হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিল। মিত্রপক্ষ ফ্রান্স, বেলজিয়াম বা অন্য অন্য দেশে যে ভাবে পাশাপাশি যুদ্ধ করিয়াছে, আজাদ-হিন্দ-ফৌজ এবং জাপানী বাহিনীও তেমনি পাশাপাশি একই উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করিয়াছে। যদি একই সেনানায়কের অধিনায়কত্বে দুইটি বাহিনী যুদ্ধ করিতে পারে, তখন কোন্ বাহিনী কোন্ দেশের সে প্রশ্ন সেখানে উঠে না। বৃটিশ ও আমেরিকান বাহিনী যখন

জেনারেল আইসেনহাওয়ারের অধিনায়কত্বে সংগ্রাম করে, তখন বৃটিশ বাহিনীকে আমেরিকা বাহিনীর পুত্তলিকা বলা চলে না। শ্রীযুত দেশাই বলেন, সরকার পক্ষ লেঃ নাগকে দিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে আজাদ-হিন্দ-ফৌজ একটি সুগঠিত বাহিনী ছিল এবং এই বাহিনী যুদ্ধ করিয়াছে।

"আসামীদের পক্ষ হইতে আমিও ঠিক এই কথাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলাম। হয়ত সরকার পক্ষ তখন ইহা বুঝিতে পারেন নাই। লেঃ নাগ বলিয়াছেন জাপানীরা এবং আজাদ-হিন্দ-ফৌজ দুইটি মিত্র শক্তি হিসাবেই সংগ্রাম করিয়াছে। এই মৈত্রী ন্যায় কি অন্যায় সেই প্রশ্ন অবান্তর। একমাত্র বিচার্য্য প্রশ্ন এই যে, আজাদ-হিন্দ-ফৌজ একটি পূর্ণাঙ্গ গঠিত বাহিনী হিসাবে যুদ্ধ করিয়াছে কি না। যদি এই কথা বলা হয় যে ভারতের স্বাধীনতা লাভ ছাড়া আজাদ-হিন্দ-ফৌজের অন্য উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইলে তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সরকারী সাক্ষীগণ বলিয়াছেন যে, আজাদ-হিন্দ-ফৌজের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা লাভ। যাহাদের পক্ষ আমি সমর্থন করিতেছি তাহাদের এবং আমি যে দলভুক্ত তাহার সম্মান রক্ষার্থ আমি বলিতেছি যে সরকার পক্ষ যাহাই বলুক না কেন, তাহারা জাপানীদের হাতের পুতুল ছিল না।"

শ্রীযুক্ত দেশাই ১৭৭৬ সালের আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণাপত্র পাঠ করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান আসিলে রাজানুগত্য জনসাধারণের নিকট শ্রেয়স্কর বিবেচনা হইতে পারে না। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ও ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীও অনুরূপ ঘোষণাই করিয়াছেন। তিনি ১৭৯৭ সালের প্রাচীন ইংরাজী নজীরের উদাহরণও দেন যে, যে সকল জাতি যখন অধীন এবং দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হয় সম্ভবতঃ তখনই দুর্ব্বল জাতি স্বাধীনতা লাভ করে। যাহারা জাতীয় বাহিনী গঠন করিয়াছিল

তাহারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিত যে তাহারা ভারতকে স্বাধীন করিতে পারিবে। এইদল এই দ্বিতীয় জাতীয় বাহিনী জাপানীদের ক্রীড়া পুত্তলি ছিল না, জাপানীদের মিত্রশক্তি বলিয়া তাহারা মনে করিত। ইহা ছাড়া এই বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের দ্বারাই পরিচালিত হইয়া ছিল। তাহারা কাহাকেও সামরিক কার্য্যে বাধ্য করে নাই। অস্ত্র-শস্ত্রের স্বল্পতা নিবন্ধন তাহাদের হাতে বহু স্বেচ্ছাসেবক মজুত ছিল।

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণাপত্র পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত দেশাই বলেন যে, এইখানেই আপনারা রাজানুগত্য ও দেশানুগত্য সম্পর্কে যে বিতর্ক উঠিয়াছে তাহার মীমাংসা সম্পর্কে ঐতিহাসিক নজির পাইবেন; যশোলিপ্সু ব্যক্তিগণ আরোপিত রাজানুগত্যের পরিবর্ত্তে দেশানুগত্যই বাছিয়া লইবে। যে দেশ গত যুদ্ধে রক্ষা করিয়াছে এবং সভ্যতা বিকাশে বহু কিছু করিয়াছে তাহাদের নিকট উদাহরণ যদি ইহাদের বেলায় না খাটে তাহা হইলে আমি বিনীত ভাবে বলিতেছি যে ন্যায় বিচার সম্পূর্ণরূপেই অস্বীকার করা হইবে।

'ন্যায়ত ফেরার পার্কের এবং ভারতের ঘটনাবলী সমস্তই বৈধ ছিল। ইতিহাসের ধারাই এই সমস্ত ঘটনাবলীকে বৈধ করিয়া দিয়াছিল; কারণ ১৭৭৬ সালে আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণ যাহা করিয়াছিল, ভারতীয় জাতীয় বাহিনী সদস্যগণও তাহাই করিয়াছিল। বর্ত্তমান বিচারের সহিত আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সাদৃশ্য আছে বলিয়াই অদ্য আপনাদের ন্যায় বিচারের সমক্ষে আমি উহা উপস্থিত করিতেছি। সকল মানুষকেই সমানভাবে দেখিতে হইবে এবং সকলকেই জীবন, স্বাধীনতা ও সুখানুসন্ধিৎসা সম্পর্কে স্রষ্টার নিকট হইতে কতকগুলি সহজাত অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহাদিগকে উহা দিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর এইরূপ সাম্প্রাতিক ঘোষণাও আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষনারই অনুরূপ। শ্রীযুত দেশাই

সামরিক গভর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা পত্র বিচার করিয়াও দেখান যে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণা পত্রের উদ্দেশ্যও একই ধরণের।

ইহা আশা করা যায় যে বিশ্বাসঘাতকতার মূলনীতি সম্পর্কে সরকার পক্ষ কোনরূপ অভিযোগ উপস্থাপিত করিবেন না, কারণ অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 'বিশ্বাসঘাতকতা' শব্দটি শিথিল ভাবে প্রযুক্ত হয় না।

যুক্তির দিক হইতে দেখিলেও মানিতে হইবে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ জাপানীদের যুদ্ধবন্দী ছিল, উপরোক্ত ঘটনা না ঘটিলেও যুদ্ধবন্দীর যে বাধ্যবাধকতা আছে তাহারা তাহা ভঙ্গ করে নাই কারণ তাহারা জাপানীদের অর্থাৎ শত্রুপক্ষের যন্ত্র বা চর রূপে কোন কাজ করে নাই আমি ইহাই দেখাইতে চাই যে যুদ্ধবন্দীদের স্বকীয় মাতৃভূমি স্বাধীন করিবার জন্য স্বেচ্ছায় সংগ্রাম করিতে কোনরূপ বাধা নিষেধ নাই। আমি জাপানীদের ও ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সৈনিকদের ভারত সম্পর্কে যে সব প্রতিজ্ঞাপত্র আছে তৎসম্পর্কে আমি বিশেষভাবে অবিহিত হইতে বলি। নতুবা আদালত ভুল পথে চলিতে পারে।

আমি স্বীকার করি যে, আদালত বা কোনও সদস্য জাপানীদের বিশ্বাস করা সম্পর্কে আমাকে ভ্রান্ত আখ্যা দিতে পারেন কিন্তু সেইটিই বিষয় বিচার্য্য নহে। জাতীয় বাহিনী সম্পর্কে অনেক সরকারী সাক্ষীও বলিয়াছে যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাহারা সকলের সহিত এমন কি জাপানীদের সহিতও সংগ্রাম করা বাঞ্ছনীয় মনে করিত। তাহারা তাহাদের পন্থা ন্যায়ানুমোদিত বলিয়াই বিশ্বাস করিত।

জাতীয় বাহিনীর ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিয়া শ্রীযুক্ত দেশাই বলেন যে, সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা বুঝা গিয়াছে যে, জাপানীগণ যখন উপলব্ধি করেন যে মোহন সিংহের পরিচলিত জাতীয় বাহিনী জাপানীদের অঙ্গুলী সঙ্কেতে পরিচালিত হইবে না তখন তাহারা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া রাসবিহারী বাবুর

সাহায্যে তাহারা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। জাপানীগণ দ্বিতীয় ভারতীয় বাহিনীকেও প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিত না, কিন্তু অপর পক্ষে সমস্ত ভারতীয়গণ এই বাহিনীকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিলে তখন তাহাকে বাধ্য হইয়াই পছন্দ করিতেই হয়।

পরবর্ত্তী কথা এই—এই বাহিনী সম্পূর্ণরূপেই ভারতীয় ছিল, উচ্চতর কূটনৈতিক ক্ষেত্রে যদিও জাপানীদের হাতে ছিল, তাহারা অভিজ্ঞ বলিয়াই এরূপ ব্যবস্থা ছিল ; তথাপি বাদীপক্ষই বলিয়াছে যে সকল অফিসারই ভারতীয় ছিল. সকলে ভারতীয়দের নিকট হইতেই আদেশ পাইত, জাপানীদের নিকট হইতে নহে।

সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে যে অভিযুক্তগণ মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিয়া জানাইত যে, যাহারা পদত্যাগ করিতে ইচ্ছুক তাহারা চলিয়া যাইতে পারে ; কিন্তু তাহাদের হাতে এত অধিক সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক মজুত ছিল যে তাহারা তদনুপাতে অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করিতে পারে নাই। এত স্বেচ্ছাসেবক মজুত থাকিতে বলপূর্ব্বক সৈন্যসংগ্রহের প্রশ্ন কিরূপে আসিতে পারে ? ব্যক্তিগত ভাবে তাহারা কাহারও উপর নির্য্যাতন বা উৎপীড়ন করিয়াছে বলিয়াও প্রমাণিত হয় নাই।

আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানের জন্য যুদ্ধবন্দীদের উপর যে সব অত্যাচারের অভিযোগ আনা হইয়াছে তৎসম্পর্কে শ্রীযুত দেশাই বলেন যে, সাক্ষ্য প্রমাণাদি হইতে সৈনিকদিগকে যোগদানের জন্য অত্যাচার করা সম্পর্কে কোন বিবরণই জানা যায় না। ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বিশেষ করিয়া অভিযুক্ত আসামীত্রয় এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। আসামী-ত্রয়ের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও নিপীড়নের যে সকল কথা সরকার পক্ষীয় সাক্ষী বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুত দেশাই বলেন যে, আসামী-ত্রয়ের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও নিপীড়নের কোন অভিযোগ আনা হয় নাই। তাহা ছাড়া এই অভিযোগের উল্টা সাক্ষ্য এবং বহু সাক্ষীও রহিয়াছে। অতঃপর শ্রীযুত দেশাই এ সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে, তৎসম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন যে.

সরকার পক্ষের সাক্ষী মহম্মদ নওয়াজ খান তাহার সাক্ষ্যে অভিযোগ করিয়াছে, শুষ্ক গোবর কুড়াইয়া তাহাতে সোডা মিশ্রিত করিয়া সার তৈয়ারী করিবার জন্য তাহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। শ্রীযুত দেশাই বলেন, এই প্রকার নির্য্যাতনের অভিযোগ সত্যিই হাস্যকর সুতরাং এই সমস্ত বাজে সাক্ষ্য বাতিল করিয়া দিবার জন্য শ্রীযুত দেশাই আদালতের নিকট আবেদন জানান।

অতঃপর শ্রীযুত দেশাই বলেন যে, সরকারপক্ষ হত্যা এবং হত্যার অভিযোগ-প্রমাণ করিতে অসমর্থ হইয়াছে। এই সমস্ত অভিযোগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। চারজন ব্যক্তিকে গুলী করিয়া হত্যার অভিযোগ এবং মহম্মদ হোসেনকে গুলী করিয়া হত্যা। চার ব্যক্তিকে গুলী করিয়া দণ্ডাদেশ সম্পর্কে অপরাধ ও অভিযোগের এক তালিকা আছে। কিন্তু মহম্মদ হোসেন সম্পর্কে তেমন কিছু নাই। কিন্তু এই সব দণ্ডাদেশ কার্য্যে পরিণত হইয়াছে কিনা এই সম্বন্ধে কোন প্রকৃত দলিল নাই। এমন কি উভয় ব্যাপারের হতাহতের সংখ্যা সম্পর্কে কোন সংবাদও পাওয়া যায় না। মহম্মদ হোসেনের হত্যার চেষ্টা সম্পর্কে সরকারী পক্ষের সাক্ষী বলিয়াছে যে, সে ক্যাপ্টেন শা-নওয়াজকে অপরাধপত্রের উপরে কিছু লিখিতে দেখিয়াছিল কিন্তু জেরা করিবার সময়ে সে স্বীকার করে যে অপরাধ বলিয়া কোন শব্দই সে জানে না। তবে তেমন কিছু একটি লিখিত বিষয় সে দেখিয়াছিল। সিপাহী আগিরী রাম তাহার সাক্ষ্যে বলিয়াছে যে, জন সহকর্ম্মীর সহিত মহম্মদ হোসেনকে গুলী করিবার পূর্ব্বে সে কোন দিন কোন প্রকার অস্ত্র ব্যবহার করে নাই। উক্ত তিন জনের গুলীই মহম্মদ হোসেনের বুকে বিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ইহা কি সত্যই আশ্চর্য্য নয় যে, একটি অশিক্ষিত বন্দুকধারী প্রথমেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিয়াছিল। আমার মনে হয় আদালতই এই সাক্ষীর সত্যতা বিচার করিবেন। আমি শুধু এই বলিব যে, এই সাক্ষীটির বিশেষ মনোভাব ব্যতীত ইহার সমস্ত সাক্ষ্যই একটি মুর্খামী।

শ্রীযুক্ত দেশাই অতঃপর বলেন—ল্যান্সনায়ক সর্দ্দার মহম্মদ তাহার

সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, তিনি মহম্মদ হোসেনের কোন রক্ত দেখিতে পান নাই। ইহা অতি আশ্চর্য্য যে, তিন ব্যক্তির তিনটি গুলী মহম্মদ হোসেনের বুকে একই স্থানে বিদ্ধ হইয়াছিল অথচ সে স্থান হইতে বিন্দুমাত্রও রক্তপাত হয় নাই। সরকার পক্ষের সাক্ষীদের এইরূপ গাঁজাখুরী গল্প হইতেই মহম্মদ হোসেনের হত্যার সত্যতা সম্পর্কিত সকল বিষয় বাহির হইয়া পড়ে। কাজেই মহম্মদ হোসেনের হত্যা সম্পর্কে কোন প্রমানই নাই। যে ব্যক্তিকে গুলী করিয়া হত্যা সম্পর্কে অভিযোগ করা হইয়াছে সেই ব্যক্তি যে কাহারা সে সম্পর্কে কোন সাক্ষীই সুপষ্টভাবে কিছু বলিতে পারে নাই। লেঃ ধীলন উক্ত চারি ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া সরকার পক্ষের সাক্ষ্যে বলা হইয়াছে। কিন্তু যে তারিখে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হইয়াছিল বলা হইয়াছে সেই তারিখে লেঃ ধীলন ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং চারি ব্যক্তির হত্যা লইয়া গল্পটি রচিত হইয়াছে সেই সম্পর্কে আমি সন্দিহান। ঐ চারি ব্যক্তিকে গুলী করিয়া হত্যা করা সম্পর্কে লেঃ ধীলন আদেশ দিয়াছিলেন কিনা সেই সম্পর্কেও আমি সন্দিহান।

যে অবস্থায় উক্ত চার ব্যক্তির প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হইয়াছিল বলা হইয়াছে সেই অবস্থায় কোন জুরীই আসামীদিগকে দণ্ডিত করিতে সাহস করিবেন না।

শ্রীযুক্ত দেশাই সামরিক আদালতের বিচারপতিদিগকে সম্বোধন করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় বলেন, আপনারা এই আদালতের বিচারক তাহা আমি অস্বীকার করিব না। কিন্তু আদালতের বিচারক হওয়ার পূর্ব্বে আপনারা অনুগ্রহ করিয়া সমস্ত ব্যাপার ও পটভূমিকার সম্পর্কে বিচার করুন।

আমি আবার বলিতেছি লেঃ ধীলন হত্যার সময়ে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ লেঃ ধীলনের পক্ষে তাহা অসম্ভব ছিল। সরকার পক্ষের সমস্ত সাক্ষীই বলিয়াছে উপরোক্ত দণ্ডিত

চার ব্যক্তি সম্ভবতঃ জাঠ ছিঁল। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত উক্ত চারি ব্যক্তিকে গুলী করিয়া হত্যা করা সম্পর্কে তাহাদের অপরাধপত্রে কোন লিখিত বিষয় পাওয়া না যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত আদালত উক্ত অপরাধকে গণ্য করিতে পারিবেন না। মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত চারি ব্যক্তিকেই গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল কিনা সেই সম্পর্কে আদালতে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এখানে একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—ধরা যাক যে, একজন হিন্দুকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া "ক" কে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। একজন হিন্দুকে হয়ত কেহ হত্যা করিতে পারে কিন্তু সে অপরাধে ত আপনি "ক" এর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করিতে পারিলেন না। সুতরাং এখানে একজন হিন্দুকে হত্যা করার অভিযোগে "ক" কে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে না। এখানেও সেইরূপ অবস্থারই উদ্ভব হইয়াছে। যে চারিজন ব্যক্তিকে হত্যা করা সম্পর্কে অভিযোগ করা হইয়াছে সেই চারিজন ব্যক্তিকে লেঃ ধীলন হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া আনিত অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই।

সরকার পক্ষের সাক্ষী আদালতে সাক্ষ্যপ্রদান কালে ইহা বলিয়াছে যে, মহম্মদ হোসেনকে গুলী-বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিবার সময় আয়া সিং এবং খাজিম শা' নামক অপর দুই ব্যক্তিও উক্ত ঘটনাস্থলে ছিল এবং সাক্ষী আদালতের নিকট ইহাও বলিয়াছে যে, ঐ দুইজন ব্যক্তি এখনও জীবিত আছে। কিন্তু আদালতের সম্মুখে ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে কাহাকেও উপস্থিত করা হয় নাই।

চারিজন ব্যক্তিকে গুলী করিয়া হত্যা সম্পর্কে আসামীদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে মিঃ দেশাই বলেন যে, বাস্তবিক পক্ষে ঐ দণ্ডাদেশ কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। এই সম্পর্কে তিনি আরও বলেন যে, উক্ত মৃত্যুদণ্ডাদেশের অনুরূপ আরও দণ্ডাদেশ সম্পর্কে আদালতের নিকট নজীর আছে, কিন্তু ইহা বলা যায় যে কোনও ক্ষেত্রেই মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। উপরন্তু হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করা সম্পর্কে

উপযুক্ত প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে হইবে। নরহত্যা সম্পর্কে সরকার পক্ষ কর্ত্তৃক যে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে আদালত যদি সন্দিহান হন তাহা হইলে ইহা বলা যায় যে বর্ত্তমান মামলার আসামীগণও সেই অপরাধ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশে নির্দ্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

ক্যাপ্টেন সেহগল যুদ্ধবন্দীরূপে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন এবং কর্ণেল কিটসন সেই চুক্তি মানিয়া লইয়াছিলেন। উক্ত চুক্তি অনুসারে ক্যাপ্টেন সেহগলকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে গণ্য করা উচিত এবং তাঁহাকে এখন মুক্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য।

রেঙ্গুন পুনরধিকৃত হইবার পূর্ব্বে সেখানে কি ঘটিয়াছিল তৎসম্পর্কে আসামী পক্ষের শেষ সাক্ষী ক্যাপ্টেন আর্শেদ আলী আদালতে চারিটি দলিলপত্র উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং ঐ দলিলপত্র হইতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে রেঙ্গুনস্থ তৎকালীন বৃটিশ অফিসারগণ সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীরূপে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। উক্ত দলিলপত্র সমূহে ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে, বৃটিশ অফিসারগণ আজাদ-হিন্দ-ফৌজের অফিসারগণের উল্লেখ করিতেছেন। এই দলিল পত্র হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ সশস্ত্র সৈন্য বাহিনীরূপে সংগঠিত হইয়াছিল।

মিঃ দেশাই আদালতে আইন সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করিয়া বলেন যে, "সামরিক আদালত অসামরিক অপরাধ অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিচার করিতে পারে না। কিন্তু ফৌজদারী আইন বিধিতে ইহা বলা হইয়াছে যে ফৌজদারী অপরাধ সম্পর্কে ফৌজদারী আদালত বিচার করিতে পারিবেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন যে তাঁহার উক্তি দ্বারা তিনি ইহা বলিতে চাহেন না যে সামরিক আদালত ফৌজদারী অপরাধ সম্পর্কে বিচার করিতে পারেন। ফৌজদারী দণ্ডবিধি প্রসঙ্গে তিনি ইহাই বলিতে চাহেন যে যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে ফৌজদারী আদালত কাহাকেও অভিযুক্ত করিতে পারেন না এবং যদি

এই বিধি ফৌজদারী আদালত সম্পর্কে প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে ইহা বলা যায় যে এই সামরিক আদালত আসামীগণকে যুদ্ধ পরিচালনার অভিযোগে অভিযুক্ত করিতে পারেন না। ফৌজদারী আদালত স্থানীয় সরকার বা তদনুরূপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে বিচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ ইহা বলা যায় যে আসামীগণের বিরুদ্ধে গুলী করিয়া নরহত্যা সম্পর্কে যে অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে যদি তাহা সত্য বলিয়াও ধরিয়া লওয়া যায় তথাপি ইহা বলা যায় যে এই নরহত্যা কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

যদি আদালত তাঁহার অভিমত গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে ইহা বলা যায় যে, আসামীদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে যে অভিযোগ উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহা অবৈধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কারণ এই আদালতে ২৪ ধারা অনুসারে আসামীগণকে একত্রে অভিযুক্ত করা যাইতে পারে না। তাহাদের সম্পর্কে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এতৎসম্পর্কে মিঃ দেশাই প্রিভিকাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত এক পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে এই আদালত সংযুক্তভাবে আসামীগণকে বিচার করিতে পারিবেন না, কারণ আসামীগণকে একই অপরাধের জন্য সংযুক্তভাবে অভিযুক্ত করা হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে মহম্মদ হোসেনের হত্যা সম্পর্কে যে অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে তাহার সহিত লেঃ ধীলনের কোন সংশ্রব নাই। আদালত এখন আসামীগণকে পৃথকভাবে অভিযুক্ত করিতে পরিবেন না। কারণ এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর তিনি বলেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেন নাই। একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকারের আদেশক্রমে আমামীগণ যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ যুদ্ধের নিয়মানুসারে সুযোগ সুবিধা পাইবার অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইবেন। আসামীগণকে

রাজানুগত্য ভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত করা যাইতে পারে না। এই প্রশ্ন বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। সময় সময় এইরূপ দেখা যায় যে, উপনিবেশ সমূহ সম্রাটের আনুগত্য অস্বীকার করিতেছে। যুদ্ধকালে উপনিবেশ সমূহ নিজেদের স্বাধীনতার জন্য সম্রাটের আনুগত্য যে অস্বীকার করিতে পারে তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হইল বৃটেনের বর্ত্তমানের সর্ব্ববৃহৎ সুহৃদ যুক্তরাষ্ট্র।

মিঃ দেশাই বলেন যে ঘটনা পরম্পরায় ইহা জানা গিয়াছে যে, আজাদ-হিন্দ-ফৌজ একান্তভাবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীরূপে গঠিত হইয়াছিল। আজাদ-হিন্দ--ফৌজে বলপূর্ব্বক যোগদানের ব্যবস্থা সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহাও অপ্রাসঙ্গিক। কারণ অন্যান্য দেশে এখনও পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্য সংগ্রহ করা হয় এবং যাহারা সৈন্যদলে যোগদান করিতে চাহে না তাহাদের শাস্তি দেওয়া হয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজের আইনকানুন ভারতীয় সামরিক আইনের অনুরূপ ছিল। অবশ্য আজাদ হিন্দ ফৌজের আইনে বেত্রদণ্ড দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যদিও ভারতীয় সামরিক বিধিতে বেত্রদণ্ডের কোন উল্লেখ নাই, তথাপি ইহা বলা যায় যে, ভারতরক্ষা আইন অনুসারে বেত্রদণ্ড দান সম্পর্কে তিনটি অর্ডিনান্স পরবর্ত্তীকালে জারি করা হইয়াছে। বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজকে বর্ব্বর বাহিনীরূপে আখ্যাত করা যায় না।

শ্রীযুত দেশাই তাঁহার সওয়ালের উপসংহারে বলেন "জাতীয় ফৌজে বাধ্যতামূলকভাবে যোগদানের জন্য অত্যাচার অনুষ্ঠিত করা হইয়াছিল বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার সহিত বর্ত্তমান আসামীগণের কোন সংশ্রব নাই। আসামীরা এই অত্যাচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোন উৎসাহ প্রদান করেন নাই। এই জন্য আসামীগণকে অভিযুক্ত করা যায় না।"

স্যার নসিরওয়ানের সওয়াল

২২শে ডিসেম্বর লালকেল্লায় সামরিক আদালতে প্রথম আজাদ-হিন্দ ফৌজের বিচারে সরকার পক্ষের কৌঁসুলী স্যার নসিরওয়ান আসামী পক্ষের কৌঁসুলীর সওয়াল জবাবের উত্তর প্রদান করেন। এডভোকেট জেনারেল তাঁহার সওয়ালে বলেন যে, অভিযুক্ত ক্যাপ্টেন শাহনওয়াজ, ক্যাঃ সেহগল ও লেঃ ধীলনের অপরাধগুলি যে প্রমাণিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ। তিনি আরও বলেন যে, আসামীদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে তাহাতে দেশাত্মবোধই যে তাহাদের এই কার্য্যে প্ররোচিত করিয়াছে, ইহা তাহাদের আত্মপক্ষ সমর্থন করে না। তবে তাঁহাদের শাস্তিদান কালে ইহা বিবেচনা করা যাইতে পারে।

স্যার নসিরওয়ান প্রথমে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া বলেন, সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, সমস্ত আসামীই আজাদ-হিন্দ ফৌজের জন্য লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আজাদ-হিন্দ ফৌজ গঠনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সম্রাটের সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আজাদ-হিন্দ ফৌজকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন এবং আসামীরা নিজেরাও সম্রাটের সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সাক্ষ্যে ইহাও নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তিনজন আসামীই সিঙ্গাপুর পতনের অব্যবহিত পরেই শুধু আজাদ-হিন্দ ফৌজেই যোগদান করেন নাই, অধিকন্তু তাঁহারা বক্তৃতা দ্বারা অন্যান্য যুদ্ধ বন্দীদেরও সম্রাটের প্রতি আনুগত্য পরিহার করাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

স্যার নসিরওয়ান বলেন, "সমস্ত আসামীই রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, যেহেতু তাহারা স্বীকার করিয়াছেন, সেইজন্য ঐ সম্পর্কে সাক্ষ্য লইয়া বেশী আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

আসামী পক্ষ হইতে অত্যাচার করা সম্পর্কে সাক্ষ্যকে বাদ দিবার জন্য দরখাস্ত করা হইয়াছে। এ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন যে, ঐ দরখাস্তকে আমল দেওয়া উচিত নয়। তিনি বলেন যে, সরকার পক্ষ হইতে এই জন্য ঐ সমস্ত সাক্ষ্য উপস্থিত করা হইয়াছে যে সরকার পক্ষ দেখাইবেন কেমন করিয়া আসামীরা অন্যান্য যুদ্ধ বন্দীদের রাজানুগত্য পরিত্যাগ করিয়া রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আজাদ-হিন্দ ফৌজে যোগদান করাইতে চেষ্টা করিতেন এবং কি অবস্থায় সৈন্য সংগ্রহ করিতেন। স্যার নসিরওয়ান বলেন যে, আসামী পক্ষের সমস্ত বক্তব্য বিবেচনা করিয়া আদালতই অবশ্য স্থির করিবেন যে, (ক) যুদ্ধ বন্দীদিগকে আজাদ-হিন্দ-ফৌজে যোগদান করাইবার জন্য বাস্তবিকই কোন অত্যাচার করা হইত কি না। (খ) আসামীগণ এই অত্যাচার করিবার কথা অবগত ছিলেন কি না এবং জানিয়াও ভারতীয় যুদ্ধ বন্দীদের আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন কি না, এবং (গ) আজাদ-হিন্দ-ফৌজে যোগদান না করিলে তাঁহারা ভীতিদর্শন করিতেন কি না। বহু সাক্ষ্য দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতীয় বাহিনীর লোকজন, এমন কি অফিসাররা পর্য্যন্ত যদি আজাদ হিন্দ-ফৌজে যোগদান করিতে অস্বীকার করিতেন তবে তাহাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হইত। অতঃপর স্যার নসিরওয়ান সরকার পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য হইতে বহু অংশের উল্লেখ করেন। বহু ব্যক্তি যে আজাদ-হিন্দ ফৌজ ত্যাগ করিয়া যাইতেন ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুযোগ পাইলেই আজাদ-হিন্দ ফৌজের লোকজন, এমন কি অফিসাররা পর্য্যন্ত আজাদ-হিন্দ ফৌজ ত্যাগ করিয়া যাইতেন। স্যার নসিরওয়ান বলেন, এইরূপ দল ত্যাগ করা হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে, আজাদ-হিন্দ ফৌজের অধিকাংশই বাধ্য হইয়া ইহাতে যোগদান করিত। আরও বহু বিশ্বাস-যোগ্য সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বন্দী শিবিরের ভারপ্রাপ্ত আজাদ-হিন্দ ফৌজের লোকজন এবং অফিসাররা অমানুষিক অত্যাচার করিতেন।

শ্রীরাসবিহারী বসু কর্ত্তৃক প্রচারিত "আমাদের সংগ্রাম" নামক পুস্তিকায়ও এই অত্যাচার করিবার কথার উল্লেখ আছে। আদালতে এই দলিল দাখিল করা হইয়াছে। ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের অনুমোদনেই এই পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পূর্ব্ব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের প্রচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মিঃ আয়ার বলিয়াছেন যে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক ভাবেই আজাদ-হিন্দ-ফৌজ গঠিত হইয়াছিল। ঐ পুস্তিকা তাহাকে দেখান হইলে তিনি বলেন যে ভারতীয় বাহিনীর লোকজন এবং অফিসারদের আজাদ-হিন্দ-ফৌজে যোগদান করাইবার জন্য অত্যাচার করা হইত বলিয়া ঐ পুস্তিকার যে অংশে উল্লেখ আছে, তাহা তিনি পড়িয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না।

ক্যাপ্টেন আর্শেদ আলী তাহার সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে শ্রীরাসবিহারী বসু ও ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর ভিতর বন্ধুত্ব পূর্ণ ভাব ছিল না। ইহা হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, মোহন সিংহের বিরুদ্ধের অভিযোগগুলি সত্য নহে। মিঃ আয়ার বলিয়াছেন, তাঁহার যতদূর জানা আছে কোন ব্যক্তি পুস্তিকার লিখিত ঐ অত্যাচার করিবার অভিযোগের কোন প্রতিবাদ করে নাই। সাক্ষ্যে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে মোহন সিংহের বহু বন্ধু ও অনুবর্ত্তী ছিলেন। ইহা কল্পনা করা যায় না যে পুস্তিকায় লিখিত ঐ অভিযোগ যদি মিথ্যা হইত তাহা হইলে মোহন সিং-এর বন্ধুবর্গের মধ্যে কেহ উহার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতেন।

স্যার নসিরওয়ান বলেন যে, সরকার পক্ষ আসামীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিতেছেন না যে, তাঁহারা যুদ্ধবন্দীদের উপর অত্যাচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ভাবে লিপ্ত ছিলেন অথবা তাঁহারা সেই অত্যাচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে সহায়তা করিয়াছেন। পরন্তু সরকার পক্ষ এই অভিযোগ করিতে চাহেন যে, আসামীগণ যুদ্ধবন্দীদের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; যুদ্ধবন্দীদের ইহা বলা হইয়াছিল যে, তাহাদের আজাদ-হিন্দ-ফৌজে যোগদান করিতে হইবে অন্যথায় তাহাদের উপর

অত্যাচার চলিবে। অনুষ্ঠান সম্পর্কে আসামীগণ জ্ঞাত ছিলেন কি না তৎসম্পর্কেও বিবেচনা করিতে হইবে। আসামীগণ অত্যাচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছুই জ্ঞাত ছিলেন কি না তৎসম্পর্কে কিছুই অনুমান করা যায় না। কিন্তু এই বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। যদি আদালত এই সিদ্ধান্ত করেন যে বন্দীশিবিরে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই বিষয় সম্পর্কে আসামীগণ অজ্ঞাত ছিলেন না, তাহা হইলে আদালত এই সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে আসামীগণ অনুষ্ঠিত অত্যাচার সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত ছিল।

ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিবার জন্য আসামীগণ বন্দীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করিতেন। এই বিষয় সম্পর্কে আদালতে অস্বীকার করা হয় নাই।

এডভোকেট জেনারেল বলেন যে, এই বিচারের প্রসঙ্গে আন্তর্জ্জাতিক আইনের কোন প্রশ্ন উঠে না। এই আদালতে এই বিচার চলিতে পারে কিনা তৎসম্পর্কেও কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

বিচারের মূল উদ্দেশ্যই হইতেছে রাষ্ট্র ও প্রজার সম্পর্ক নির্দ্ধারণ। আসামীগণ ভারতীয় সেনা বিভাগে কমিশন প্রাপ্ত অফিসার ছিলেন। এই সেনা বিভাগ হইতে তাঁহাদের অপসারণ না করা পর্য্যন্ত তাঁহারা ভারতীয় সামরিক বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন। বস্তুতঃপক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণাদি দ্বারা ইহা বলা যায় যে,যে সকল অফিসার ও সৈন্য আজাদ-হিন্দ-ফৌজে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত সৈন্য দলে অবস্থান করিতে চাহেন নাই।

স্যার নসিরওয়ান বলেন, আসামী পক্ষের প্রধান বক্তব্য এই যে, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের প্রয়োগ ভারতীয়দের প্রতি একরূপ ও অভারতীয়দের প্রতি অন্যরূপ। তাঁহারা বলিতে চান যে, গ্রেটবৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইলে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় দোষ নাই। কিন্তু কথা হইতেছে যে, অস্থায়ী সরকার গঠনের ঘোষণাই দোষাবহ এবং এইরূপ ঘোষণার বশবর্ত্তী হইয়া কোনও

কাজ করিলে তাহার জন্য রেহাই নাই। কি জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা অপ্রাসঙ্গিক। উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন এই কাজটাই অপরাধজনক।

এডভোকেট জেনারেল, হালসবেরীতে "ইংলণ্ডের আইন" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, আন্তর্জ্জাতিক আইন ইংলণ্ডের আইনেরই একটি অংশ বিশেষ। তিনি বলেন, এই আদালত কখনও আন্তর্জ্জাতিক আদালত নহে। এক রাষ্ট্রের বিরোধ প্রভৃতি সম্পর্কে মীমাংসা করিবার জন্য এই আদালতের সৃষ্টি হয় নাই। কাজেই এখানে আন্তর্জ্জাতিক আইন প্রয়োগের কোন প্রশ্নই উঠে না, এমন কি এই ক্ষেত্রে আন্তর্জ্জাতিক আইনের প্রয়োগ করা হইলেও কোন রাষ্ট্র সমরে ব্যাপৃত তাহার শত্রুপক্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট বিদ্রোহী গণকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। ইহা ব্যতীত অন্য রাষ্ট্র কর্ত্তৃক বিদ্রোহীগণকে স্বীকার করা হইলেও বিদ্রোহীদের মূল রাষ্ট্রের তাহাতে কিছু আসে যায় না। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের এইরূপ আইনই প্রযোজ্য। স্যার নসিরওয়ান এই উপলক্ষে ওপেনহিমের আন্তর্জ্জাতিক আইনের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার যুক্তি সমর্থন করেন।

স্যার নসিরওয়ান বলেন, এই ক্ষেত্রে কোন বিদ্রোহী রাষ্ট্র ও গৃহযুদ্ধের কথা উঠে না। মূল রাষ্ট্র কখনও বিদ্রোহী যুদ্ধরত রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। বিদ্রোহীগণ কোন অধিকৃত স্থানে জাতীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করে নাই। স্বদেশের কোন অংশেই তাহাদের শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল না। আসামী পক্ষের সওয়ালে কর্ত্তৃপক্ষের নজীর সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া স্যার নসিরওয়ান বলেন যে, আসামী পক্ষের সওয়াল জবাবে বহুবার মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষের নজীর উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এখানকার আদালতের বিচার আমেরিকান আইন সংক্রান্ত অথবা আন্তর্জ্জাতিক আইন সম্বন্ধে আমেরিকান আদালতের সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিবে না। বাস্তবিক আমেরিকান আইন অপেক্ষা ইংলণ্ডের আইনের অনেক তফাৎ রহিয়াছে।

এই সময়ে তাঁহার যুক্তির সমর্থন করিয়া এ্যাডভোকেট জেনারেল অদালতের সাক্ষী কর্ণেল লোগনাধনের সাক্ষ্যর কয়েকটি কথা উল্লেখ করিলে আসামী পক্ষের কৌঁসুলী শ্রীযুক্ত দেশাইয়ের সহিত এ্যাডভোকট জেনারেলের কিছুক্ষণ বাদানুবাদ হয়।

বাদানুবাদ প্রসঙ্গে শ্রীযুত দেশাই বলেন যে, সাক্ষ্যে কেহই এমন কিছু বলেন নাই যে, আজাদ হিন্দ-ফৌজে যোগদান করিবার জন্য যুদ্ধ বন্দীদের উপর নানারকম নির্য্যাতন করা হইত।

অতঃপর স্যার নসিরওয়ান বলেন, যুদ্ধরত বন্দীদের সহিত অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক এখানে উঠিতে পারে না। সুতরাং আসামীপক্ষ হইতে পক্ষসমর্থন করিয়া যে দাবী উত্থাপিত হইয়াছে—শৃঙ্খলা ও শাসন ব্যবস্থা রক্ষাকারী আদালতে এই আপত্তি টিকিতে পারে না। স্যার নসিরওয়ান অতঃপর মিঃ লোগনাধন এবং মিঃ দীননাথের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, আজাদ হিন্দ সামরিক গভর্ণমেণ্টের নিজস্ব শাসনাধীন কোন ভূভাগ ছিল না। ধরা যাক ইহাকে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার বলা হইত। কিন্তু ইহা স্বাধীন ভারতের শাসনকার্য্য সম্বন্ধে কোনরূপ কার্য্যকলাপই পরিচালনা করিত না। এই গভর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপ মাত্র কাগজপত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাস্তবিক পক্ষে ইহা কোন গভর্ণমেণ্টেই ছিল না।

জাপান এবং তাহার মিত্রশক্তিবর্গ কর্তৃক এই সামরিক গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার সম্পর্কে স্যার নসিরওয়ান বলেন যে, যুদ্ধজয় এবং স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই জাপান এবং তাহার মিত্রশক্তিবর্গ এই গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া লইয়াছিল। জাপানই জার্ম্মাণীর সহিত ব্যবস্থা করিয়া শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে জার্ম্মাণী হইতে মালয়ে আনাইয়াছিল। জাপান পররাষ্ট্র বিভাগের কর্ম্মচারী মিঃ মাৎসুমতো তাঁহার সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, জাপান স্বাধীন ভারতের সামরিক গভর্ণমেণ্টকে এই সর্ত্তে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল যে, উহা জাপানের যুদ্ধপ্রচেষ্টায়

সাহায্য করিবে। এ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার নসিরওয়ান আরও বলেন যে, জাপান, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং আরও অন্যান্য স্থানের কোনটাই আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের নিকট সমর্পণ করে নাই। জাপানের এইরূপ করিবার কোন ক্ষমতাও ছিল না।

স্যার নসিরওয়ান তাঁহার এই যুক্তির সমর্থনে ওপেনহিমের আন্তর্জ্জাতিক পুস্তক হইতে নজীর উদ্ধৃত করেন। তিনি এই সময়ে ১৯৪৪ সালের ২১শে জুন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক কর্ণেল লোগনাধনকে লিখিত পত্রের কথা উল্লেখকরেন।

তিনি বলেন যে, ১৯৪৪ সালের জুলাই মাস হইতে জাপানীরা এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের ইউনিটগুলি পশ্চাদপসরণ করিতে আরম্ভ করে। এই সম্পর্কে ক্যাপ্টেন আর্শেদের সাক্ষ্য সমর্থন করিবার জন্য অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে।

কর্ণেল কীটসনের সাক্ষ্য লইয়া আসামীপক্ষ যে যুক্তি উথাপন করিয়াছেন সেই সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া স্যার নসিরওয়ান বলেন যে, ক্যাপ্টেন সেহগল যে কোম্পানী কমাণ্ডারের নিকট আত্মসমর্পন করিয়াছিল, সেই কোম্পানী কম্যাণ্ডার তাহার নিজের ইচ্ছামতই আত্মসমর্পণ সর্ত্ত গ্রহণ করিয়াছিল।

ক্যাপ্টেন সেহগল কর্ণেল কীটসনের নিকটই আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

কর্ণেল হাণ্ট কর্ত্তৃক ভারতীয় সৈন্যদলকে জাপ-হস্তে সমর্পন সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে ক্যাপ্টেন শাহনওয়াজ যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তৎসম্পর্কে স্যার নসিরওয়ান বলেন, জাপ কর্ত্তৃপক্ষের আদেশক্রমে কর্ণেল হাণ্ট অনুরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি ইহাও বলেন যে, যদি কর্ণেল হাণ্ট ভারতীয় সৈন্যদলকে কোন আদেশ দান না করিতেন তাহা হইলেও ভারতীয় সৈন্যদলকে জাপানীদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইত। ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের গো-মহিষাদি জন্তুর ন্যায় জাপানীদের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছিল বলিয়া আদালতে ক্যাপ্টেন শাহনওয়াজ যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নাই, কারণ বৃটিশ যুদ্ধবন্দীদের ও জাপানীদের হস্তে অনুরূপ ভাবে সমর্পণ করা হইয়াছিল।

স্যার নসীরওয়ান বলেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের বিবৃতি প্রসঙ্গে ইহা বলিয়াছেন যে, মালয়ে ও অন্যান্য স্থানে জাপানীগণ যেরূপ অত্যাচার করে যাহাতে ভারতে তদনুরূপ অত্যাচার ও লুণ্ঠনকার্য্য সংগঠিত না হয় তজ্জন্য তাঁহারা আজাদ-হিন্দ-ফৌজে যোগদান করিয়াছিলেন। আসামীগণের বক্তব্য হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, আসামিগণ ভারত অভিযান সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জাপানীদের সহায়তা প্রদান করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহারা জাপ-কর্ত্তৃপক্ষকে ইহাই বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের যেন সৈন্যদলের পুরোভাগে অধিষ্ঠিত করা হয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা যায় যে, যখন জাপসৈন্য মণিপুর ও কোহিমা হইতে হটিয়া যাইতে থাকে তখনও আসামীগণ বর্ম্মায় যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং জাপানীগণের ভারত অভিযান পরিচালনা সম্পর্কে আসামীগণ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিল। ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ এবং ক্যাপ্টেন সেহগলের ডায়েরী হইতে ইহা বুঝা যায় যে, তাঁহারা জাপানীদের ভারত অভিযান সম্পর্কে সাহায্য দান করিয়াছিলেন।

স্যার নসিরওয়ান দ্বৈত আনুগত্যের প্রশ্নের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বস্তুতঃ বৃটিশ সরকার জাপানীগণের হস্ত হইতে ভারতকে রক্ষা করিয়াছেন। এমতাবস্থায় বৃটেনের সামরিক দুর্য্যোগ সম্পর্কে বর্ত্তমানে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

স্যার নসিরওয়ান আরও বলেন যে, সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অর্থ হইতেছে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার অর্থ হইতেছে রাজানুগত্য অস্বীকার করা এবং রাজার বিরুদ্ধাচরণ করা।

স্যার নসিরওয়ান বলেন যে, আজাদ-হিন্দ সরকার সম্পর্কে অথবা সেই সরকার হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতা সম্পর্কে যাহাই বলা হউক না কেন তথাপি ইহা বলা যায় যে আসামীগণ রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন এবং শত্রুদলে যোগদান করিয়াছিলেন। আসামীগণ সম্পর্কে বর্ত্তমানে ইহা বলা যাইতেছে যে, আসামীগণ যুদ্ধবন্দী ছিল, সেই জন্য তাঁহাদের ক্ষেত্রে সৈন্যদল পরিত্যাগের

কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। এই সম্পর্কে বলা যায় যে, আসামীগণ কেবল মাত্র যে সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়াছিল তাহা নহে, পরন্তু তাঁহারা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

আসামীদের সম্পর্কে বলা যায় যে, কেবল মাত্র বেসামরিক প্রজা তাহা নহে, উপরন্তু তাঁহারা ভারতীয় সেনা বিভাগে কমিশন প্রাপ্ত অফিসার ছিলেন। যদি তাঁহারা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া থাকেন বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে বলা যায় যে তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন। ভারতীয় সেনাবিভাগ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন না।

স্যার নসিরওয়ান বলেন যে, সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াও ইহা জানা গিয়াছে যে, ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজের আদেশক্রমে মহম্মদ হোসেনকে হত্যা করা হইয়াছিল।

অতঃপর তিনি বলেন যে, চারিজন সিপাহীকে হত্যা করা সম্পর্কে ক্যাপ্টেন সেহগলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণ স্বরূপ দলিলাদি প্রদর্শন করা হইয়াছে। ক্যাপ্টেন সেহ্গলও তাঁহার বিবৃতি প্রসঙ্গে ইহা বলিয়াছেন যে, চারিজন সিপাহী সম্পর্কে তিনি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, অবশ্য তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, তাঁহার আজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। এই সম্পর্কে লেঃ ধীলনও বলিয়াছেন যে, প্রাণদণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। কিন্তু ক্যাপ্টেন সেহগল এবং লেঃ ধীলন সম্ভবতঃ এই বিচার সম্পর্কে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন। কারণ তাঁহারা ১৯শে মার্চ্চ, ১৯৪৫ সালের এক বিশেষ সামরিক আদেশ পত্রের কোন উল্লেখ করেন নাই। উক্ত আদেশ পত্রে ইহা বলা হইয়াছে যে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত চারিজন সিপাহী ১৯৪৫ সালের ৬ই মার্চ্চ তারিখে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইয়াছে এবং ঐ আদেশপত্রে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজের স্বাক্ষর ছিল। এই সময় মিঃ

ভুলাভাই দেশাই বলেন, আদেশ পত্রটিকে সাক্ষ্য প্রমাণরূপে ব্যবহার করা যাইবে না এই সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ দিতে হইবে।

সরকারীকৌঁসুলী—আদেশ পত্রটি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

মিঃ দেশাই—উহার মধ্যে যে স্বাক্ষর আছে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে, কিন্তু আদেশনামাটি সম্পর্কে কোন কিছু প্রমাণ উপস্থিত করা হয় নাই।

সরকারী কৌঁসুলী (উচ্চস্বরে)—আমি বলিতেছি যে উহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে আমি বাদানুবাদ করিতে চাই না।

সওয়ালের উপসংহারে এ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন যে, আসামীদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। আসামীগণ তাহাদের স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছে তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। আসামীগণকে শাস্তি প্রদান করিতে হইবে।

কর্ণেল কেরিণ

২৯শে ডিসেম্বর সামরিক আদালতে জজ এডভোকেট কর্ণেল কেরিণ বাদী ও প্রতিবাদী পক্ষের সওয়ালের মর্ম্ম আদালতের কাছে বিবৃত করেন।

কর্ণেল কেরীণ বলেন, "কিছুদিন যাবৎ আপনারা এমন একটি মামলা শুনিতেছেন, যাহা স্বভাবতঃই আপনাদের গভীর চিন্তার মধ্যে ফেলিয়াছে। আইন এবং ঘটনার দিক দিয়া এইরূপ জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ মামলা সামরিক আদালতে খুব বেশী আসে না। আপনাদের উপর এই বিরাট দায়িত্ব পড়িয়াছে এবং আপনাদের সম্মুখে গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত এই তিন ব্যক্তি দোষী কি নির্দ্দোষী, আপনাদের তাহা স্থির করিতে হইবে।

"একটি বিষয়ের উপর আমি বিশেষ জোর দিতে চাই। যে পদে আমাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, সেই পদের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এই মামলার সম্পর্কে আমার মনোভাব সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবে। আমার কর্ত্তব্য হইতেছে আইনগত প্রশ্ন

সম্পর্কে যতদূর সম্ভব সুস্পষ্ট ভাবে আপনাদিগকে আমার মতামত দেওয়া, কিন্তু ঘটনার প্রশ্ন সম্পর্কে যাহা কিছু স্থির করিবার তাহা আপনারাই করিবেন।

"সাক্ষ্য সম্বন্ধে আপনাদের এখন বিবেচনা করিতে হইবে এবং ইহা গ্রহণ বা নাচক করা সম্পর্কে যাহা যুক্তিযুক্ত মনে করেন তাহা করিবেন। এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই মামলা এবং এই ধরনের অন্যান্য মামলার দিকে সংবাদপত্রের ভিতর দিয়া এবং অন্যান্য নানা ভাবে সমগ্র দেশের লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। আপনারাও ইহা নিশ্চই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্ত বাহিরের এই সমস্ত বিবরণ বা মতামত অপেনাদের সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করিতে হইবে। আপনাদেব সম্মুখে উত্থাপিত সাক্ষ্য ও দলিলের উপর ভিত্তি করিযাই আপনাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

"গোড়াতেই সমগ্র বৃটিশ ও ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের মূল নীতির দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। সেই মূল নীতি হইতেছে এই যে, প্রত্যেকটি আসামীর অপরাধ প্রমাণ করিবার দায়িত্ব, আসামীদের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি অভিযোগ এবং তাহাদের সম্বন্ধে আরোপিত প্রত্যেকটি ঘটনা প্রমাণ করিবাব দায়িত্ব বাদী পক্ষের। সাক্ষ্য প্রমাণাদি দ্বারা বাদীপক্ষেরই আসামীদের অপরাধ সম্পর্কে আপনাদের সন্তুষ্ট করিতে হইবে।

"বড় বা ছোট যে কোন প্রশ্ন সম্পর্কে যখনই কোন সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইবে, তখনই আসামীদের অনুকূলে যায় এমন ভাবে তাহাদের সমাধান করিতে হইবে। অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে উপস্থিত সাক্ষ্যের সারমর্ম্ম প্রদান করিয়া কর্ণেল কেরীণ বলেন, "আসামী পক্ষ হইতে আন্তর্জ্জাতিক আইন উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি নির্দ্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

অস্থায়ী সরকার যথারীতি আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ইহার

প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষিত হইয়াছিল; এই সরকার নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত হইয়াছিল; চক্রশক্তি এই সরকারকে স্বীকার করিয়াছিল এবং এই স্বীকৃতির ফলেই প্রমাণিত হয় যে স্বাধীন ভারত সরকার রাষ্ট্রের মর্য্যাদা পাইয়াছিল; এই রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত একটি সৈন্যবাহিনী ছিল এবং ভারতীয় অফিসারদের কর্ত্তৃত্বাধীনে ইহা পরিচালিত হইত; ভারতের মুক্তিই আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধকালীন বাম্মা ও মালয়ের ভারতীয়দের রক্ষা করা; অন্যান্য রাষ্ট্রের মতই নবগঠিত ভারতীয় রাষ্ট্রের অধীকারভুক্ত অঞ্চলও ছিল এবং সর্ব্বশেষে বিরাট যুদ্ধ পরিচালনা করিবার মত সম্পদও এই রাষ্ট্রের ছিল।

উপরোল্লিখিত ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া আসামী পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, যে অবস্থায় অস্থায়ী সরকার গঠিত হইয়াছিল এবং পরিচালিত হইয়াছিল, সেই অবস্থায় দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিবার অধিকার তাহাদের ছিল এবং তাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল। যদি এই সরকারের যুদ্ধ করিবার অধিকার স্বীকৃত হয় এবং যে অধিকার প্রত্যেক জাতিরই আছে, তাহা হইলে আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুসারে দুইটি স্বাধীন দেশ বা দুইটি রাষ্ট্র পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষনা করিতে পারে এবং যাহারা এই যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছে; যুদ্ধ পরিচালনায় তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে, এক মাত্র যুদ্ধ অপরাধীরা ব্যতীত আর সবাই মিউনিসিপ্যাল আইনের অধিকার বহির্ভূত।

কর্ণেল কেরীণ বলেন, উভয় পক্ষ হইতে উত্থাপিত আন্তর্জ্জাতিক আইন আপনাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। উভয় পক্ষ হইতে উত্থাপিত ঘটনাবলী বিচার করিয়া আপনাদের দেখিতে হইবে আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুসারে কোনগুলি গ্রহণ যোগ্য এবং সেইগুলি আপনাদের গ্রহণ করিতে হইবে। আপনাদিগকে আমি আরও স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, বাদী, একটি রাষ্ট্র এবং উহার প্রজাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ঘরোয়া প্রশ্ন সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক

আইনের দিক হইতে বিশ্লেষণ করিবার কোন অধিকার বৃটীশ তথা বৃটিশ ভারতীয় আদালতের নাই।

আন্তর্জ্জাতিক আইনবিদগণের উত্থিত অভিমত হইতে ইহা দেখা যায় কোন কোন রাষ্ট্র এবং তাহার বিদ্রোহী প্রজাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ সম্পর্কিত কারণ বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। বিশ্বের সমগ্র জাতি কর্ত্তৃক এই সামরিক আইন স্বীকৃত হইয়াছে যে, যুদ্ধকালে যে কোন স্বাধীন রাজ্য বা সম্প্রদায়ের নিজ স্বার্থের জন্য যুদ্ধ করিবার অধিকার আছে। সংশ্লিষ্ট যুদ্ধরত দেশসকল নিজ সুবিধা ও স্বার্থের জন্য সাধারণ ভাবে সেই নীতির সুযোগ লইতে পারে।

"যুধ্যমান অবস্থা স্বীকার সম্বন্ধে আসামী পক্ষের কৌসুলী ও অন্যান্য রাজনীতিকগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা বৃটেনের নিরপেক্ষ অবস্থার সহিত প্রযোজ্য অর্থাৎ এমন দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ যাহার সহিত বৃটেন আদৌ জড়িত নহে, উক্ত সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।'

কর্ণেল কেরিন আরও বলেন যে, "ফেডারেল গভর্ণমেণ্টের সৈন্য ও কনফেডারেট ষ্টেটসমূহের সৈন্যের মধ্যে সংঘর্ষকে একটি বিচ্ছিন্ন উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে আপনারা ধরিয়া লইতে পারেন যে, অধীন রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইবার অধিকার আন্তর্জ্জাতিক আইনে স্বীকার করা হইয়াছে এবং এই যুদ্ধকালে বিদ্রোহীগণ সাফল্য লাভ অথবা পরাজিত হউক আন্তর্জ্জাতিক আইনের চক্ষে উক্ত সংগ্রাম একটি যুধ্যমান অবস্থায় আসিয়া পরিতে পারে ও যুদ্ধরত অবস্থায় সকল অধিকার লাভের অধিকারী বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বর্ত্তমান আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সরকার যুধ্যমান অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছিল কি না এবং আন্তর্জ্জাতিক আইনানুসারে যুদ্ধরত অবস্থার অধিকার পাইবার অধিকারী কিনা তাহা বিবেচনার ভার আপনাদের উপর রহিয়াছে।

"আপনাদের সম্মুখে যে সমস্যা রহিয়াছে সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করিবার সময় আন্তর্জ্জাতিক আইনের বিধানসমূহের বিবেচনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সামরিক আইনে অভিযুক্ত ভারতীয় বাহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত ভারতীয় অফিসারের বিচার সম্বন্ধে আপনাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ ভারতীয় সামরিক আইন ও বৃটীশ ভারতে প্রচলিত আইনানুসারে ন্যায় বিচার করাই আপনাদের প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য।"

"আসামী পক্ষ জোরের সহিত সওয়াল করিয়াছে যে এই সকল বিষয়ে ন্যায় বিচার করিবার জন্য ইংলণ্ডের আদালতসমূহ আন্তর্জ্জাতিক আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য। আসামী পক্ষের মূল বক্তব্য হইতেছে যে হয় এই আন্তর্জ্জাতিক আইনসমূহ সকল রাষ্ট্রের অনুমোদন লাভ করিয়াছে, না হয় অন্ততঃ পক্ষে এই দেশে স্বীকৃত হইয়াছে ও এদেশের আইনের অঙ্গীভূত হইয়াছে। এক্ষেত্রেও ন্যায় বিচারের জন্য এই আদালতকে আন্তর্জ্জাতিক আইনের বিধানগুলি বিবেচিত করিতে হইবে। ইংলণ্ড অথবা ভারতের আদালতসমূহ উক্ত আন্তর্জ্জাতিক আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য কি না তাহা আপনারাই বিচার করিয়া দেখিবেন। ফরিয়াদী পক্ষ অবশ্য বলিয়াছেন, বৃটেন ও পরাধীন জাতির মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক বিধান খাটিবে না কারণ বৃটেনের আইন ইহা অনুমোদন করেনা।

"আসামী পক্ষ বলিয়াছেন যে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯ ধারা অনুসারে আসামীগণের কার্য্য আইনানুমোদিত। আসামীপক্ষের মতে "আইনানুমোদিত" অর্থে আন্তর্জ্জাতিক আইনানুমোদিত। কিন্তু আসলে এক্ষেত্রে আইন বলিতে বৃটিশ ভারতে প্রচলিত আইনই বুঝিতে হইবে।"

"ফরিয়াদী পক্ষ বলিয়াছেন যে, কমিশনপ্রাপ্ত ভারতীয় অফিসার হিসাবে ও প্রজা হিসাবে আসামীগণ রাজার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতে বাধ্য। উক্ত আনুগত্য ভঙ্গ করিলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারা অনুসারে রাজার বিরুদ্ধে

যুদ্ধ ঘোষণার অপরাধ হয় এবং ইংলণ্ডের আইনানুসারে রাজদ্রোহ অপরাধে অপরাধী হয়। আসামীগণের পক্ষে ইহা মুক্তি সংগ্রাম হইলেও ফরিয়াদী পক্ষের মতে রাজানুগত্যের ভান করিয়া রাজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অপরাধ হইয়াছে এবং আসামীগণ বাস্তবিকই সংগ্রাম করিয়াছে।

আসামী পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া বৃটিশ কতৃপক্ষ ভারতীয় সৈন্যগণকে সিঙ্গাপুরে জাপানীদের হস্তে যুদ্ধবন্দী হিসাবে সমর্পণ করিলে অকস্মাৎ তাহারা ভারতের স্বাধীনতা লাভরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং কেবল তাহাই নহে জাপানীদের হাত হইতেও স্বদেশ রক্ষার সমস্যা তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই জন্য তাহারা অস্ত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। তাহাদের মতে উক্ত কার্য্য আন্তর্জ্জাতিক আইনসম্মত এবং ঐরূপ অবস্থায় রাজানুগত্য অস্বীকার করিবার অধিকার তাহাদের আছে। তাহাদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ অথবা রাজানুগত্য ভঙ্গ প্রভৃতি যে কোন অভিযোগই আনা হউক না কেন তাহারা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

এই সম্পর্কে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার নজীর উল্লেখ করা হয়। সেক্ষেত্রে আমেরিকার অধিবাসীরা স্বীয় দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য গ্রেট বৃটেনের রাজার প্রতি আনুগত্য বিসর্জন দিয়াছেন। এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যুক্তি দেখান হয় যে, অস্থায়ী ভারত সরকার আমেরিকার মতই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল এবং আসামী যখন সেই সরকারের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়াছে, সেই সময় হইতেই সে রাজার প্রতি তাহার আনুগত্যের পাশ হইতে মুক্ত হইয়াছে। আসামীর পক্ষ সমর্থনে আরও বলা হয় যে, একজন যুদ্ধবন্দী স্বকীয় দায়িত্বে দেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতে পারে নাই বলিয়া কোন প্রশ্ন উঠে না এবং এমতাবস্থায় আনুগত্য ভঙ্গের অপরাধে দোষী হওয়ার প্রশ্নও উঠিতে পারে না।

কিন্তু আসামী পক্ষ আন্তর্জ্জাতিক আইনের নজীর তুলিয়া যে দাবী করিতেছে

তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত নহে। বৃটিশ ভারতে এমন কোন আইন নাই যাহাতে রাজদ্রোহ অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় নাই। অপর পক্ষে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ জনিত সমস্ত আইনই বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধই মুল অপরাধ এবং রাজানুগত্য ভঙ্গজনিত অপরাধকেই রাজদ্রোহ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

মিঃ কর্ণেল কেরিন বলেন,—"রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা সম্পর্কে আসামী-ত্রয়ের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহার মর্ম্মার্থ হইল—রাজানুগত্যের নিকট গভীর অপরাধ করা। ইহাকে কখনও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আসামীত্রয় শুধু রাজানুগত্যের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছিল। আপনারা ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কর্ণেল কেরিন আরও বলেন, আন্তর্জ্জাতিক আইন এই আদালতে একেবারে বাতিল হইয়াই যাইবে এই বলিয়া এই আদালত গঠিত হয় নাই বলিয়া আমি মনে করি। তবে আপনারা হয়ত আমার বিবেচনার ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। কর্ণেল কেরিন বলেন যে তিনি আন্তর্জ্জাতিক আইনের পটভূমিকা ব্যতীত তিনি এখন আসামীত্রয়ের অভিযোগগুলি সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন। তিনি বলেন, আপনারা যদি উভয়পক্ষের যুক্তিতে আন্তর্জ্জাতিক আইনের ব্যাখ্যা শুনিয়া আসামীদের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন তাহা হইলে অবশ্য অন্যান্য বিষয়গুলি বিবেচনা না করিলেও পারেন।

অতঃপর জজ এডভোকেট কর্ণেল কেরিন সমস্ত অভিযোগের সারমর্ম্ম বিবৃত করেন। তিনি বলেন—আসামীত্রয়ের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ হইল যে তাহারা ভারতীয় সামরিক আইনের ৪১ ধারা অনুযায়ী তাঁহারা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। সামরিক আইনের এই ধারার সহিত ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ধারারও মিল রহিয়াছে। এখানে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সরকার পক্ষের

সাক্ষীদের সাক্ষ্য আপনারা কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আমার নিকট অজ্ঞাত। এই সরকারী সাক্ষীরাও আসামীত্রয়ের সহিত আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিল। এখানে আপনারা অপরাধীদের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সম্বন্ধেও চিন্তা করিবেন। এখানে অসমর্থিত অভিযোগ দ্বারা কোন লোককে দোষী সাব্যস্ত করিবার পূর্ব্বে আপনারা একবার বিবেচনা করিবেন।

মালয়ের ভারতীয় যুদ্ধবন্দী সৈনিকদের উপর দুর্ব্যবহার এবং জোর করিয়া তাহাদিগকে আজাদী ফৌজে যোগদান করাইবার অভিযোগ সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া কর্ণেল কেরিন বলেন—উভয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণাদিতে ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে অভিযুক্ত আসামীত্রয় কখনও যুদ্ধ বন্দীদের উপর দুর্ব্যবহার কার্য্যে লিপ্ত ছিল না। বাস্তবতার দিক হইতে একটি বিষয় এখানে বিবেচনা করিতে হইবে যে এই সমস্ত দুর্ব্যবহার সত্যই সংঘটিত হইয়াছে, না এইগুলি শুধু কল্পিত কাহিনী।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগঠন এবং কার্য্যকলাপ সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া জজ এডভোকেট কর্ণেল কেরিন বলেন—আসামীত্রয় যে আজাদ-হিন্দ ফৌজে যোগদান করিয়া উহার কার্যকলাপের অংশ গ্রহণ করিয়াছিল সে সম্পর্কে আসামীপক্ষ হইতে অস্বীকার করা হয় নাই। অভিযুক্ত আসামীত্রয় প্রত্যেকেই এই কথার উপর জোর দিয়াছে যে আজাদ হিন্দ ফৌজ একটি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাবাহিনী ছিল এবং তাঁহারা অতি উচ্চ আদর্শ স্বদেশ প্রেমিক, তাহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়াই এই ফৌজে যোগদান করিয়াছে। অবশ্য এখানে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়া সম্পর্কে আইনের কোন সংযোগ নাই। তবুও অভিযুক্তরা যাহা করিয়াছেন সে সম্বন্ধে আপনারা বিচার করিবেন এবং তৎকালীন সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

লেঃ ধীলনের বিরুদ্ধে চারি ব্যক্তিকে হত্যা করা সম্পর্কে যে অভিযোগ উত্থাপন

করা হইয়াছে, সে সম্পর্কে জজ এডভোকেট কর্ণেল কেরিন বলেন—উক্ত চারি ব্যক্তিকে লেঃ ধীলনের আদেশে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। এখানে রাজসাক্ষী উত্তান সিংহ ও হাফিজের সাক্ষ্য যদি আদালত জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে মনে হয় যে লেঃ ধীলনই উক্ত চারি ব্যক্তির হত্যার জন্য দায়ী। হরি সিংহ, তুলিচাঁদ, দারায়ো সিংহ ও ধর্ম্ম সিংহকে উক্ত চারি ব্যক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই চারি ব্যক্তির হত্যা সম্পর্কে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং উক্ত চারি ব্যক্তিকেই হত্যা করা হইয়াছিল কিনা সেই সম্পর্কে আপনাদিগকে যথাযথ ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। এই সম্পর্কে প্রথম কথা হইল যে উপরোক্ত দুই জন রাজসাক্ষীই উক্ত চারি ব্যক্তিকে সনাক্ত করিতে পারে নাই। কিন্তু এই সম্পর্কে দুইটি অপরাধ-পত্র রহিয়াছে। রাজসাক্ষী দুইজন পরস্পর বিরোধী সাক্ষ্য দিয়াছে। যদি আদালত এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন যে উপরোক্ত চারি ব্যক্তিকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল তাহা হইলে কি অবস্থায় তাহাদের হত্যা করা হইয়াছিল তাহা অবশ্যই বিবেচনা করিবেন। আদালতকে তখন উক্ত চারি ব্যক্তির হত্যা সম্পর্কে সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করিতে হইবে।

কিন্তু লেঃ ধীলন তাহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, উক্ত চারি ব্যক্তিকে সত্যই প্রাণদণ্ডাদেশ দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু সেই দণ্ডাদেশ কার্য্যে পরিণত হইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আদালত যদি মনে করেন যে চার্জ্জসিটে উল্লিখিত চারি ব্যক্তি এবং যাহাদের গুলী করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে উহারা অভিন্ন, কিন্তু সাক্ষ্যে মৃত্যুর কথা সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হয় নাই—তাহা হইলে আদালত বিচার করিয়া দেখিতে পারেন, যে কোন বিষয়ের অভিযোগ বা সমস্ত অভিযোগে হত্যা করার চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সাব্যস্ত করা যুক্তিযুক্ত হইবে কি না।

ক্যাপ্টেন সেহগলের বিরুদ্ধে হত্যা করিবার চেষ্টা করার যে চারিটি অভিযোগ আনা হইয়াছে ঐ গুলি হইতেছে হরি সিং, দুলিচাঁদ, দারায়ো সিং এবং ধরম সিং প্রভৃতি চারিজন সিপাহিকে হত্যা করিবার চেষ্টা সম্পর্কে। এই চারিটি অভিযোগ সম্পর্কে আদালতের সিদ্ধান্ত লেঃ ধীলনের বিরুদ্ধে হত্যা করিবার অভিযোগ সম্বন্ধে গৃহীত সাক্ষ্য বিষয় আদালত কি সিদ্ধান্ত করেন তাহার উপর অনেকখানি নির্ভর করিবে।

সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিয়া জজ এডভোকেট বলেন এই সমস্ত অভিযোগের সহিত ক্যাপ্টেন সেহগলের যোগাযোগের শুধু অপরাধ তালিকার মারফৎই পাওয়া যায়, ইহা ব্যতীত তাহার বিরুদ্ধে আর কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। যদি এই তালিকায় লিখিত বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে আপনারা সন্দেহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে না।"

ক্যাপ্টেন সেহগল বলিয়াছেন যে, সিপাহী চারিজনকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ আইন অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডাদেশে দণ্ডিত করা হয়, কিন্তু এই দণ্ডাদেশ কার্য্যে পরিণত করা হয় না। ঐ সময় একই দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত অন্যান্য আসামীদের ক্ষমা প্রার্থনা করার এবং ভবিষ্যতে এইরূপ করিবেনা প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় এই দণ্ড হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

এই দণ্ডাদেশ বস্তুতঃ পক্ষে কার্য্য পরিণত করা হয় নাই ইহা ধরিয়া লইলেও, আপনারা কি মনে করেন যে অপরাধ তালিকায় উল্লিখিত বিবরণ সহযোগে সেহগলের স্বীকারোক্তিকে গ্রহণ করিলে ঐ চারি ব্যক্তিকে হত্যা করিতে ধীলনকে প্ররোচিত করা হইয়াছে?" কর্ণেল কেরিণ বলেন, "আদালত যদি এই সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলে কোন বিশেষ অভিযোগ সাব্যস্ত করা আপনাদের পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে। হত্যাকার্য্যে সহায়তা সম্পর্কে কাপ্টেন শাহ নওয়াজের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিষয়ে জজ এডভোকেট বলেন যে সংগৃহীত ঘটনা-

বলী হইতে দেখা যায় যে ১৯৪৫ সালের ২৯শে মার্চ্চ বা ঐরকম সময়ে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ, খাজিন শা ও আয়া সিং কর্ত্তৃক মহম্মদ হোসেন নামক একব্যক্তিকে হত্যাকার্য্যে সহায়তা করিয়াছিল।

ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ খান তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "প্রকৃতপক্ষে আমি কোন মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেই নাই অথবা তাহাকে গুলী করিয়াও হত্যা করা হয় নাই। মিঃ মহম্মদ হোসেন এবং তাহার সঙ্গীদিগকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। আমি মহম্মদ হোসেনকে তীব্র ভর্ৎসনা করি এবং বলি যে, সে এমন একটা অপরাধ করিয়াছে তাহার জন্য তাহাকে গুলী করা উচিত। সাক্ষ্যের সারমর্ম্ম বিবৃতি করিয়া কর্ণেল কেরিন বলেন, "যদি মৃত্যুর প্রমাণ সম্বন্ধে আপনারা সন্তুষ্ট না হইয়া থাকেন, তবে দণ্ডবিধি আইনের ১০৯ ধারা অনুসারে আপনারা আসামীকে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারেন না। কেননা ঐ ধারার নির্দ্দেশ আছে যে, যে অপরাধে সহায়তা করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে, উহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে।

অবশ্য আপনারা যদি এই বিষয়ে সন্তুষ্ট হন যে মহম্মদ হোসেনকে হত্যা করিতে খাজিন শা ও আয়া সিংকে শাহ নওয়াজ সাহায্য করিয়াছিলেন এবং আপনারা যদি মনে করেন যে এই ব্যক্তিই (শাহ নওয়াজ) সেই সাহায্যকারী বলিয়া নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। তাহা হইলে দণ্ডবিধি আইনের ১১৫ ধারা অনুযায়ী তাহাকে দোষী বলিয়া আপনারা বিশেষ অভিযোগে সাব্যস্ত করিতে পারেন।

প্রথম সামরিক আদালতের রায়।

৩রা জানুয়ারী ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ, ক্যাপ্টেন সেহগল ও লেঃ ধীলনের সামরিক আদালতে বিচারের রায় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সরকারী বিজ্ঞপ্তি বাহির হয়।

"ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ, ক্যাপ্টেন সেহগল ও লেঃ ধীলন সামরিক আদালতে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। লেঃ ধীলনের বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ এবং অপর দুইজনের বিরুদ্ধে নরহত্যার সহায়তার অভিযোগ আনা হয়। আদালত সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, তিনজনই সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অভিযোগে অপরাধী। পক্ষান্তরে ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ নরহত্যার সহায়তার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন। ক্যাপ্টেন সেহগলকে নরহত্যার সহায়তা এবং লেঃ ধীলনকে নরহত্যার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় আদালত আসামীদিগকে মৃত্যুদণ্ড কিম্বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিতে বাধ্য। আইন অনুযায়ী ইহা অপেক্ষা ন্যূনতর শাস্তি দেওয়া চলে না। আদালত আসামীদিগকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং তাহাদিগকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিবার এবং তাহাদের প্রাপ্য বেতন ও ভাতা বাজেয়াপ্ত করিবার হুকুমও প্রদান করেন। দণ্ড অনুমোদিত না হওয়া পর্য্যন্ত সামরিক আদালত কর্ত্তৃক প্রদত্ত দণ্ড বা রায় বহাল হয় না। এ ক্ষেত্রে দণ্ড অনুমোদনকারী অফিসার হইলেন জঙ্গীলাট। তিনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে আদালতের রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রমাণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে, এই হেতু তিনি আদালতের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়াছেন।

দণ্ড হ্রাস বা মুকুব করিবার ক্ষমতাও অনুমোদনকারী অফিসারের আছে। ইতিপূর্ব্বেই সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়া বলা হইয়াছে যে, সরকার ভবিষ্যতে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার এবং নৃশংস অত্যাচারমূলক কার্য্য করিবার অভিযোগে দোষী ব্যক্তিদিগকেই শুধু আদালতে বিচারার্থ উপস্থিত করিবেন এবং ইহাও বলা হইয়াছে, যে আদালত কর্ত্তৃক প্রদত্ত রায় পর্য্যালোচনা করিবার সময় উপযুক্ত

কর্তৃপক্ষ বিচার করিয়া দেখিবেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কার্য্যকলাপ সভ্য সমাজ প্রচলিত নিয়ম-কানুনের কতদূর পরিপন্থী হইয়াছে।

লেঃ ধীলন নরহত্যার অভিযোগ হইতে এবং ক্যাপ্টেন সেহগল নরহত্যার সহায়তা করার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। তাঁহারা অন্যান্য নৃশংস কার্য্যকলাপের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন নাই। যদিও ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ খানের বিরুদ্ধে নরহত্যার সহায়তা করিবার অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে, তথাপি দণ্ড অনুমোদনকারী অফিসার অপরাধ অনুষ্ঠানকালীন অবস্থা বিচার ও বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন।

এরূপ অবস্থায় জঙ্গীলাট দণ্ড প্রদানের ব্যাপারে তিনজন আসামীর প্রতিই একরূপ ব্যবহার করা হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং এই হেতু তিনি অফিসারত্রয়ের প্রতি প্রদত্ত যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ মকুব করিয়াছেন। কিন্তু যেহেতু রাজার প্রতি আনুগত্য বিসর্জন দেওয়া এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনা করা সর্বাবস্থায়ই যে কোন অফিসার বা সৈন্যের পক্ষে গুরুতর অপরাধ, সেই হেতু দণ্ড অনুমোদনকারী অফিসার তাঁহাদের প্রতি চাকরী হইতে বরখাস্তের এবং বকেয়া বেতন ও ভাতা বাজেয়াপ্ত করার দণ্ডাদেশ অনুমোদন করিয়াছেন। আইন মতে প্রতিষ্ঠিত যে কোন বর্তমান ও ভাবী গভর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব রক্ষার পক্ষে এই নীতি সমর্থন করা একান্ত প্রয়োজন।”

ক্যাপ্টেন বুরহানুদ্দিনের বিচার

প্রথম সামরিক আদালতের বিচারের পর আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সমস্ত বীর সৈনিকদের বিচার হইয়াছে সেই বিচারের বিবরণের মধ্যে বিশেষ নূতন তথ্য না থাকায় তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও প্রদত্ত শাস্তি সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

দ্বিতীয় মামলায় আসামী ছিলেন চিত্রলরাজের ভ্রাতা ক্যাপ্টেন বুরহানুদ্দিন। ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা, গুরুতর আঘাত এবং নরহত্যা। ১৯৪২ সালের ৩রা ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এই মামলার শুনানী চলে এবং বুরহানুদ্দিনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সামরিক আদালত নরহত্যার অভিযোগ হইতে তাঁহাকে রেহাই দেন প্রধান সেনাপতি এই দণ্ডাদেশ হ্রাস করিয়া তাঁহাকে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং চাকুরী হইতে বরখাস্ত করার এবং প্রাপ্য বেতন বাজেয়াপ্ত করার নির্দ্দেশ বহাল রাখেন।

বিচার আরম্ভ হইবার কয়েক মিনিট পরেই আদালতকে একটি আইনগত জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার এবং নরহত্যার অভিযোগ পঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আসামী পক্ষের প্রধান কৌসুলী শ্রীযুক্ত ভূলাভাই দেশাই এই মর্ম্মে একটি আপত্তি উত্থাপন করেন যে, এই আদালতের আসামীকে বিচার করিবার অধিকার নাই। কারণ আসামী চিত্রলের রাজার ভ্রাতা, কাজেই তিনি বৃটিশ ভারতের প্রজা নহেন। বৃটিশ ভারতের বাহিরে যে অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে তজ্জন্য বৃটিশ ভারতের কোন আদালতে তাঁহার বিচার চলিতে পারে না।

ক্যাঃ বুরহানুদ্দিনের বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে অভিযোগ করা হয় যে, ১৯৪২ সালের

সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪৫ সালের মে মাসের মধ্যে প্রথমে সিঙ্গাপুর ও মালয়ের অন্যান্য স্থানে, রেঙ্গুনে ও ব্রহ্মদেশের অন্যান্য স্থানে তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন এবং ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি রেঙ্গুনে যোগ সিং নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন।

উক্ত বিচারে আদালতের অধিকার সংক্রান্ত আলোচনায় শ্রীযুক্ত দেশাই বলেন যে, সামরিক আইনের কথা বাদ দিলেও বৃটিশ ভারতের বাহিরে অনুষ্ঠিত কোন অপরাধের জন্য যে ব্যক্তি বৃটিশ ভারতের প্রজা নহেন, তাঁহার বিচার করিবার ক্ষমতা কোন বৃটিশ ভারতীয় আদালতের নাই; ১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনের দ্বিতীয় প্যারা পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতীয় সামরিক ৪১ ধারায় সামরিক আইনের আদালতকে বৃটিশ ভারতের বাহিরে অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য বৃটিশ ভারতের প্রজা নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তিকে বিচার করিবার যে ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে তাহা বিধি বহির্ভূত।

অতঃপর শ্রীযুক্ত দেশাই বলেন, কোন দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীকে সম্রাটের ভারতীয় প্রজা বলিয়া গণ্য করা যায় না। এ সম্পর্কে তিনি নজীর হিসাবে বোম্বাই হাইকোর্টের একটি মামলার উল্লেখ করেন। শ্রীযুক্ত দেশাই তাঁহার বক্তব্যের সমর্থনে লাহোর হাইকোর্টের একটি মামলারও উল্লেখ করিয়া বলেন যে, দিল্লীর কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের যে ক্ষমতা আছে তদপেক্ষা বেশী ক্ষমতা এই আদালতের নাই।

৫ই ডিসেম্বর বেলা আড়াই ঘটিকার সময়ে আদালতের বৈঠক বসিলে জজ-এড্‌ভোকেট মেজর রিউজ মামলা উত্থাপনকারী অফিসার কম্যাণ্ডাণ্ট ব্রিগেডিয়ার থেটিসের অভিমত পাঠ করিয়া বলেন যে, ভারতীয় সামরিক আইন অনুযায়ী আসামী ভারতের অধিবাসী এবং বৃটিশ ভারতের বাহিরে অসামরিক অপরাধের জন্য ভারতীয় সামরিক আইনে গঠিত সামরিক আদালতে তাহার বিচার হইতে পারে।

৬ই ডিসেম্বর সামরিক আদালত অভিমত প্রকাশ করেন যে, বন্দী পক্ষের কৌঁসুলী যে আপত্তি তুলিয়াছেন তাহা অবৈধ এবং এই আদালতেই ক্যাঃ বুরহানুদ্দিনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের শুনানী হইবার পক্ষে আইনগত কোন বাধা নাই।

অতঃপর শুনানী আরম্ভ হইলে ক্যাঃ বুরহানুদ্দিন তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি অস্বীকার করেন।

অতঃপর আসামীর পক্ষ হইতে লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ মহম্মদ মুনীরের এজলাসে হেবিয়াস কার্পাসের আবেদন করা হয়। উক্ত আবেদন সম্পর্কে কোনও রায় না দেওয়া পর্য্যন্ত মামলা কেন স্থগিত রাখা হইবে না, ২রা জানুয়ারী প্রেসিডেণ্টকে তাহার কারণ দর্শাইতে বলিয়া বিচারপতি এক নোটিশ জারী করেন।

ইহার পর লাহোর হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চের সম্মুখে ভারতের জাতীয় বাহিনীর ক্যাপ্টেন মিঃ বুরহানুদ্দিনের হেবিয়াস কর্পাস আবেদন সম্পর্কে সওয়াল আরম্ভ হয়, পরিশেষে আদালত কর্তৃক উক্ত আবেদন অগ্রাহ্য হয়।

ক্যাপ্টেন বুরহানুদ্দিনের বিচারের জন্য যে সামরিক আদালত গঠিত হয় তাহাতে ক্যাঃ বুরহানুদ্দিন তাঁহার জবানবন্দীতে আনিত অভিযোগ সমূহ' অস্বীকার করিয়া বলেন যে, দেশ ও রাজার মধ্যে যদি কোনটি বাছিয়া লইতে হয়, তবে তিনি দেশের প্রতি আনুগত্যকেই বাছিয়া লইবেন।

সামরিক আদালত তাঁহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত করিয়া ক্ষমা প্রদর্শনের সুপারিশ সহ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আদালতের রায় প্রেরণ করেন।

সামরিক আদালত ক্যাঃ বুরহানুদ্দিনকে হত্যাপরাধের অভিযোগ হইতে মুক্তি দিয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার এবং স্বেচ্ছাকৃত ভাবে মারাত্মক

আঘাত করিবার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেন। জঙ্গীলাট এই সম্পর্কে আদালতের রায় অনুমোদন করেন।

ভারতের প্রধান সেনাপতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড মকুব করিয়া ক্যাপ্টেন বুরহানুদ্দিনকে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তাঁহার সমস্ত প্রাপ্য বেতনও বাজেয়াপ্ত করা হয়। বিচারের রায় প্রদানের পরে ক্যাপ্টেন বুরহানুদ্দিনকে দিল্লী ক্যাণ্টনমেণ্টের কাবুল লাইন হইতে একখানি বিমান যোগে অজ্ঞাত স্থানে প্রেরণ করা হয়।

সুবেদার সিঙ্গাড়া সিং এবং জমাদার ফতে খাঁর বিচার

তৃতীয় সামরিক আদালতে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের কর্ম্মচারী এবং প্রাক্তন ৫।১৪শ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের সুবেদার সিঙ্গাড়া সিং এবং জমাদার ফতে খাঁ অভিযুক্ত হন।

এই বিচার সম্পর্কে অন্তবর্ত্তী কালের জন্য ইনজাংশন জারি করার আবেদন করা হইলে ১৯৪৩ সালের ৩রা জানুয়ারী তাহার শুনানী না হওয়া পর্য্যন্ত দিল্লীর সাব জজ বিচার স্থগিত রাখিবার জন্য নির্দ্দেশ দেন। আবেদনকারীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই অপরাপর যুক্তিসহ এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, অপরাধ অনুষ্ঠিত হওয়ার তিন বৎসরের মধ্যে সামরিক আদালত কর্ত্তৃক অপরাধীর বিচারে যে অধিকার রহিয়াছে, অর্ডিনান্স বলে উক্ত সীমা বাতিল করিয়া দেওয়া বে-আইনী। তিন অথবা চার ব্যক্তির বিচারের জন্য উক্ত জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সৈন্য আইনের আওতায় যাহারা পড়ে তাহাদের সম্পর্কে অর্ডিনান্স জারী করার ক্ষমতা বড়লাটের নাই। ভারত শাসন আইনের ৭২ ধারা অনুযায়ী ভারত সরকারই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অর্ডিনান্স জারী করিতে পারেন।

আসামী পক্ষের কৌঁসুলী ডাঃ কাটজু এই যুক্তির অবতারণা করেন যে, গভর্ণমেণ্ট এবং রংরুটের মধ্যে একটা চুক্তি হয় যে, রংরুটে কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবার পর তিন বৎসর কাল অতিবাহিত হইলে অন্ততঃ সামরিক আদালতে তাহার কোন বিচার হইবে না। সুতরাং এই আদালতের এই মামলার বিচার করিবার অধিকার নাই। ডাঃ কাটজু আরও বলেন যে, সামরিক আইনের ৬৭ ধারা অনুসারে—আসামীদের বিচার চলিতে পারে না বলিয়াই অর্ডিনান্স জারী করা হইয়াছে। অর্ডিনান্স জারী করিবার মত জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল কি না সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার আদালতের রহিয়াছে। ডাঃ কাটজু এই প্রসঙ্গে লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ ভাইডের অভিমত উদ্ধৃত করেন।

সরকার পক্ষীয় কৌঁসুলী কর্ত্তৃক উত্থাপিত যুক্তির উত্তরদান প্রসঙ্গে ডাঃ কাটজু বলেন, "এই মামলার বিচার ভারতীয় সামরিক আইনের ৪২ ধারা অনুযায়ী হইতেছে, সুতরাং ইহাকে অসামরিক অপরাধ বলিয়া গন্য করা যাইতে পারে। কিন্তু আসামীগণের বিচার যখন সামরিক আদালতে হইতেছে তখন আর ইহাকে অসামরিক অপরাধ বলা যায় না—ইহাকে তখন সামরিক আইন-বিরুদ্ধ অপরাধই বলিতে হয়। ৬৭ নং ধারা অনুযায়ী আসামীগণকে বিচার করা চলে না, কিন্তু তাঁহাদের সামরিক আদালতে বিচার করিবার জন্যই অর্ডিনান্স জারী করা হইয়াছে।

আসামী পক্ষ হইতে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য করিয়া সামরিক আদালতে এই মত প্রকাশ করেন যে, আসামীদের বিচার করিবার অধিকার এই আদালতের আছে। আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি তাঁহাদের পড়িয়া শুনান হইলে তাঁহারা তাহা অস্বীকার করেন এবং নিজেদের নির্দ্দোষ বলিয়া ঘোষণা করেন।

ফরিয়াদী পক্ষের কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সাক্ষীগণ

আসামীদের বিরুদ্ধে মারপিট ও নানাপ্রকারে প্রলুব্ধ করিবার অভিযোগ করে। সরকারী সাক্ষী লেঃ পুরুষোত্তম দাসও তাঁহার সাক্ষ্যে অনুরূপ অভিযোগ করেন।

১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আসামী পক্ষীয় কৌসুলীর সওয়াল সমাপ্ত হয়। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিজয়ী যেরূপ ভাবে পরাজিতের সহিত ব্যবহার করে, বর্ত্তমান মামলায় আসামীদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত। আসামীরা সাহসী সৈনিকের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের সহিত যোদ্ধার ন্যায় ব্যবহার করাই উচিত।

আসামীদ্বয় ভারতকে স্বাধীন করিবার উদ্দেশ্য লইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়াছিলেন এবং ঐ উদ্দেশ্যেই স্বেচ্ছায় তাঁহারা সংগ্রাম করিয়াছেন। রাজার প্রতি তাঁহাদের আনুগত্যের কথা উঠিতে পারে না। কাজেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারা অনুসারে অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য তাহাদের বিচার হইতে পারে না।

যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বহুবার বলা হইয়াছে যে, পরাধীন জাতির স্বাধীনতা লাভ এবং অন্যান্য জাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই এই যুদ্ধ হইয়াছে। একথা সত্য হইলে ভারতকে বিদেশীর হস্ত হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টাকে কোন ইংরাজই বে-আইনী কার্য্য বলিয়া বর্ণনা করিতে পারে না। যদি কেহ ঐ কার্য্যকে নিন্দা করে তবে বুঝিতে হইবে যে, ইংরাজগণ নিজেদেরই নিন্দা করিতেছে এবং নিজেদের গোপন মত প্রকাশ করিয়া দিতেছে।

ভারতীয়দের রক্ষা করিবার যে দায়িত্ব বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আছে, ভারতীয় সৈন্যগণকে জাপানীদের হাতে সমর্পণ করিয়া তাঁহারা সে দায়িত্ব লঙ্ঘন করিয়াছেন।

কৌসুলী আরও বলেন যে, যখন কোন লোক প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তাহার নিজ দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য যুদ্ধ করে তখন আনুগত্যের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

ভারতের ন্যায় পরাধীন দেশ সম্পর্কে যতপ্রকারই বিবেচনা করা হউক না কেন, পরাধীন দেশের জনগণের মাতৃভূমিকে মুক্ত করিবার যে অধিকার আছে, সে সম্পর্কে আর কোন প্রশ্নই চলে না।

স্বদেশের প্রতি আনুগত্য এবং রাজার প্রতি আনুগত্যের মধ্যে যখন সংঘর্ষ দেখা দেয়, তখন দেশের প্রতি আনুগত্যকেই প্রধান্য দেওয়া হয়। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রে উহা স্বীকৃত হইয়াছে। এই নীতি যদি পালিত না হয় তবে জানিতে হইবে যে, ন্যায় বিচারকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হইয়াছে।

অপরাধ প্রমাণিত হয় নাই

১৯৪২ সালের ২৭শে আগষ্ট তারিখের গুলিবর্ষেনের উল্লেখ করিয়া কৌঁসুলী বলেন যে, সরকার পক্ষের একজনের সাক্ষ্য ব্যতীত অপর কোন সাক্ষ্য প্রমাণাদির দ্বারাই একথা প্রমানিত হয় নাই যে, আসামীদের উভয়েই বা কোন একজন ঐ গুলিবর্ষণের নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। শত্রু পক্ষের সাড়ে চারশত লোক দ্বারা আক্রান্ত হইলে যে হট্টগোলের উদ্ভব হয়, সে অবস্থায় শিখ প্রহরীরাও আত্মরক্ষার্থ ঐ গুলি বর্ষণ করিতে পারে। ঐ অবস্থায় যদি কোন ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার জন্য আলোচ্য আসামীদ্বয়কে দায়ী করা চলে না।

অতঃপর কৌঁসুলী সরকার পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্যের এক এক করিয়া সমালোচনা করিয়া বলেন যে, সাক্ষীরা তাহাদের সাক্ষ্যে ঘটনাকে যতদূর সম্ভব বিকৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা যে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে, তাহার ফলে মামলার ঘটনা একেবারে অসম্ভব ঘটনায় পরিণত হইয়াছে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্য্যের জন্য এত নিন্দা করা হইতেছে কিন্তু জালিয়ান্-ওয়ালাতে সেদিন যখন জেনারেল ওডায়ার নির্ব্বিচারে শিশু, যুবক ও বৃদ্ধকে হত্যা করিল, তাঁহার সেই কার্য্যের জন্যও কোন সামরিক আদালত বসে নাই। লাহোর

এবং অমৃতসরের রাস্তায় রাস্তায় প্রকাশ্য ভাবে যখন ছাত্রদের উপর বেত্রাঘাত করা হইল, তাহার জন্যও ত কোন সামরিক আদালত বসে নাই। কিছুদিন কলিকাতার রাস্তায় গুলী করিয়া ব্রিটিশ সৈন্য কতকগুলি নিরীহ পথচারীকে হত্যা করিয়াছে।

উপসংহারে কৌসুলী বলেন, উপরোক্ত ঘটনা সমূহের জন্য কোনও সামরিক আদালত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, আর ভবিষ্যতে হইবেও না। গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করিয়াই ঐরূপ করা হইয়াছে। কাজেই এই মামলাতেও পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা বিবেচনা করা উচিত।

আসামীদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ আনায়ন করা হয়:—

(১) আসামীদ্বয় এক অবৈধ প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে সম্রাটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন এবং ক্রাঞ্জি বন্দী শিবিরের লোকজনদের উপর—বলপ্রয়োগ করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

(২) আসামী কতকগুলি লোককে নির্দ্দিষ্ট শিবিরে গমন করিতে এবং বলপূর্ব্বক আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিতে বাধ্য করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

(৩) আসামীরা নিরস্ত্র লোকজনদের উপর আদেশ অমান্যের অজুহাতে তাহাদের উপর গুলীবর্ষণ করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত আসামীদের বিরুদ্ধে প্রহারের অভিযোগও আনীত হয়। সামরিক আদালতের বিচারে সুবেদার সিঙ্গারা সিং ও জমাদার ফতে খাঁ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রধান সেনাপতি প্রাণদণ্ড মকুব করিয়া তাহাদের উভয়কেই ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ইহার পর সৈনিকদ্বয়কে দিল্লী ক্যান্টনমেন্টের কাবুল লাইন হইতে বিমান যোগে এক অজ্ঞাত স্থানে লইয়া যাওয়া হয়।

ক্যাপ্টেন আবদুর রসিদের বিচার।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার সম্পর্কে গঠিত চতুর্থ সামরিক আদালতে ক্যাঃ আবদুর রসিদের বিচার হয়। ইনি পূর্ব্বে বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীর চতুর্দ্দশ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেন ছিলেন। সামরিক আদালতের বিচারে তাহার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত সাত দফা অভিযোগ করা হয়।

(১) তিনি ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে সিঙ্গাপুর নৌঘাঁটিতে জাপানী সার্জ্জেণ্টকে সিপাহী জমসের খাঁয়ের উপর মারপিট করিতে প্ররোচিত করেন (২) ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাস পর্যান্ত সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (৩) ডেগরা রেজিমেণ্টের জনৈক নায়ক প্রথম ভাওয়ালপুর পদাতিক বাহিনীর লেঃ কাদের শাহকে স্বেচ্ছায় গুরুতররূপে আহত করে এবং ক্যাঃ রসিদ সেই কার্য্যে সহায়তা করেন। (৪) জমাদার মোহম্মদ নওয়াজ নামক অপর একজন সৈন্যকে আহত করার ব্যাপারেও আসামী দুষ্কৃতিকারীদের সহায়তা করেন। (৫) তিনি ও অপর দুইজন ৪।১৯ হায়দ্রাবাদ রেজিমেণ্টের হাবিলদার রামভিখকে লাঠির দ্বারা প্রহার করেন। (৬) সিঙ্গাপুরে তিনি ১।১৪শ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের সিপাহী সরীফউল্লাকে প্রহার করেন। (৭) ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসের কাছাকাছি সময়ে তিনি বিদাদরিতে হাবিলদার কেরানী তাজ মোহম্মদ খাঁকে একটি গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখেন এবং অজ্ঞান হইয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে সেইখানে সেই ভাবেই রাখেন।

ক্যাপ্টেন রসিদ সমস্ত অভিযোগই অস্বীকার করেন।

১৮ই জানুয়ারি ক্যাপ্টেন আবদুর রসিদের বিচারকারী সামরিক আদালতের পুনরাধিবেশনে রক্ষা পরিষদের পক্ষ হইতে মিঃ আবদুল আজিজ সরকারী সাক্ষী মিঃ নুর মহম্মদকে প্রায় বিশ মিনিট ধরিয়া জেরা করেন। সাক্ষী জেরার উত্তরে ক্যাঃ রসিদের বিরুদ্ধে প্রহারের অভিযোগ করে। অপর

একজন সাক্ষী সিপাই গুল বলে যে, সে অত্যাচারের ভয়েই আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিয়াছিল। অপর একজন সরকারী সাক্ষী নায়ক মহিন্দর সিং বলে যে, সে স্বেচ্ছায় আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করিয়াছিল। বন্দীশিবিরে থাকা-কালীন সে দুইবার ক্যাঃ রসিদকে দেখিয়াছিল কিন্তু কাহাকেও মারপিট করিতে দেখে নাই।

১৯শে জানুয়ারী সামরিক আদালতে অধিবেশন আরম্ভ হইলে বাদীপক্ষের কৌঁসুলী মিঃ আব্দুল আজিজ খানের জেরায় চতুর্থ সরকারী সাক্ষী গোলন্দাজ সাধুসিং বলে যে, ক্যাঃ রসিদকে বা কাহাকেও অত্যাচার করিতে বা কাহারও প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে সে দেখে নাই। ফরিয়াদী পক্ষের কৌঁসুলীর জেরার উত্তরে সাক্ষী বলে যে, ক্যাম্পে মাত্র একটি রন্ধনশালা থাকিত। হিন্দু মুসলমান ও শিখ বন্দিগণ সকলে একই রন্ধনশালায় আহার করিত।

২৮শে জানুয়ারী সামরিক আদালতের অধিবেশনে জজ এডভোকেট্ বলেন, "যে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ গৃহীত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, আসামীর আদেশানুযায়ী বন্দী নিবাসের কর্ম্মচারীরা আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানের জন্য লোকদের বক্তৃতা দিত এবং আসামী আজাদ হিন্দ ফৌজে সৈন্য সংগ্রহ এবং তাহাদের শিক্ষাদান ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাক্ষী তাঁহার সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার্থে আজাদ-হিন্দ ফৌজে যোগদান করিয়া-ছিলেন বলিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার দ্বারা তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডিত হয় না। সরকার পক্ষের সাক্ষ্যে জানা যায় যে, আসামী তাহাদের উপর নির্ম্মম অত্যাচার করিয়াছে।

জজ এডভোকেটের বক্তৃতা শেষ হইলে আদালত আসামীর চরিত্র সম্বন্ধে জানিতে চান। জানা যায় যে, আসামী ইহার পূর্ব্বে কোন আদালতে অভিযুক্ত হন নাই। তাঁহার চরিত্র খুব ভাল বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

আসামী কোন বিবৃতি দিতে অস্বীকার করেন।

১৯৪৬ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সামরিক আদালতে আজাদ হিন্দ ফৌজের চতুর্থ সামরিক আদালতের মামলা সমাপ্ত হয়। ১৪শ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেন ও পরে আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন আবদুর রসিদকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া এক ঘোষণা করা হয় যে, প্রধান সেনাপতি এই দণ্ড অনুমোদন করেন এবং দণ্ডকাল হ্রাস করিয়া ইহাকে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তাহার বেতন ও ভাতা বাতিল করার দণ্ডও প্রধান সেনাপতি অনুমোদন করেন। আসামীর বিরুদ্ধে আনীত সাতটি অভিযোগের মধ্যে পাঁচটি অভিযোগ প্রমাণিত হয়।

প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ মামলায় ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ ও অপর দুইজন আসামীর প্রতি প্রদত্ত কারাদণ্ড কেন মকুব করা হইল এবং ক্যাপ্টেন আবদুর রশিদকে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল, তাহার কারণ বর্ণনা করিয়া সরকার পক্ষ হইতে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ মার্জ্জনা করা অসঙ্গত নহে, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট, সভ্যতা বিরোধী জাজ্জ্বল্যমান ঘৃণ্য কাজ ক্ষমা করিতে পারেন না; কারণ তাহাতে একেবারে সমাজের নৈতিক ভিত্তিকেই ক্ষুণ্ণ করা হইত। ক্যাপ্টেন আবদুর রসিদ উক্ত অপরাধে অপরাধী, সুতরাং তাঁহাকে ক্ষমা করা যায় না।

জমাদার পূরণ সিংএর বিচার

পঞ্চম সামরিক আদালতে আজাদ হিন্দ ফৌজের জমাদার পূরণ সিংএর বিচার হয়। গত ৭ই মার্চ্চ সামরিক আদালত জমাদার পূরণ সিংকে একাধিক দোষে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার নথিপত্র তলব করে।

সরকার পক্ষের কৌঁসুলী ক্যাপ্টেন নরিন্দর বাইন আসামীর চরিত্র সম্পর্কে বলেন যে, আসামী ওয়াজির স্থানে থাকাকালে কার্য্যে দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া

দুইটি প্রশংসাপত্র পাইয়াছিলেন এবং আসামী ইতিপূর্ব্বে কখনও কোনও প্রকার দণ্ড ভোগ করেন নাই।

দণ্ড বিধান সম্পর্কে এডভোকেট ব্যানার্জ্জি আদালতকে লক্ষ্য করিয়া বলেন আসামী আদালতের নিকট তাহার সম্ভাবিত চরম শাস্তির কথা জানিতে ইচ্ছুক। তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতা কামী ভারতবাসী অযৌক্তিক গুলীবর্ষণ কারীর দণ্ডাজ্ঞাই আদালতের নিকট দাবী করে। কিন্তু অতীতে এর চেয়েও জঘন্য অন্যায় কার্য্যের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় নাই, এমন কি আসামীকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিবার জন্য নূতন আইন প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ জেনারেল ওডায়ারের কার্য্যকলাপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

জমাদার পূরণ সিংকে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

হাবিলদার যশোবন্ত সিং দণ্ডিত

আজাদ হিন্দ ফৌজের হাবিলদার যশোবন্ত সিং ও ঝাড়ুদার নিম্বু ৬ষ্ঠ সামরিক আদালত কর্ত্তৃক তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত যাবতীয় অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত এবং দণ্ডিত হন। হাবিলদার যশোবন্ত সিংকে তিন বৎসর ও ঝাড়ুদার নিম্বুকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। উভয়কেই চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয় এবং তাঁহাদের প্রাপ্য বেতন ও ভাতা বাজেয়াপ্ত করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

ডেপুটি জঙ্গীলাট সামরিক আদালতের এই দণ্ডাদেশ অনুমোদন করেন।

জমাদার জামান খানের মুক্তিলাভ

আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক জমাদার জামান খানের সপ্তম সামরিক আদালতে বিচার হয়। জমাদার জামান খান, আদালতে এক বিবৃতি

দাখিল করিয়া বলেন, দেশপ্রেম অপরাধ হইলে আমি অপরাধী। এজন্য আমি জীবন বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত। হয়ত বৃটিশ সরকার আমার মনোভাবকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিবে, কিন্তু আমি আমার দেশবাসীর বিচারের উপর নির্ভর করিব। যদি ন্যায়পরায়ণতা বলিয়া কোন কিছু থাকে তাহা হইলে আমার বিরুদ্ধে যে মিথ্যা অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহা হইলে আমাকে মুক্তি দেওয়া হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সাক্ষ্য প্রমাণাদি সহ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে আমি নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইব।

অতঃপর সামরিক আদালতের বিচারে জমাদার জামান খান নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হন। পাঁচটি অভিযোগের মধ্যে তিনটি অভিযোগ হইতে আদালত তাহাকে মুক্তি দেন। বাকী দুইটি অভিযোগ সম্পর্কে বলা হয় যে, আসামীর ব্যবহারকে নৃসংশ বলা চলে না, সুতরাং আইনতঃ তাহার মুক্তি পাওয়া উচিত।

সুবেদার ঝাণ্ডুরামের বিচার

গত ১৩ই মার্চ্চ বুধবার অষ্টম সামরিক আদালতে সুবেদার ঝাণ্ডুরামের বিচার আরম্ভ হয়।

মিঃ আর, কে, এফ, বাহাদুরজী এবং মিঃ সর্দ্দার বাহাদুর—আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। আসামী নিজেকে নির্দ্দোষ বলেন।

আসামীর বিরুদ্ধে তিন প্রকার অভিযোগ আনীত হয়। আসামী হাবিলদার গোলাম কাদিরকে আটক করিয়া রাখিবার এবং প্রহার করিবার জন্য বালিক পাপানে জাপানীদিগকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন।

সিপাহী রেশম সিংএর বিচার

২৯শে মার্চ্চ নবম সামরিক আদালতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সিপাহী রেশম সিংএর বিচার আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ এবং শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী আসামী পক্ষের কৌঁসুলীরূপে আদালতে উপস্থিত হন।

আসামীর বিরুদ্ধে একটি নিষ্ঠুর আচরণের অভিযোগ আনা হয়। আসামী নিজেকে নির্দ্দোষ বলিয়া জানান। আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ বিবরণী পাঠ করা হইলে আসামী পক্ষের কৌঁসুলী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ জানান যে, আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কিত ব্যাপার—৩ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছে বলিয়া উহা বর্ত্তমানে সামরিক আদালতের বিচারাধীনে আসিতে পারেনা। কিন্তু আদালত তাঁহার এই আপত্তি অগ্রাহ্য করেন।

সরকার পক্ষের কৌঁসুলী আসামীর বিরুদ্ধে পাঁচটি অপরাধ উপস্থিত করেন। ১৯৪২ সালের ২৪শে আগষ্ট তারিখে ক্র্যাঞ্জি শিবিরে গুলীতে আহত ১১ জন বন্দীকে বিদাদরী বন্দী-শিবিরে আটক রাখা হয়। ঐদিন রাত্রে আসামী সর্দ্দার সিঙ্গাড়া সিং ও জমাদার ফতে খাঁর সহিত বন্দীদের উপর অত্যাচার করেন। আসামী গুল নওয়াজ নামক এক ব্যক্তিকেও অন্যান্য লোকের সঙ্গে প্রহার করিয়াছিলেন।

অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট এগারজন ব্যক্তিকে ব্রহ্ম সরকার সম্প্রতি গ্রেপ্তারের আদেশ দিয়াছেন। ইহার মধ্যে পাঁচজন রেঙ্গুনে দুই জন মালয়ে এবং চারজন ভারতবর্ষে আছেন। আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের উপদেষ্টা শ্রীযুত বসিরকে গ্রেপ্তার করিয়া ২০ হাজার টাকার দুইটি জামিনে মুক্তি পাইয়াছেন। ইহারা সকলেই নেতাজী তহবিলের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত ছিলেন এবং তাঁহারা নিজে ৫লক্ষ হইতে ১কোটি টাকা উক্ত তহবিলে দান করিয়াছিলেন।

গত ২৩শে এপ্রিল তারিখে দুইজন আজাদী সৈনিক অফিসারের বিচার হইবার এক সংবাদ প্রকাশিত হইলে পণ্ডিত নেহেরু লর্ড ওয়াভেলকে প্রতিবাদ জানাইয়া এক পত্র লেখেন, উক্ত ঘটনার পর ৩রা মে পণ্ডিত নেহেরু লর্ড ওয়াভেলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভবিষ্যতে আর কোন আজাদ হিন্দ সৈনিকের বিচার হইবে না বলিয়া বড়লাট, নেহেরুকে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন।

গত ১লা মে শ্রীযুত আজিজ আহমেদ, জীবন সিং, জাগীর সিং, কে, এম, সলীম প্রভৃতি সাতজন আজাদ হিন্দ অফিসার মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

গত ২রা মে দিল্লী ক্যাণ্টনমেণ্টের কাবুল লাইন হইতে জেনারেল জে, কে, ভোঁসলে, শ্রীযুত মালিক শ্রীযুত জিলানী, ঠাকুর সিং, প্রীতম সিং মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

গত ৩রা মে ভারতীয় মুক্ত অঞ্চলের গভর্ণর লেঃ কর্ণেল চ্যাটার্জ্জি, বাটলিওয়ালা, জগজিত সিং প্রভৃতি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

সম্প্রতি নেতাজীর মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল মেহবুব কর্ণেল হবিবুর রহমন আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শাসনকর্ত্তা কর্ণেল লোগনাধন মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

গত ৪ঠা মে ক্যাপ্টেন মোহন সিং মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়াছিলেন।

আজাদী সৈনিকদের উপর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা

ভারতের জাতীয় বাহিনীর ভাগ্য বিপর্য্যয়ের পর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উক্ত বাহিনীর সৈন্য এবং কর্ম্মচারীবৃন্দের উপর যে প্রতিশোধমূলক যে অত্যাচার করিয়াছে পৃথিবীর কোন সভ্য দেশের ইতিহাসে তাহার কোন নজির পাওয়া যায় না। বৃটিশ সরকার ইতিহাস প্রসিদ্ধ নাৎসী অত্যাচারের প্রমাণ স্বরূপ বেলসেন বন্দী শিবিরের নিন্দা-প্রচারে পঞ্চমুখ। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক এবং অফিসারদের উপর নৃশংস অত্যাচার কাহিনী বেলসেন বন্দি-শিবিরের অত্যাচারকেও হার মানাইয়াছে। সেই অমানুষিক অত্যাচার কাহিনীর আংশিক বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ভারতের কেন্দ্রীয় পরিষদের আজাদ-হিন্দ সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে সমর বিভাগের সেক্রেটারী যাহা বলেন তাহাতে জানা যায়, আজাদ হিন্দ ফৌজের অনুমান ১৯০০০ লোককে পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ছয় হাজার সৈনিককে ভারতবর্ষে এবং দুই হাজার দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়ার আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ২৭ জন সৈনিক আটক থাকা কালীন মারা গিয়াছেন এবং ৯ জনকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে।

এই সমস্ত সৈনিকদের বিচার কোন প্রকাশ্য আদালতে করা হয় নাই এবং আজাদ হিন্দ সংক্রান্ত কোন ব্যাপারই প্রকাশ করা হয় নাই এবং যে নয়জন সৈনিককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল তাহাদিগকে কখন কোথায় ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাদের নাম ধাম কিছুই প্রকাশ করা হয় নাই।

নীলগঞ্জ বন্দী-শিবির

সেপ্টেম্বর মাসে বাঙ্গলায় নীলগঞ্জ বন্দীশিবিরে আজাদ হিন্দ ফৌজের দুইজন বন্দী গুলী বর্ষণের ফলে নিহত হয়। এতদ্ব্যতীত ১২ জন বন্দী গুলী বর্ষণের ফলে সাংঘাতিক রূপে আহত হয়, তন্মধ্যে ৩ জন পরদিন মারা যায়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, ২৬।৩ মাদ্রাজ রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডিং অফিসার এ সি গোপালন নায়েয়ার, ক্যাপ্টেন ই. আর, আর, মেনন, স্থবেদার রামস্বামী থেবার ও জমাদার বিশ্বনাথ কোনার প্রভৃতি নীলগঞ্জ বন্দীশিবিরের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। সেই সময় উক্ত শিবিরে মোট ১০২৪ জন বন্দী ছিলেন। ২৫শে সেপ্টম্বর রাত্রি দশ ঘটিকার সময় শিবিরের সকল আলোই নির্ব্বাপিত হয়। সকলেই নিদ্রা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এমন সময় ক্যাপ্টেন মেনন বেড়া ডিঙ্গাইয়া ভিতরে প্রবেশ করেন এবং কুৎসিত ভাষায় বন্দীদের গালাগালি করিয়া তাহাদের পাঁচ মিনিটের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ হইতে বলেন। বন্দীগণ সঙ্গে সঙ্গেই আদেশ পালন করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহারা বিপদসূচক সংকেত ধ্বনি শুনিতে পান এবং কিছুক্ষণ পরেই ছুটাছুটির শব্দ শোনা গেল। ইতিমধ্যেই ক্যাপ্টেন মেনন ও জমাদার বিশ্বনাথ কোনার ৫০ জন সিপাহীসহ বন্দুক রাইফেল ও পিস্তল লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া সমবেত ব্যক্তিদের উপর গুলীবর্ষণের জন্য প্রস্তুত হয়। ক্যাঃ মেনন সম্মুখে অগ্রসর হইয়া মালয়ালম ভাষায় বলেন, "কুত্তার বাচ্ছাদের উপর গুলীবর্ষণ কর"। বন্দীদের একজন তাহার ঐ কথায় আপত্তি করিলে ক্যাঃ মেনন তাঁহার লোকদের বন্দীদের উপর গুলীবর্ষণ করিতে আদেশ দেন। কিন্তু সিপাহীগণ তাঁহার আদেশ পালন করে নাই। কারণ পূর্ব্বেও বন্দীদের ভীতিপ্রদর্শনের জন্য অনুরূপ আদেশ দেওয়া হইত।

পূর্ব্ব রীতি অনুসারে সিপাহীরা কয়েকবার ফাঁকা আওয়াজ করে কিন্তু

ক্যাপ্টেন তাহাদের গুলীবর্ষণ করিতে আদেশ দেন। গুলীর শব্দ শুনিয়াই বন্দীগণ 'নেতাজী কি জয়। ও 'জয় হিন্দ' প্রভৃতি ধ্বনি করিতে করিতে শুইয়া পড়ে। পাঁচ মিনিটের অধিক গুলী চালান হয়। গুলী বর্ষণ ক্ষান্ত হইলে বন্দীগণ উঠিয়া পড়েন এবং দেখেন যে, ক্যাঃ মেনন ও তাঁহার লোকজন বাহির হইয়া যাইতেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহারা দেখেন যে, তাঁহাদের মধ্যে ২ জন নিহত এবং ১২ জন সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়াছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের মেডিকেল অফিসার মেজর রামকৃষ্ণপ্রসাদ, ক্যাঃ গাঙ্গুলী প্রভৃতি আহতদের শুশ্রূষা করেন। কিছুক্ষণ পরে জনৈক ইউরোপীয় অফিসার আহতদের আলিপুর সামরিক হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। পরদিন ৩ জন হাসপাতালে মারা যান এবং ৯ জন আহত ব্যক্তি এক মাস কাল চিকিৎসাধীন থাকেন। যে কয় ব্যক্তি মারা গিয়াছেন তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—পাঞ্জাবের কর্ণায়ল সিং, মাদুরার মহম্মদ কাশিম, পটুয়া কোর্টালের কর্পূপিয়া, কুদালোরের নারী ইয়াপ্পন ও অপর এক ব্যক্তি। ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে সকল বন্দী মৃত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য অনশন করেন এবং সন্ধ্যাকালে প্রার্থনা করেন। উক্ত ঘটনার পর দুই দিন পর্য্যন্ত বন্দীদের নাম ডাকা হয় নাই।

মণ্টগোমারী জেলের দুর্ঘটনা। ১৯৪৫ সালের ১৯শে অক্টোবর মণ্টগোমারী জেলে জাতীয় বাহিনীর একটি দলের উপর অমানুষিক লাঠি চার্জ্জ করা হয়। প্রায় ছয় সাত জন লোককে লাঠি চার্জ্জের পর টানিয়া বাহির করিতে দেখা যায়। তার মধ্যে ত্রিলোক সিং, গুরুমুখ সিং এবং লেখরাম সিং পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

দিল্লী জেলে অমানুষিক অত্যাচার ১৯৪৪ সালের ২৪শে আগষ্ট তারিখে দিল্লী জেলে জাতীয় বাহিনীর তিন জন সামরিক অফিসার আজাই সিং, সত্যেন্দ্র লাল মজুমদার, এবং জাহির আহমদকে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। প্রিভি-

কাউন্সিলে বিচারের জন্য তাঁহারা যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহাও অগ্রাহ্য করা হয়। ঘটনার বিবরণে আরও প্রকাশ যে জাতীয়বাহিনীর লেফটন্যান্ট অবদেশ্বর রায় এবং শ্যামলাল পাণ্ডেকে কাশীতে গ্রেপ্তার করা হয় এবং গোরক্ষপুর কেতোয়ালী এবং লক্ষ্মৌয়ের সি, আই, ডি আফিসে জিজ্ঞাসবাদ করার পর তাঁহাদিগকে দিল্লীর লাল কেল্লায় স্থানান্তরিত করা হয়। তথায় জাতীয় বাহিনীর অন্যতম প্রধান লেফটেন্যান্ট জহির আহমেদের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। জাহির আহমেদকে তখন ভীষণ ভাবে বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল। এক সপ্তাহ পরে তাঁহাকে লাহোর দুর্গে স্থানান্তরিত করা হয়। পূনর্ব্বার লেঃ অবদেশ্বর রায় এবং শ্যামলাল পাণ্ডেকে দিল্লীর লালকেল্লার এক অন্ধকার কোঠায় আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং স্বীকারোক্তি করিতে বাধ্য করিবার জন্য তাঁহাদিগকে ভীষণ ভাবে বেত্রাঘাত করা হয়। তাঁহাদিগকে একই কুঠরিতে সাতসপ্তাহ পর্যন্ত আটক করিয়া রাখা হয়। অবদেশ্বর রায় অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহাকে মুলতান দুর্গে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাঁহাকে ভীষণ শীতের মধ্যে একটি খাটিয়াতে দশ দিন কাটাইতে বাধ্য করা হয়। তৎপর তাঁহাকে মফঃস্বলে একটা জেলে পাঠান হয়, সেখানে তিনি আমরণ অনশনের সঙ্কল্প করেন।

পথিমধ্যে আজাইব সিং এবং জহির আহমদের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদিগকে (আজাইব সিং এবং জহির আহমদকে) তখন দিল্লী জেলে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। লাহোর দুর্গে ভীষণ বেত্রাঘাতের ফলে আজাইব সিংএর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে এবং তাঁহার সাথী সত্যেন্দ্র লাল মজুমদারের মস্তিষ্কে ক্ষত চিহ্ন দেখা যায়। তাঁহাদের দুইজনকেও দিল্লী জেলে ফিরাইয়া আনা হইয়াছিল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের উল্লিখিত পাঁচজন সৈনিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। তাঁহারা তখন আত্মপক্ষ সমর্পন করিবার জন্য কৌসুলী নিয়োগের প্রার্থনা করিলে তাঁহারা কংগ্রেস পন্থী এই অপরাধে তাঁহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য

করা হয়। গুপ্তচর বিভাগের পরামর্শ অনুসারে শ্রীযুত রাসবিহারী লালকে সরকার পক্ষের কৌসুলী নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু তাঁহাকে স্বাধীনভাবে আসামীদিগকে জেরা করিতে দেওয়া হয় নাই বলিয়া মামলা চলিতে থাকায় সময়েই তিনি সরকারের এই দুর্নীতির প্রতিবাদ স্বরূপ পদত্যাগ করেন। রঞ্জিত সিং নামক একজন শিখ উকিল ব্যতীত আর কোন উকিল এই মামলার সরকার পক্ষ সমর্থন করিতে অস্বীকার করেন।

বিচারে সমস্ত আসামীদের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় এবং উচ্চ আদালত কর্ত্তৃক উক্ত আদেশ সমর্থিত হয়। তৎপর বড়লাট মাত্র শামলাল এবং অবদেশ্বর রায়ের প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা মকুব করিয়া দেন কিন্তু অন্যান্য সমস্ত আসামীকেই দিল্লী জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়। শ্যামলাল এবং অবদেশ্বর রায় বেনারেস জেলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদিগকে কোন বন্ধুবান্ধবদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ পর্য্যন্ত দিতে রাজী নন।

ছয়জন আজাদী সৈনিকের প্রাণদণ্ড—১৯৪২ সালের শেষ ভাগে মালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ২০ জন সৈনিককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাদের মধ্যে ছয়জনকে বিচারান্তে মাদ্রাজে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং একজনকে পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

যে পাঁচ জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে সাংহাইস্থিত ভারতের স্বাধীনতা সঙ্ঘের প্রচার বিভাগের অধ্যক্ষ মালবারের এম, জি, ওয়ারিয়রও ছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি যখন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বোম্বাইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন তখন পথিমধ্যে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিছুদিন যাবৎ বোম্বাইতে আটক রাখিবার পর তাঁহাকে লাহোর দুর্গে এবং পরে পাঞ্জাবের স্পেশাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। অতঃপর তাঁহাকে মাদ্রাজে আনয়ন করা হয় এবং পরে পুনরায় তাঁহাকে বেলারী এবং সর্ব্বশেষে ভেলোরে স্থানান্তরিত করা হয়।

চোপরার প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা—১৯৪৪ সালে ১৮ই ডিসেম্বর দিল্লীর স্পেশাল জজ বিচারান্তে ভারতের জাতীয় বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুত চোপরাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। পুনর্বিচারকারী জজ কর্ত্তৃক উক্ত আদেশ সমর্থিত হইলে শ্রীযুত চোপরার পক্ষে প্রিভি কাউন্সিলে পুনরায় বিচারের জন্ম আবেদন করা হয় কিন্তু প্রিভি কাউন্সিলের জুডিসিয়েল কমিটি উক্ত আবেদন অগ্রাহ্য করেন।

১৯৪৩ সাল হইতে ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে বৃটিশ ভারত এবং বাহিরে বিভিন্নস্থানে আরও চার জন লোকের সহযোগিতায় শ্রীযুত চোপরা শত্রু পক্ষকে সাহায্য করিবার এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয়।

আবেদনকারীর (শ্রীযুত চোপরা) পক্ষের কৌঁসুলী যুক্তি দেখাইয়া বলেন যে, শ্রীযুত চোপরার প্রতি যে শাস্তি বিধান করা হইয়াছে সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা তাহা সমর্থন করা যায় না।

ক্যাপ্টেন ধরমসিং গুলীর আঘাতে আহত—আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন ধরম সিং ঝিকরগাছা বন্দী নিবাসে আটক ছিলেন। গুলীর আঘাতে আহত হইয়া তিনি সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় কিছু কাল হাসপাতালে ছিলেন।

বন্দী নিবাসে থাকাকালীন এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাইবার সময় তিনি গুলীর আঘাতে আহত হন। গুলীটি তাহার দক্ষিণ নিতম্ব ভেদ করিয়া পাকস্থলীর একপার্শ্বে স্পর্শ করিয়াছিল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারের আত্মহত্যা—লেফটেনাণ্ট আজমীর সিং এবং লেঃ মজহর সিংকে ১৯৪৫ সালের জুন মাসে ইম্ফল রণক্ষেত্রে গ্রেপ্তার করা হয় এবং দিল্লী আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে লাল কেল্লায় আটক করিয়া রাখা হয় এই দুইজন অফিসারই ১৯৪৪ সালের ৫ই নবেম্বর সন্ধ্যাবেলা আত্মহত্যা করেন। নিম্নে ঘটনার বিবরণ দেওয়া হইল :—

১৯৪৪ সালের ৫ই নবেম্বর সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিষেধ সত্ত্বেও বন্দুকধারী একজন পাহারাওয়ালা বারান্দার আলো জ্বালাইবার নিমিত্ত উপরোক্ত বন্দী অফিসারদ্বয়ের কক্ষে প্রবেশ করে। এই সময়ে হঠাৎ লেঃ আজমীর সিং তাহাকে চাপিয়া ধরেন এবং তাহার নিকট হইতে বন্দুকটা ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করেন। লেঃ মজহর সিং তাঁহাকে (লেঃ আজমীর সিংকে) সাহায্য করেন এবং পাহারাওয়ালার হাত হইতে বলপূর্ব্বক বন্দুকটা ছিনাইয়া লইতে সমর্থ হন। পাহারাওয়ালা চিৎকার করিয়া উঠে কিন্তু অন্য পাহারাওয়ালা আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই লেঃ মজহর সিং, লেঃ আজমীর সিংকে গুলী করেন এবং তৎপর নিজের কপালে গুলী করেন। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হয় এবং উভয়েরই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

কম্যাণ্ডিং অফিসারের নিকট লিখিত তাহাদের একখানা চিঠি পাওয়া যায় তাহাতে লেখা ছিল:—

"আমরা সহজেই এই স্থান হইতে পলায়ন করিতে পারিতাম, তাহা আমরা সঙ্গত মনে করি নাই। আমাদের এই কাজ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং ইহার জন্য অপর কেহ দায়ী নয়। বিদায়! বিদায়!

স্বাঃ মজহর সিং
আজমীর সিং।

দিল্লী দুর্গে অপর তিনজন নায়কের আত্মহত্যা—দিল্লী দুর্গে অবরুদ্ধ আজাদ হিন্দ ফৌজের তিনজন সেনা নায়ক কর্ত্তৃপক্ষের অসদাচরনের জন্য আত্মহত্যা করে। লাহোরের স্যার আবদুল কাদেরের পুত্র দিল্লী দুর্গে অন্যতম বন্দী ক্যাপ্টেন এহসান কাদেরকে মানসিক রোগের চিকিৎসাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। সম্প্রতি তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া বৈরাগড় যুদ্ধবন্দী শিবিরে দুইশত পঁচিশজন জাতীয় বাহিনী অফিসার ও সৈন্যকে বন্দী করিয়া রাখা হয়। তাহাদের ১৫নং ক্যাম্পের দুইটি ব্যারাকে তালা দিয়া আটকাইয়া রাখা হইত এবং বৃটিশ সৈন্য তাহাদের পাহারায় নিযুক্ত থাকিত। কোন ভারতীয়কে ইহাদের সঙ্গে দেখা করিতে দেওয়া হইত না এবং ইহাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রও ইহাদিগকে নিয়মিত সরবরাহ করা হইত না।

সরকারী বিবৃতির প্রতিবাদে ক্যাপ্টেন সেহগল—আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্ম্মচারীদের আত্মহত্যা সম্পর্কে ভারত সরকার যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার মধ্যে মানসিক যন্ত্রনা ও অপমানকর ব্যবহার সহ্য করিতে অক্ষম হওয়ায় লাল কেল্লায় সুবেদার জয়ন্ত সিং ও মূলতান ক্যাম্পে আরও একজনের অত্মহত্যা সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নাই। ইহারা গত ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।”

ব্রহ্ম জাতীয় বাহিনীর বহুসংখ্যক সৈন্যই ব্রহ্ম পুলিশ, সামরিক ও অন্যান্য বিভাগ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছিল। সরকারী নীতির সমালোচনা করিয়া ক্যাপ্টেন সেহগল আরও বলেন, কেন্দ্রীয় পরিষদে সরকারী নীতি বলিয়া যাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহাই যদি ঠিক হয় তাহা হইলে আমি জানিতে চাই যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সমস্ত অসামরিক ব্যক্তি যোগ দিয়াছিল আজও তাহাদিগকে কেন কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে ?”

ক্যাপ্টেন রসিদ আলি নিষ্ঠুরতার অপরাধে অপরাধী বলিয়া মিঃ ম্যাসন যে মন্তব্য করিয়াছেন সে সম্বন্ধে ক্যাঃ সেহগল বলেন, বৃটিশ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষই বন্দী ভারতীয় সৈন্যগণের উপর নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য দায়ী। সিঙ্গাপুর পতনের সময় বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে লেঃ হাণ্ট এই সকল সৈন্যকে জাপ কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করেন। অপরপক্ষে লেঃ হাণ্টের উপস্থিতিতে জাপ সরকারের প্রতিনিধিরূপে মেজর ফুজিয়ারা এই সকল সৈন্য ও কর্ম্মচারীকে জেনারেল

মোহন সিংএর হস্তে অর্পণ করে। এই সময় বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে লেঃ হাণ্ট কোনপ্রকার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন নাই। ইহার পর হইতে বন্দীগণ জেনারেল মোহন সিং এর অধীনেই ছিলেন। শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে অনেককে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাও সত্য যে, কোন কোন ক্ষেত্রে বেত মারা হইয়াছে। জেনারেল পার্সিভ্যালের আদেশে বৃটিশ যুদ্ধ বন্দীদেরও বেত মারা হইয়াছে।

ব্রহ্ম জাতীয় বাহিনীর উল্লেখ করিয়া ক্যাঃ সেহগল বলেন, উক্ত বাহিনী ১৫ হইতে ২০ হাজার ভারতবাসীর হত্যা ও সম্পত্তি লুঠের জন্য দায়ী। এই সমস্ত অপরাধ সম্বন্ধে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ কি বলেন, তাহা আমি জানিতে চাই। আমি জানিতে চাই সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ এই অপরাধের শাস্তির জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন কি না।

১৯৪৪ সাল এবং ১৯৪৫ সালের ছয় মাস ধরিয়া লাল কেল্লায় আবদ্ধ আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যগণের উপর অমানুষিক নির্য্যাতন করা হইয়াছে। নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য যদি কাহাকেও শাস্তি পাইতে হয় তবে তাহা লাল কেল্লায় বৃটিশ সামরিক কর্ম্মচারী লেঃ ওয়ারেনেরই প্রাপ্য। কুঠুরীতে আবদ্ধ আমার সহকর্ম্মীদের প্রহার করিবার শব্দ আমি নিজ কানেই শুনিয়াছি। লেঃ ওয়ারেন নিজ হাতেই প্রহার করিয়াছিলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য ও সেনাপতিগণকে ব্রহ্মদেশে অনেক সময় সমস্ত দিন রৌদ্রের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হইত। অনেক সময় ৪০ হইতে ৬০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কোনও রকম পানীয় দেওয়া হইত না। একজন সৈন্য জলের অভাবে মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

জার্ম্মান সীমান্তের আজাদ ফৌজীদের কথা উল্লেখ করিয়া ক্যাঃ সেহগল বলেন যে, বৃটিশ সামরিক কর্ম্মচারীর আদেশে ফরাসী সৈন্যগণ বহু আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে।”

রুদ্ধ দ্বার কক্ষে সর্দ্দার গিল ও শ্রীযুত জ্যোতিষ বসুর বিচার

শত্রু পক্ষের চর বলিয়া সামরিক আদালতে সর্দ্দার অমর সিং গিল ও শ্রীযুত জ্যোতিষ বসুর বিচার হয়। এই তথাকথিত বিচারে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, বাঙ্গালার যে সমস্ত স্থানে সাধারণতঃ বিচার বসে, তাহার কোথাও ইহা বসে নাই। ক্যামাক ষ্ট্রীটের একটি বেসরকারী বাড়ী ভাড়া করা হয় এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট সেখানে একজন বিচারককে প্রেরণ করেন। এই তথাকথিত বিচার রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এবং উহার সম্পর্কে সকল সংবাদ সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়। আসামীগণ সম্পর্কে অথবা তাঁহাদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সম্পর্কে জনসাধারণকে কিছুমাত্র জানান হয় নাই। এই বিচারকালে এবং ভারতের অন্যান্য অংশে এই ধরণের বিচারের সময় আসামীগণকে আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার এই মাত্র অধিকার দেওয়া হইয়াছে যে, সরকার কর্ত্তৃক জনৈক আইনজীবীকে তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। এবং দণ্ডিত ব্যক্তিগণকে ফাঁসি দিবার পরেই জনসাধারণের নিকট সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রকাশ করা হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে জনসাধারণ, পরিবার পরিজন ও বন্ধুবান্ধবেরা এই সকল আসামীর অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে একটি কথাও জানিতে পারেন না।

শ্রীযুত বসু এই অনুরোধ জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার ফাঁসি হইয়া যাইবার পর তাঁহার স্ত্রীকে যেন সেবাগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর তত্ত্বাবধানে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং সেখানে যেন তাঁহার স্ত্রী কোন গঠন মূলক কার্য্যের শিক্ষালাভ করিয়া জাতির সেবা করেন। জাতির সেবায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া তিনি নিজেকে সম্মানিত বোধ করিতেছেন।

সর্দ্দার গিল কোনরূপ অনুরোধ জানান নাই বা কোন প্রকার অনুশোচনা প্রকাশ করেন নাই।

এই শহীদ দ্বয়ের প্রাণ রক্ষার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইবার জন্য পরে চেষ্টা করা হয়। কিন্তু গিল অনুকম্পা প্রদর্শনের আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য এবং সৈন্যের মতই নিজের সম্মানকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া তিনি মৃত্যুবরণ করিতে চাহেন।

সর্দ্দার অমর সিং গিল, শ্রীযুত জ্যোতিষ বসু, শ্রীযুত হরিদাস মিত্র ও ডাঃ পবিত্র রায়—এই চারিজন বন্দীর মৃত্যুদণ্ড বড়লাট মঞ্জুর করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী কিছুকাল পূর্ব্বে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত এই বন্দী চারিজন সম্পর্কে বড়লাট ও তাঁহার সেক্রেটারী স্যার ইভ্যান্স জেঙ্কিন এর সহিত কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হন। আদালতে বন্দী চারি জনের যে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টাতেই তাহা মঞ্জুর করা হয়।

বাহাদুরগড় বন্দীশিবিরে আজাদ হিন্দ ফৌজের ২৫ জন সদস্যের মৃত্যু

আজাদ হিন্দ ফৌজের ২৫ জন বীর সেনা গত ৮ই অক্টোবর বাহাদুরগড় বন্দীশিবিরে জাতীয় সঙ্গীত গাহিবার অপরাধে ভীষণ এবং নিষ্ঠুর ভাবে বন্দুকের আঘাতে মৃত্যু মুখে পতিত হন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বাহাদুরগড় বন্দীশিবিরে প্রায় ২,৫০০ আজাদী সৈন্যকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তাঁহারা জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে থাকিলে একজন ভারতীয় ক্যাম্প কম্যাণ্ডার তাঁহাদিগকে ঐ সঙ্গীত গাহিতে নিষেধ করেন। তাঁহারা এই নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করেন এবং উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট রিপোর্ট করা হয়। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং একজন ভারতীয় কম্যাণ্ডারকে বন্দীগণের উপর বন্দুক চালনা করিতে

আদেশ দেন। ভারতীয় কম্যাণ্ডার এই আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করেন। তখন দিল্লী হইতে একটি নবগঠিত গুর্খা বাহিনীকে বাহাদুরগড় বন্দীশিবিরে তলব করা হয় এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্যদের উপর বন্দুক চালনা করিতে আদেশ দেওয়া হয়, ফলে ২৫ জন আজাদী সৈন্য প্রাণ হারান এবং আরও কয়েক জন আহত হন।

আহত সৈনিকগণকে একজন ভারতীয় ডাক্তারের নিকট প্রেরণ করা হয়। তিনি সৈনিকদের যে বন্দুক চালনা করা হইয়াছে সেই সম্বন্ধে লিখিত বিবৃতি না পাওয়া পর্য্যন্ত প্রথমে আহতদিগকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করিতে অস্বীকার করেন।

ইহাছাড়া বহু বন্দীকে পরস্পরের প্রতি জয় হিন্দ্ বলিয়া অভিনন্দন জানাইবার অপরাধে চপেটাঘাত করা হয় এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। আহত সৈনিকগণকে তিনি দিন পর্য্যন্ত কোন কোন প্রকার খাদ্য দেওয়া হয় নাই।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু জার্ম্মানীতে যাইয়া জার্ম্মানগণ কর্ত্তৃক ধৃত ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া যে বাহিনী গঠন করেন বাহাদুরগড় বন্দী শিবিরে অবরুদ্ধ সৈনিকগণ তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। ইহাদিগকে বলা যায় আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ইউরোপীয় শাখা।

গত সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে এই শিবিরে কতকগুলি ঘটনা ঘটে। ঘটনাগুলির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য বন্দীশিবির পরিদর্শন করিতে একদল সাংবাদিককে আমন্ত্রণ করা হয়। বন্দীনিবাসে যে সকল ঘটনা ঘটে তাহার তদন্ত করিবার জন্য—দুইটি তদন্ত আদালত করিয়া তাহাদের শ্রেণীবিভাগ করেন এবং তদনুসারে তাঁহাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

বন্দীদের অভিযোগ এই যে, তাঁহাদের প্রতি অতিরিক্ত কঠোরতা প্রদর্শন করা হইয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকজন দুর্ব্বল লোককে দ্বিগুন পরিশ্রম করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। যখন তাঁহারা শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন,

গার্ডগণ তখন করিতে বাধ্য তাঁহাদিগকে উঠাইবার জন্ত সঙ্গীনের খোঁচা ব্যবহার করে।

কয়েকটি খোয়াড়ের বন্দীরা দেওয়ালী উৎসবের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট সময়ের অধিক সময় বাতি জ্বালাইয়া রাখিয়া আজাদ-হিন্দ-ফৌজের অফিসারত্রয় ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ, ক্যাঃ ধীলন এবং ক্যাঃ সেহগলের মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু এই সংবাদ পাইয়া গার্ডগণ আসিয়া পরে বাতি নিভাইয়া দেয়।

বাহাদুরগড় বন্দীশিবিরের বিবরণ

বন্দীশিবিরের আয়তন ৪ বর্গমাইল। ইহা কতকগুলি খোয়াড়ে বিভক্ত। প্রত্যেকটি খোয়াড় কাঁটা তারে ঘেরা। প্রথমে ইহাতে ২,৫০০, লোক ছিল। ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসের শেষে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক বন্দীকে এখানে আনা হয়। ইহারা সকলেই সাধারণ শ্রেণীর। জার্ম্মানদের হাতে যে সকল ভারতীয় সৈন্য বন্দী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেক অফিসার ছিলেন। ইহাদের অধিকাংশকেই জার্ম্মানরা এল এলামিনে বন্দী করে। ইহারা বাহিনীর ভারতীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ইহাদের লইয়া ৯৫০ নং জার্ম্মান রেজিমেণ্ট গঠিত হইয়াছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে আজাদ হিন্দ ফৌজ স্বাধীন বাহিনী রূপে লড়াই করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু উভয় বাহিনীর সৃষ্টিকর্ত্তা। জাপানে যাইবার পূর্ব্বে জার্ম্মানীতে থাকিবার সময় তিনি ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর বীজ বপন করিয়াছিলেন। কিন্তু জার্ম্মানরা ভারতীয় সৈন্যগণকে তাহাদের পক্ষে যোগ দিবার জন্য কোন প্রকার কঠোরতা কিংবা অমানুষিকতা করে নাই।

তদন্তের বিবরণ

বৃটিশ ও ভারতীয় অফিসারদের লইয়া গঠিত দুইটি তদন্ত আদালত প্রত্যহ সৈনিকগণকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। তাঁহারা প্রত্যহ প্রায় ৩০ জনকে প্রশ্নাদি করিতেন। ২৫০০ লোকের মধ্যে পরে ১৮০০ লোক বন্দীশিবিরে রাখা হয়।

তদন্তকারীরা জানিতে চাহিতেন যে, এই সকল ভারতীয় সৈন্য স্বেচ্ছায় জার্ম্মানদের সাহায্য করিয়াছিল কিনা এবং তাহাদের বর্ত্তমান মনোভাব কি। উহাই বিশেষভাবে বিবেচ্য ছিল। যাহারা বলিত যে তাহারা জার্ম্মানদের সহিত যোগ দিয়া ঠিকই করিযাছে এবং ইচ্ছা করিয়াই যোগ দিয়াছিল, তাহাদিগকে কৃষ্ণ বর্ণের ফিতা লাগাইয়া দেওয়া হইত এবং বেতন ও ভাড়া বাজেয়াপ্ত করিয়া চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়া দেওয়া হইত। যাহারা বলিত যে, তাহারা জার্ম্মানদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছিল, তাহাদিগকে ধূসর রংএর ফিতা লাগান হইত। ইহাদিগকে বেতন দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হইত যাহাতে নিজেদের গ্রামে যাইয়া বসবাস করিতে পারে কিংবা চাকুরী খুঁজিয়া লইতে পারে। যাহারা কোনকালে জার্ম্মানদের সাহায্য করিবার ইচ্ছা পোষণ করে নাই, তাহাদিকে শাদা ফিতা লাগান হইত এবং পুনরায় চাকুরীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইত।

বাহাদুরগড় বন্দীশিবিরে বন্দী সৈনিকদের উপর যে কী নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার আরও কয়েক উদাহরণ দেওয়া হইল—

ক্যাম্পের একজন বন্দীকে শাস্তিস্বরূপ শ্রমসাধ্য কাজ করিতে দেওয়া হয়। সে অসুস্থ ছিল বলিয়া ঐ কাজ করিতে অসমর্থ হয়। এই অবস্থায় জনৈক সুবেদার মেজর সঙ্গীনের খোঁচা মারিবার আদেশ দেন। কিন্তু রুগ্ন ব্যক্তির উপর এইরূপ জুলুম করিতে গার্ডটি অসম্মত হয়। তখন সংবাদ পাইয়া বৃটিশ মেজর আসেন এবং পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যক্তিদের অপমান করেন। অপমানিত বন্দীগণ

উক্ত মেজরকে প্রহার করেন। ইহার পরই বৃটিশ সিংহের "প্রেষ্টিজ" অতি মাত্রায় স্ফীত হইয়া উঠে এবং এবারে জনৈক বৃটিশ কর্ণেল আসিয়া কয়েকজন ভারতীয় অশ্বারোহী সৈন্যকে তলব করেন এবং পিঞ্জরস্থ বন্দীদের উপর বেয়নেট চার্জ্জ করিবার আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু এবারও সৈন্যগণ বৃটিশ কর্ণেলের এই অন্যায় আদেশ পালন করিতে অসম্মত হয়। এবারে গুর্খা লইয়া পরীক্ষার পালা। কর্ণেল মনে করিয়াছিলেন আর সব ভারতীয় সৈন্য যাহাই করুক, গুর্খা সৈন্য যে কোন হুকুম তামিল করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু গুর্খারাও বেয়নেট চার্জ্জ করিতে অসম্মত হয়।

কিন্তু ইহাতেও কর্ণেল নিরস্ত হইলেন না। পরদিন একটি শূন্য পিঞ্জরে ৩০০ বন্দীকে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে দুইঘণ্টা পর্য্যন্ত হেঁট মুণ্ডে রাখা হয়। বন্দীগণ ইহার পর যখন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়েন তখন কতগুলি প্রহরী আনিয়া ক্লান্ত লোকদিগের উপর বেয়নেট চার্জ্জ করা হয়। ফলে ৩৪ জন জখম হয়। এক ব্যক্তির দেহের ৭ স্থানে জখম হইয়াছিল।

ব্রহ্মে বন্দী সৈনিকদের উপর অত্যাচার

১৯৪৫ সালের ২৮শে এপ্রিল তারিখে আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকজন সৈন্যকে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মাজনাওয়ে বন্দী করা হয়। তাহাদের সকলকেই একটি স্থানে একত্রিত করা হয় এবং তৎপর তাহাদের উপর আক্রমণ চালান হয়। ফলে তাহাদের মধ্যে চারিজনের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে এবং ত্রিশজন আহত হয়। ইহার পর ঐ দিন প্রায় বেলা ২টার সময় তাহাদিগকে একটি উন্মুক্ত স্থানে রাখা হয় এবং সারাদিন ও সারা-রাত্রি তাহাদিগকে কোন খাদ্য বা জল দেওয়া হয় না। পরদিন সকালে দশ মাইল পথ মার্চ্চ করাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। সৈনিকেরা এই প্রকারে সড়কে গিয়া পৌছিলে সেখান হইতে তাহাদিগকে লরীতে করিয়া থাউনজীনে লইয়া

যাওয়া হয়। এই স্থানে তাহাদের মাহিয়ানার খাতা, ব্যাজ, ঘড়ি, ফাউন্টেনপেন নগদ টাকা এবং অন্যান্য জিনিষপত্র কাড়িয়া লওয়া হয়। এই স্থানে প্রায় এক সপ্তাহ অবস্থান করিবার পর সৈনিকদিগকে মাগুইয়ে লইয়া যাওয়া হয় এবং একটি উন্মুক্ত শিবিরে তাহাদিগকে রাখা হয়। এই শিবিরে তাহাদিগকে রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার মত কোন তাবু বা চালা ঘর ছিল না। প্রত্যহ সকাল ৭টা হইতে বৈকাল ৪টা পর্য্যন্ত বন্দীগণকে কাজ করিতে হইত। এই স্থানে যে খাবার দেওয়া হইত তাহা অত্যন্ত খারাপ। এইভাবে প্রায় ১৫ দিন অতিবাহিত হইবার পর সৈনিকগণকে বিমানযোগে ভারতবর্ষে লইয়া আসা হয়।

দুইমাস পরে তাহাদিগকে নীলগঞ্জ বন্দীশিবিরে লইয়া যাওয়া হয়। সকালে ৭টা হইতে বেলা ১১টা এবং বৈকাল ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত কাজ করিবার জন্য তাহাদিগকে বাহিরে লইয়া যাওয়া হইত। তাহাদের ১৩০০ লোককে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া তাবুর ভিতর রাখা হইত।

ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় বন্দী সৈনিকদের উপর অত্যাচার

আজাদ হিন্দ ফৌজের সে ৪১ জন সৈন্যকে টোকিওতে সৈনিক বৃত্তি শিক্ষার জন্য পাঠান হইয়াছিল। জাপান আত্মসমর্পণ করিলে আমেরিকানরা তাঁহাদিগকে জাপান হইতে ম্যানিলায় লইয়া যায়। ম্যানিলা হইতে তাহাদিগকে একটি বিমানবাহী জাহাজে করিয়া হংকংএ লইয়া যাওয়া হয়। এই জাহাজখানি ইংরাজদের ছিল, ইংরাজ গোলন্দাজরা বন্দীদের ক্যামেরা, ঘড়ি এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিষ ছিনাইয়া লয় এবং তাহাদিগকে গালিগালাজ করে। তাহাদিগকে জাহাজের একটা গুদাম ঘরে রাখা হইয়াছিল। ঘরটা এমনভাবে আবদ্ধ ছিল যে সে ঘর পশুদেরও বাসের অযোগ্য ছিল। দিনে একবার মাত্র ডেকে যাইয়া তাহারা এক ঘণ্টার জন্য বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে

পারিত। তাহাদিগকে আধখানা করিয়া রুটি এবং সামান্য মণ্ড খাইতে দেওয়া হইত।

১০ই নভেম্বর জাহাজ হংকংএ পৌছিলে বন্দীগণের জন্য নিযুক্ত প্রহরীগণ তাহাদের মূল্যবান জিনিষপত্র লুঠ করে। বন্দীদের ষ্ট্যানলী কারাগারে লইয়া গিয়া পৃথক পৃথক ভাবে ছোট ছোট কুঠুরীতে আটকাইয়া রাখা হয়। কোন কোন বন্দীকে নির্ম্মমভাবে প্রহারও করা হয়। কয়েকদিন যাবৎ এই ব্যাপার চলে। কারাগারে বন্দীগণ প্রায় সকলেই পীড়িত হইয়া পড়ে। একটি ছেলে দারুন আমাশয় ভুগিতে থাকে। তাহাকে কোন ঔষধ খাইতে না দিয়া ক্যাষ্টর অয়েল খাইতে দেওয়া হয়। কারা প্রাচীরের অন্তরালে বহুদিন কষ্টভোগের পর বন্দীগণকে মাদ্রাজে প্রেরণ করা হয়।

বন্দুকের গুলী ও লাঠি চালনার আদর্শ, সংযম ও ধৈর্য্যের কাহিনী পুরাতন হইয়া গিয়াছে। সৈন্য এবং পুলিশ আমাদের দেশের নিরস্ত্র ব্যক্তিদের উপর যখনই গুলী ছোড়ে অথবা লাঠি চার্জ্জ করে, তাহা তাহারা একেবারে নিরুপায় হইয়াই করে, কিন্তু তাহাও তাহাও অত্যন্ত সতর্কতার সহিত এবং মৃদুভাবে—যতটুকু না করিলে চলে না, ঠিক ততটুকু। অত্যন্ত উত্তেজনার মধ্যে সৈন্য ও পুলিশ কিরূপ মাটির মানুষের মত শান্ত ও শীতল থাকে, তাহাই বৃটিশ শাসকগণ আমাদিগকে শুনাইয়া থাকেন এবং তাঁহারা নিন্দাভাজন না হইয়া যে অতীব প্রসংশা লাভেরই যোগ্য—দেশবাসীকে ইহাই বিশ্বাস করিতে বলা হয়। কিন্তু মৃদু লাঠি, সতর্কতার সহিত গুলীবর্ষণ এবং সৈন্য ও পুলিশের ধৈর্য্যগুনের পরিচয় দেশবাসী পাইতে অভ্যস্ত। তাহাতে এই ধরণের সরকারী কৈফিয়তের কোন মূল্যই তাহাদের নিকট থাকে না। স্বাধীনতাকামী বন্দীদের দমন করিবার জন্য বিদেশী শাসকবর্গ যে কোন হীন পন্থাই অবলম্বন করিয়া থাকে ইহা কাহারও অজ্ঞাত নয়। লাহোর, লালকেল্লা, নীলগঞ্জ প্রভৃতির নৃশংস ঘটনাবলীই তাহার জলন্ত প্রমাণ।

আজাদী সাংবাদিকের দুর্দ্দশা—গত ১১ই জানুয়ারী (১৯৪৬) আজাদ হিন্দ ফৌজের মোট ৬০৫ জন লোককে ব্যাঙ্কক হইতে জাহাজে করিয়া ভারতে চালান দেওয়া হয়। আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের কয়েকজন মন্ত্রী এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের কয়েকজন নেতা ব্যাঙ্কক হইতে উক্ত জাহাজে আরোহণ করেন। কিন্তু ভারতে আসিবার পথে জোর করিয়া তাহাদিগকে সিঙ্গাপুরে নামাইয়া দেওয়া হয়। ঘটনার বিবরণ প্রকাশ, তাহাদের উপর নানাবিধ অত্যাচারও চলে। এই সকল লোকদিগকে ভারতে আনিয়া বিচার করিবার কথা ছিল। কিন্তু পরে সিঙ্গাপুরেই তাঁহাদের বিচার করা হইবে বলিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট স্থির করেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানের পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে—৩৫০ জন সাধারণ বেসামরিক নাগরিক ছিলেন; অবশিষ্ট লোকেরা বৃটিশ ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর সৈন্য ছিলেন। ইহাছাড়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণও এই দলে ছিলেন :—

(১) ব্যাঙ্ককের স্বাধীনতা লীগের সভাপতি শ্রীযুক্ত ঈশ্বর সিং, (২) মিঃ ডি, এম, খান, (৩) উপদেষ্টা মিঃ করিম গণি, (৪) উপদেষ্টা মিঃ পরমানন্দ, (৫) পণ্ডিত রঘুনাথ শর্ম্মা, (৬) ব্যাঙ্ককের ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিবংশ লাল, (৭) মিঃ আকবর আলী, (৮) শ্রীযুক্ত এস, এম, ঘোষ, (৯) শ্রীযুক্ত ডি, প্রকাশ. (১০) শ্রীযুক্ত পি, এন, শর্ম্মা, (১১) শ্রীযুক্ত প্রীতম সিং (১২) শ্রীযুক্ত যশোবন্ত সিং (১৩) শ্রীযুক্ত অমর সিং ও অন্যান্য তিন জন।

৯ই জানুয়ারী ব্যাঙ্ককস্থ ব্যাণ্ডওয়াং জেলে আজাদ হিন্দ ফৌজের আবদ্ধ নেতৃবৃন্দ ও সৈন্যদের জানান হয় যে, তাঁহাদের ভারতবর্ষে লইয়া যাওয়া হইবে। বস্তুতঃ ১১ই তারিখ তাঁহারা যাত্রা করেন। তাঁহাদের কথা দেওয়া হইয়াছিল যে, তাঁহাদের ভারতে লইয়া যাওয়া হইবে। কিন্তু সিঙ্গাপুরে আসিয়া তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক জাহাজ হইতে নামাইয়া দেওয়া হয় এবং লাঠি-

দ্বারা ইঁহাদিগকে নির্ম্মম ভাবে প্রহার করা হয়, এবং তাঁহাদের জিনিষপত্রও লুণ্ঠন করা হয়। এমন কি কয়েকজনকে জাহাজ হইতে ছুড়িয়া জেটিতে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ এবং মন্ত্রিসভার লোকদের ১২ই জানুয়ারী এবং আজাদ-হিন্দ ফৌজের লোকদের ১৯শে জানুয়ারী সিঙ্গাপুর জেলে লইয়া যাওয়া হয়।

বৃটিশ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীদের প্রতি যে আচরণ করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত অপমানজনক। সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশণ কোম্পানীর জাহাজখানির অফিসারগণ কিন্তু "জয়হিন্দ" ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া ইঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করেন।

আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপনের পরিণাম

সিঙ্গাপুরের ভারতীয়গণ স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজন করেন। প্রভাতে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা সকল ভারতীয়ের গৃহে এবং ব্যবসাক্ষেত্রে উত্তোলন করা হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিদ্ধস্ত সমর-স্মৃতি স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষের উপর জনগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। বালক সেনা এবং বালিকা সেনার সভ্যও সভ্যারা জাতীয় পতাকা হস্তে সহরের প্রধান রাস্তাগুলি পরিভ্রমণ করিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজের সমরস্মৃতি স্তম্ভের নিকট উপস্থিত হয়। স্মৃতিস্তম্ভের ধ্বংসাবশেষের উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন কালে জনতা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়ায় এবং সকলে মিলিয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে থাকেন। শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে দুই মিনিট কাল সকলে নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন।

এই সময় দুইজন বৃটিশ অফিসার—ঐস্থানে উপস্থিত হইয়া—অরুমুগম, আনন্দ সিং এবং কৃষ্ণ স্বামীকে গ্রেপ্তার করে। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাঁহাদিগকে পরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

সামরিক আদালতে উপস্থাপিত দলিল

আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের বিচার উপলক্ষে দিল্লীর লাল কেল্লায় সামরিক আদালতে আজাদ-হিন্দ সরকারের যে সমস্ত দলিল পত্র উপস্থিত করা হয় তাহার দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, পৃথিবীর যে কোন সভ্যদেশের শাসনতন্ত্র যে সমস্ত প্রয়োজনীয় নিয়ম ও শৃঙ্খলার উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত ও কার্য্যকরী করা হয়—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টও সেই সমস্ত নিয়ম ও শৃঙ্খলার উপরই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের নিম্নলিখিত—দলিল পত্র হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয়:—

ভারতীয় জাতীয় বাহিনী

বিশেষ আদেশ নং ১, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪২।

ক্যাপ্টেন মোহন সিং, ভারতীয় জাতীয় বাহিনী জি, ও, সি, কর্ত্তৃক।

প্রমোশন:

জি, ও, সি, আনন্দের সহিত নিম্নলিখিত সেকেণ্ড লেঃ পদাধিকারের ব্যক্তিবর্গকে ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪২, হইতে প্রমোশন দিতেছে:

	প্রাক্তন পদ এবং ইউনিট।
শাহ্ নওয়াজ খান	ক্যাপ্টেন ১।১৪ পাঞ্জাব।
পি, কে, সেহগল	ক্যাপ্টেন ২।১০ বালুচ।
গুরুবক্স সিং ধীলন	ক্যাপ্টেন ১।১৪ পাঞ্জাব।
বাবু রাম	সুবেদার মেজর ১।১৪ পাঞ্জাব।

লেঃ পি, ডব্লু, কেজ।

(স্বাঃ) এম, জেড, কিয়ানী, মেজর।

ভারতীয় জাতীয় বাহিনী, প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র।

বিশেষ আদেশ নং ১২, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৪২

জেনারেল মোহন সিং, ভারতীয় বাহিনীর জি, ও, সি,।

প্রমোশন :

ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর জি, ও, সি, আনন্দের সহিত ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের কর্ম্মপরিষদের সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে নিম্নলিখিত প্রমোশন দিতেছেন :

১৫ই অক্টোবর, ১৯৪২ হইতে লেঃ কর্ণেল হইবে :—

নাম এবং পদাধিকার	ইউনিট।
মেজর শাহ্ নওয়াজ খান	এইচ, কিউ, ১নং হিন্দ ফিল্ড ফোর্স গ্রুপ।
ক্যাপ্টেন পি, কে, সেহগল	রি-ইনফোর্সমেণ্ট।
ক্যাপ্টেন গুরুবক্স ধীলন	

(সাঃ) এম, জেড, কিয়ানী, লেঃ কর্ণেল।

চীফ অফ জেনারেল ষ্টাফ,

ভারতীয় জাতীয় বাহিনী, প্রধান কার্য্যালয়।

* স্পেশ্যাল অর্ডার (১২নং) ১৫ই অক্টোবর ১৯৪২ জেনারেল মোহন সিং, জি, ও, সি, আজাদ হিন্দ ফৌজ।

সেনাবিভাগ :

প্রমোশন : ভারতীয় ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সভাপতির' অনুমোদন সাপেক্ষে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর ; জি, ও, সি, নিম্নলিখিত পদোন্নতির নির্দ্দেশ দিতেছেন :—

মেজর শাহ্ নওয়াজ খাঁ ১৫ই অক্টোবর হইতে লেঃ কর্ণেল হইবেন।

ক্যাপ্টেন পি, কে, সেগল এবং ক্যাপ্টেন ধীলন অক্টোবর হইতে মেজর হইবেন।

স্বাঃ এম, জেড, কিয়ানী ;

আজাদ হিন্দ ফৌজ এ্যাক্টের পরিবর্ত্তনের খসড়া

নব ধারার ৪র্থ অংশের পরে নিম্নলিখিত অংশ বসিব :

(৫) সৈন্য সিপাহী কম্যাণ্ডার এন, সি, ও,	১৬০ দিন (৬ মাস) পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড। সশ্রম অথবা বিনা-শ্রমে ৬০ দিন পর্য্যন্ত সকল পদের জন্যই মকুব হইবে।
মেজর পদাধিকারী পর্য্যন্ত অফিসার	যদি অভিযুক্ত অফিসার কোর্ট মার্শালের বিচার অপেক্ষা সরাসরি বিচার প্রার্থনা করে, তবে পরবর্ত্তী নিম্নপদে নামাইয়া দেওয়া অথবা সতর্ক করিয়া দেওয়া হইবে।

আইনের ৫৪ ধারায় বর্ণিত স্কেল অনুযায়ী ফিল্ড অফিসার ব্যতীত অন্যান্ত অফিসারদের ১৫ দিন পর্য্যন্ত নির্জ্জন কারাবাসের দণ্ড দেওয়া চলিবে।

এতদ্ব্যতীত সমুদয় পদাধিকারীদের ৩০ দিনের অনধিকালের মাহিনা বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দেওয়া চলিবে।

শারিরীক দণ্ডবিধান:

সিপাহী এবং এন, সি, ও'দের মধ্যে গুরুতর অনিয়মানুবর্ত্তীতার জন্য তিনি আইনের ৫৫ ধারার বিধি অনুযায়ী ৩ সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে ৩ বেত্রাঘাতের অনধিক বেত্রাঘাতের আদেশ দিতে পারেন।

(৬) সামরিক ব্যুরোর সিপাহী ডাইরেক্টার এন, সি, ও,	নয় মাস পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড। অথবা ৯০ দিন পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডসহ পরবর্ত্তী নিম্নপদে বহাল।
ফিল্ড অফিসার সহ যাবতীয় অফিসার	পরবর্ত্তী নিম্নপদে বহাল অথবা কঠিনভাবে সতর্ক অথবা শুধু সতর্ক করা।

আইনের ৫৪ ধারা অনুযায়ী ফিল্ড অফিসার এবং অন্যান্ত অফিসারদের প্রতি ১ মাস পর্য্যন্ত নির্জ্জন কারাবাসের আদেশ।

এতদ্ব্যতীত তিনি যাবতীয় পদে ৬০ দিনের অনধিককালের মাহিনা বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন।

শারিরীক দণ্ডবিধি:

সিপাহী এবং এন, সি, ওদের মধ্যে গুরুতর অনিয়মানুবর্ত্তিতার জন্য তিনি

আইনের ৫৫ ধারার বিধি অনুযায়ী ৪ সপ্তাহের জন্য প্রতি সপ্তাহে ৩ বেত্রাঘাতের অনধিক বেত্রদণ্ডাদেশ দিতে পারেন।

(৭). ক্ষুদ্র সৈন্যদলের কম্যাণ্ডার

(ক) কম্যাণ্ডিং অফিসার	এই ধারার (৪) উপধারায় বর্ণিত রেজিমেণ্ট অথবা গ্রুপ কম্যাণ্ডারের ক্ষমতা।
(খ) ২০০এর অধিক কিন্তু ৫০০এর কম সৈন্যদলের কম্যাণ্ডিং অফিসার	এই ধারার (৩) উপধারায় বর্ণিত ফিল্ড অফিসারের ক্ষমতা।
(গ) ৫০এর অধিক কিন্তু ২০০এর কম সৈন্যদলের কম্যাণ্ডিং অফিসার	এই ধারার (২) উপধারায় বর্ণিত কম্যাণ্ডিং অফিসারের ক্ষমতাসমূহ।
(ঘ) ৫০এর কম সৈন্যদলের কম্যাণ্ডিং অফিসার	এই ধারার (১) উপধারায় বর্ণিত অফিসারের ক্ষমতা।
(ঙ) সৈন্যদলের কম্যাণ্ডিং এন, সি, ও,	ব্যারাকে সাতদিন পর্য্যন্ত আটক অথবা প্রহরী সৈন্য অথবা ক্লান্তির জন্য আরও সাত দিন। যখন আরও বেশী শাস্তির প্রয়োজন তখন তিনি অভিযুক্তকে অফিসার কর্ত্তৃক পরিচালিত নিকটস্থ ইউনিট অথবা সৈন্যদলের নিকট প্রেরণ করিবেন।

যখন দলের কম্যাণ্ডার মনে করিবেন যে তিনি যে দণ্ডাদেশ দিতে পারেন তাহা অপেক্ষা লঘু দণ্ড দিলেই সুবিচার করা হইবে তখন তিনি আইনের ৫০ ধারা অনুযায়ী কোন বিশেষ ক্ষেত্রে নিজ বিবেচনা অনুযায়ী লঘু দণ্ডাদেশ দিতে পারেন। এইরূপ দণ্ডাদেশ :—

(১) লাইনে ২৮ দিন পর্য্যন্ত আটক।

(২) ৭ দিন পর্য্যন্ত অতিরিক্ত প্রহরীকার্য্য।

অথবা ক্লান্তিকর কার্য্য।

মিলিটারী বুরো গেজেট

নং এ।৪

ক্রমিক সংখ্যা ৮ তারিখ ১৭ই এপ্রিল, ১৯৪৩

সংযুক্ত

(১) নিম্নলিখিত লিষ্টে ("ই নং) বর্ণিত অফিসারদের ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে সংযুক্ত করা হইল।

ক্রমিক সংখ্যা ৯

নিয়োগ

(২) আদেশের সহিত প্রেরিত (ক), (খ); (গ) ও (ঘ) তালিকায় বর্ণিত অফিসারদের ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষ ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে নিয়োগ করা হইল।

ক্রমিক সংখ্যা ১১

বদলী এবং কার্য্য নির্দ্দেশ

নিম্নলিখিত বদলী এবং কার্য্যের নির্দ্দেশ দেওয়া হইল।

র‍্যাঙ্ক নাম কবে হইতে

(স্বাঃ) পি, কে, সেগল, মেজর মিলিটারী সেক্রেটারী।

মিলিটারী সেক্রেটারীর শাখা

নিয়োগ

ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর জি, ও সি নিম্নলিখিত নিয়োগ করিতেছেন। লেঃ কর্ণেল শাহ নওয়াজ খাঁ ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪২ সাল হইতে অফিসার কেডেট ট্রেনিং স্কুলের ভারপ্রাপ্ত হইলেন।

বদলী এবং কার্য্য নির্দ্দেশ

নিম্নলিখিত বদলী এবং কার্য্যনির্দ্দেশ দেওয়া হইল :—

লেঃ শাহ নওয়াজ খাঁ ২৬-১১-১৯৪২ হইতে রিইনফোর্সমেণ্ট, জিপি হইতে আই, এন, এ হেড কোয়াটার্স, ক্যাডেট ট্রেনিং স্কুল।

(স্বাঃ) এন, এস, ভগত
লেঃ কর্ণেল
আই, এন, এ-র মিলিটারী সেক্রেটারী,

মিলিটারী ব্যুরো গেজেট

ক্রমিক সংখ্যা—৭ তারিখ, ১০ই এপ্রিল ১৯৪৩

নিম্নলিখিত নিয়োগ ও বদলী করা হইল :—

র‍্যাঙ্ক নাম

মেজর পি, কে সেহগল ১নং হেড কোয়ার্টার হইতে ডি, এম, বি-র গ্রুপ
গ্রুপ অফিসে—২৬-২-৪৩ হইতে।
লেঃ কর্ণেল শাহ নওয়াজ খাঁ রিইনফোর্সমেণ্ট হইতে ঐ
গ্রুপে—২৬-২-৪৩ হইতে।

বিদাদরী—

১০ই এপ্রিল, ১৯৪৩ (স্বাঃ) পি, কে, সেগল

অঙ্গীকার পত্র

(১) আমি এতদ্বারা স্বেচ্ছায় এবং স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সিভিল ভলাণ্টিয়ার্স-এ যোগদান করিতেছি।

(২) আমি দৃঢ়তার সহিত ও আন্তরিকতার সহিত নিজেকে ভারতবর্ষের কার্য্যে উৎসর্গ করিলাম এবং এতদ্বারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য জীবন পণ করিলাম। আমার যথাসাধ্যভাবে এমনকি আমার জীবন বিপন্ন করিয়াও আমি ভারতের সেবা করিব এবং ভারতের মুক্তি আন্দোলনে সাহায্য করিব।

(৩) দেশ সেবা করিতে গিয়া আমি কোনরূপ আত্ম-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য করিব না।

(৪) আমি সকল ভারতীয়কে জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা অথবা প্রদেশ নির্ব্বিশেষে আমার ভাই ও ভগ্নীরূপে গণ্য করিব।

(৫) আমি বিশ্বস্তভাবে এবং বিনা দ্বিধায় ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের আদেশ ও উপদেশ মানিয়া চলিব এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিব। যখন যাহার আদেশাধীন থাকিব তখন তাহার ন্যায়সঙ্গত এবং আইনসঙ্গত আদেশ পালন করিব।

তারিখ.........১৯

স্থান— (স্বাক্ষর)

আজাদ হিন্দ ফৌজ সৈন্যদের পুরস্কার

পূর্ব্বাপর উল্লেখের ধারা অনুযায়ী পুরস্কার দ্বারা আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্যদের অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার কর্ত্তৃক ভূষিত করা হইবে :—

১। শহীদ-ই-ভারত

২। শের-ই-হিন্দ

৩। সর্দ্দার-ই-জঙ্গ

৪। ভাই-ও-হিন্দ

৫। তামঘা-ই-বাহাদুরী

৬। তামঘা-ই-শত্রুনাশ

(২) ব্যক্তিগত সাহসিকতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং রণক্ষেত্রে নৈপুণ্যের পরিচয় হিসাবে ভবিষ্যতে দুই রকম সর্দ্দার-ই-জঙ্গ মেডেল দেওয়া হইবে।

এখন পর্য্যন্ত ঐ মেডেলের কেবলমাত্র প্রথম রকম অনুযায়ী পুরস্কার দেওয়া হইবে।

(৩) আজাদ হিন্দের যে সকল সদস্য রণক্ষেত্রে বিচক্ষণতা এবং প্রশংসনীয় কার্য্য প্রদর্শন করিলে অথচ পুরস্কারের উপযুক্ত গুণাবলীর পূর্ণ অধিকার থাকিবে না তাহাদের অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের নেতা কর্ত্তৃক সনদ-ই-বাহাদুরী সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে।

তামঘা-ই-শত্রুনাশ পুরস্কার নিম্নলিখিতরূপে দেওয়া হইবে :—

"ক" শ্রেণী : আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সকল সদস্য ব্যক্তিগত যুদ্ধে অথবা দলগত যুদ্ধে যেখানে ব্যক্তিগত সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে সেক্ষেত্রে কোন বৃটিশ অথবা মার্কিন অফিসার মৃত অথবা জীবিত বন্দী করিতে সক্ষম হইবে তাহাদিগকে ইহা প্রদত্ত হইবে।

"খ" শ্রেণী : আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সকল সদস্য ব্যক্তিগত যুদ্ধে অথবা দলগত যুদ্ধে নিজ বুদ্ধিমত্তা এবং সাহসিকতা দর্শাইয়া বৃটিশ অথবা মার্কিন সৈন্য নিহত অথবা বন্দী করিতে অতিরিক্ত সাহস এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিবে তাহাদের ইহা দেওয়া হইবে।

তামঘা-ই-বাহাদুরী-র পরে "তামঘা-ই-শত্রুনাশ" দেওয়া হইবে। এই মেডেল অন্য কোন গুণের জন্য প্রদত্ত পুরস্কারের সহিত আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্যদের দেওয়া হইবে।

'তামঘা-ই-শত্রুনাশ' মৃত্যুর পরেও দেওয়া হইবে।

অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার স্থির করিয়াছে যে, ভারতের বাহিরে অথবা ভারতের মধ্যে যে ব্যক্তি, আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্য হউক বা না হউক ভারতের মুক্তি আন্দোলনে যোগদান এবং সাহায্য করিয়া উপরোক্ত পুরস্কারের গুণাবলীর অধিকারী হইবে তাহাদেরও এই মেডেল দেওয়া যাইবে।

ভারতের বাহিরে অথবা ভিতরে থাকিয়া বৃটিশ অথবা মার্কিন সৈন্য ছাড়া যাহারা ভারতের স্বাধীনতার পথে শত্রুবিশেষ তাহাদের জীবিত বন্দী অথবা হত্যা করিয়া ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনে সাহায্য করিবে তাহাদেরও এই মেডেল দেওয়া হইবে।

ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর পুনর্গঠনের নীতি

(১) ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সমুদয় ফর্মেশন সর্ব্বপ্রথম পুনর্গঠিত হইবে।

সংমিশ্রণ দ্বারা ইউনিট এবং সাব-ইউনিটগুলি শক্তিপূর্ণ করা হইবে।

ঘাটতি হইলে রি-ইনফোর্সমেণ্ট ক্যাম্প হইতে তাহা পূরণ করা হইবে। এইগুলিকে যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ ইউনিট অথবা সাব-ইউনিট হিসাবে গঠিত হইবে।

উদাহরণ স্বরূপ, পুনর্গঠনের পরে গান্ধী রেজিমেণ্টের ৪র্থ ব্যাটেলিয়ানে তিন প্লেটুন শিখ এবং এক দল জাট প্রয়োজন। গান্ধী রেজিমেণ্টের অধ্যক্ষ, তাহার দাবী সেনা নায়কগণের নিকট জানাইবে এবং সে পুনরায় তাহা ডি, এম, বি-র নিকট পাঠাইবে এবং সে রি-ইনফোর্সমেণ্টের অফিসারের নিকট জানাইবে।

সোজাসুজিভাবে রি-ইনফোর্সমেণ্ট হইতে লোক বাছাই করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

(২) সুবিধা হইলেই রি-ইনফোর্সমেণ্ট ক্যাম্প গঠিত হইবে। সোয়েনানের যুদ্ধ বন্দীদের মধ্য হইতে এবং প্রধানদেশ হইতে আগত আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বেচ্ছাসেবকদের সেখানেই রাখা হইবে এবং ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ঐরূপ ইউনিট অনুযায়ী সংগঠিত করা হইবে।

(৩) রি-ইনফোর্সমেণ্টের অধ্যক্ষ তাহার অধীনস্থ এইরূপ লোকদের সংগঠন শিক্ষা, নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং শাসনের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকিবেন।

তিনি তাহার ক্যাম্পে আগত প্রত্যেক ব্যক্তির আসিবার তারিখ, মূল ইউনিট, যেখান হইতে আসিয়াছে তাহার নাম এবং শেষ পর্য্যন্ত কিভাবে কাজে লাগান হইল তাহার সম্পূর্ণ রেকর্ড রাখিবেন।

(৪) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জ্ঞাতার্থে জন্য জানান হইতেছে যে, পি, এম এবং শিখ স্বেচ্ছাসেবক অত্যন্ত কম সংখ্যায় আসিতেছে বলিয়া তাহাদের স্থলে জাট এবং গুজ্জার কম্পানী স্বীকার করিতেই হইবে।

(৫) এই পত্রানুযায়ী সেনানায়কগণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাহাদের ঘাটতি এই সকল হেডকোয়াটার্সে জানাইবেন।

(৬) মনে হয় সেপারেশন ক্যাম্প হইতে ফিরিয়া কোন স্বেচ্ছাসেবক তাহাদের ইউনিটে যোগদান করিবে না,—কাজেই এই চিঠি এখন হইতেই কার্য্যকরী হইবে।

(স্বাঃ) শাহ নওয়াজ খাঁ
লেঃ কর্ণেল।

সোয়েনান,
২২-৩-৪৩

বিশেষ গোপনীয় নং—১০৭।১।৬।জি,

ডি, এ, বি ; আই, আই-এল অফিস

ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সোয়েনান, ৩০শে মার্চ্চ, ১৯৪৩

কার্য্যালয়ের প্রতি

বিদাদরী—

ডেজিগনেশনস্—ইউনিট এবং ফর্ম্মেশন।

ভবিষ্যতে গোপনীয়তার জন্য স্পেশ্যাল সার্ভিস গ্রুপকে 'বাহাদুর গ্রুপ' বলা হইবে। ইহা কোন ইউনিট অথবা ফর্ম্মেশনের রুটিন অর্ডারের মধ্যে প্রকাশ করা চলিবে না। ইহা এরূপভাবে জানাইতে হইবে যাহাতে প্রত্যেক সৈন্য এই পরিবর্ত্তনের তথ্য বুঝিতে পারে।

(স্বাঃ) শাহ নওয়াজ খাঁ

ইয়াকুরু কিকানের নিকট লেঃ কর্ণেল

এক কপি— সি, জি, এস ; ডি, এম, বি ; আই, আই, এল অফিস।

নং ১০৭।১।ইউ।জি

সোয়েনান, ৩রা এপ্রিল, ১৯৪৩

অফিসার কম্যাণ্ডিং,

রি-ইনফোর্সমেণ্ট গ্রুপ

ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর প্রধান কার্য্যালয়ের

বিদাদরী

বিষয় :—রি-ইনফোর্সমেণ্ট গ্রুপের পুনর্গঠন।

রেঃ—আপনার ১লা এপ্রিল, ১৯৪৩ নং-আর।৭।৯ পত্র।

আপনার উক্ত পত্রে উল্লিখিত প্রণালী যতদূর সম্ভব পালন করা হইবে। অবশ্য 'বাহাদুর' এবং 'ইণ্টেলিজেন্স' গ্রুপের লোকদের জন্য পদবিচার করিতেই হইবে।

(স্বাঃ) শাহ নওয়াজ খাঁ

লেঃ কর্ণেল

সি, জি, এস ; ডি, এম, বি ; আই, আই, এল অফিস।

নং—১০৪।৫ ১।জি

হেডকোয়ার্টার্স, সোয়েনান, ২৭শে মে, ১৯৪৩

ভারতীয় জাতীয় বাহিনী

বিষয়।—'খ' এবং 'ক' শ্রেণীর কর্ম্মনিয়োগ।

ইহা জানা গিয়াছে যে, কোন কোন ইউনিট তাহাদের সকল 'খ' এবং 'গ' শ্রেণীর লোকদের রি-ইনফোর্সমেণ্ট গ্রুপে পাঠান হইতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে লোকদের সেখানে কেবলমাত্র সুস্থ হইবার জন্য পাঠান হইয়াছে। বর্ত্তমানে রি ইনফোর্সমেণ্ট গ্রুপের এমন অবস্থা হয় নাই যাহাতে 'খ' ও 'গ' শ্রেণীর লোকদের কোনরূপ সুবিধা দিতে পারে। কারণ রান্নার বাসনপত্র, থাকিবার জায়গা প্রভৃতির নানা অসুবিধা আছে।

ইহা ছাড়া ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে এখনও ২০০০ লোক কম আছে এবং এ-পর্য্যন্ত ইহা পূরণ করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইতেছে। সকল ইউনিট এবং ফর্ম্মেশনের কমাণ্ডারগণকে সেজন্য এই অসুবিধা দূর করিতে তাহাদের পূর্ণ

সহযোগিতা এবং সাহায্য দিতে অনুরোধ করা হইতেছে। তাহা এইরূপে হইতে পারে :—

(ক) রি-ইনফোর্সমেণ্ট গ্রুপে পাঠাইবার জন্য প্রত্যেকটি ভাল করিয়া বিবেচনা করা। যতদূর সম্ভব কেবলমাত্র স্থায়ী 'গ' শ্রেণীর লোক পাঠান উচিত।

(খ) 'খ' ও 'গ' অস্থায়ী শ্রেণীর লোকদের বিশেষ যত্ন, বিশ্রাম এবং খাদ্য দিয়া তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। এতদুদ্দেশ্যে ইউনিট ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড হইতে খরচ করিতে হইবে এবং যাহা খরচ হইবে তাহাই যেন ভালভাবে খরচ হয়।

'খ' এবং 'গ' শ্রেণীর লোকদের যাহাদের ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে লওয়া সম্ভব হয় নাই, তাহাদের খুব সম্ভব যুদ্ধবন্দী হিসাবে পুনরায় তাহাদের শিবিরে পাঠান হইবে। স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইহা অত্যন্ত কঠোর এবং বেদনা দায়ক সিদ্ধান্ত, কিন্তু ইহা না করিয়াও কোন উপায় নাই। ডি, এম, বি মনে স্থির জানেন ইউনিট এবং ফর্মেশন কম্যাণ্ডারগণ ইহা উপলব্ধি করিবেন যে, অবস্থানুযায়ী লোকদের প্রতি আমাদের নৈতিক কর্ত্তব্য যতদূর সম্ভব কম সংখ্যক লোককে পুনরায় যুদ্ধবন্দী করিবার জন্য রি-ইনফোর্সমেণ্টে প্রেরণ করা।

(স্বাঃ) শাহ নওয়াজ খাঁ

লেঃ কর্ণেল

সি, জি, এস ; ডি, এম, বি ; আই, আই, এল অফিস।

নং—১০৭।৭।৪।জি

হেড কোয়াটার্স, সোয়েনান—৪ই সেপ্টেম্বর, ,৪৩

১নং, আই, এন, এ।

বিষয় :—২নং এম, টি, কোং—সংগঠন

উপরোক্ত কোম্পানী শীঘ্রই যানবাহন চলাচলের কাজ করিতে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর কোং হিসাবে ব্রহ্মদেশে যাইবে। ইহাদের কাজ হইবে আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য সৈন্য, খাদ্য, রসদ অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি বহন করা।

যেহেতু আজাদ হিন্দ ফৌজের একাধিক ডিভিসনের জন্য কাজ করিবে সেই হেতু ইহা সুপ্রিম হেড কোয়ার্টার্সে-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসাবে কাজ করিবে। যেহেতু বর্ত্তমানে কেবলমাত্র আপনার ডিভিশনই বর্মায় যাইতেছে, সেইহেতু এই কোম্পানী পুনরাদেশ পর্য্যন্ত আপনার অধীনেই থাকিবে।

(স্বাঃ) শাহ নওয়াজ খাঁ

লেঃ কর্ণেল

সি, জি, এস ; আই, এন-এর হেডকোয়ার্টার্স

সুপ্রিম কম্যাণ্ড।

ক্যাপ্টেন ডি, সি, ভাণ্ডারী, ও, সি, ৫৯২নং ইউনিট, আজাদ হিন্দ ফৌজ কর্ত্তৃক রুটিন আদেশ

বর্ম্মা, ১৫ই মার্চ্চ, ১৯৪৪

(১৩৪) নিয়োগ অফিসার।

(ক) (১) কর্ণেল আজিজ আহমেদ খাঁর অনুপস্থিতিতে কর্ণেল শাহ নওয়াজ

খাঁ সাময়িক ভাবে ৫০২নং ইউনিট এর ভার গ্রহণ করিবেন। যেদিন হইতে তিনি ভার গ্রহণ করিবেন সেদিন হইতেই আদেশ চালু হইবে।

(২) কর্ণেল শাহ নওয়াজ খাঁ কে ৪০২নং ইউনিটের নেতৃত্বপদে নিয়োগের ফলে লেঃ কর্ণেল আর, এম, আর্শেদকে ১৫২ নং ইউনিটের অস্থায়ী নেতৃত্বে ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫ হইতে নিয়োগ করা হইল।

(স্বাঃ) ডি, সি, ভাণ্ডারী, ক্যাপ্টেন
ও, সি, ডিটেলস্ ৫০২ নং ইউনিট,
আজাদ হিন্দ ফৌজ।

কর্ণেল শাহনওয়াজ খাঁ, ৪৩১নং ইউনিট কমাণ্ডার আজাদ হিন্দ ফৌজ কর্ত্তৃক বিশেষ আদেশ

১২নং

শাসন বিভাগ

৩২। দলত্যাগ—প্রাণদণ্ডাদেশ

২৫২নং ইউনিটের নিম্নলিখিতগণকে উল্লিখিত অপরাধে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল :—

নং	৪২৪৪০	সিপাহী	হরি সিং
„	৪২৫৭০	„	তুলীচাঁদ
„	৪২৫৩৭	„	দারিও সিং
„	৪১৯৬১	„	ধরম সিং

যেহেতু, তাহারা ২রা মার্চ্চ, তারিখে প্রেরিত ইউনিট পেট্রোল কর্তৃক আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫ তারিখে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দলত্যাগ করে।

(২) আই, এন এ এ্যাক্ট ২৯ (গ) ধারা।

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শত্রুর সহিত পত্রবিনিময় করে ;

যেহেতু,—তাহারা যুদ্ধকালে ২৮শে ফেব্রুয়ারী, (১৯৪৫) তারিখে একজন নাগরিকের মারফৎ শত্রুর সহিত সংযোগ স্থপেনের চেষ্টা করে।

সেইহেতু,—২৭শে ফেব্রুয়ারী, (১৯৪৫) তারিখে লিখিত এক পত্রানুযায়ী আজাদ হিন্দ ফৌজের সুপ্রিম কমাণ্ডার কর্তৃক ২নং ডিভিসনের কমাণ্ডারের উপর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ৫৩১নং ইউনিটের অস্থায়ী কমাণ্ডার লেঃ কর্ণেল পি, কে, সেইগল উক্ত বিচারে ৬ই মার্চ্চ, ১৯৪৫, প্রাণ দণ্ডাদেশ দিয়াছেন।

এই আদেশ প্রত্যেক সৈন্যের নিকট পড়িয়া শোনান হইবে।

(স্বা :)শাহ নওয়াজ খাঁ,
কমাণ্ডার, ৫৩১নং ইউনিট, আজাদ হিন্দ ফৌজ।

এইচ, ও, ডিভিসন,
২রা এপ্রিল, ১৯৪৫

মেজর কাওয়াবারার নিকট—

সংবাদ

২নং ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেণ্টের নিকট এইমাত্র টেলিফোন সংবাদ ও পাওয়া গিয়াছে যে:—

(১) আজ সকাল টেলিফোন লাইন পাঁচ স্থানে কাটা হইয়াছিল। তাহা সারান হইয়াছে।

(২) আজ সকাল হইতেই শত্রুর ট্যাঙ্ক বাহিনী সাজোয়া বাহিনী এবং লরী বাহিত সৈন্যদলের কর্ম্মতৎপরতা লেগী সীমান্তে দেখা দিয়াছে।

শত্রুর একদলের প্রায় ৬০ জন লেগী হইতে প্রায় ৪০০ মিটার দূরে আসিয়া পড়িয়াছিল। আমাদের লোকরা তাহাদের লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোড়ে এবং তাহারা হটিয়া যায়। ট্যাঙ্ক-এর সাহায্যে পুনরায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(৩) অদ্য প্রত্যুষে লেগীতে ১৩টি বিমান বোমা ফেলিয়াছে এবং অনেক্ষন ধরিয়া মেশিনগান চালাইয়াছে। লেগী পুড়িয়া গিয়াছে। ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর ১জন গুরুতর ভাবে এবং ৫জন সামান্য আহত হইয়াছে।

২—৪—১৯৪৪ (স্বাঃ) শাহ নওয়াজ খাঁ (কর্ণেল)

গোপনীয়— ক্রমিক সংখ্যা—১

৬ই এপ্রিল, ১৯৪৫

বিষয় :—যুদ্ধ নিয়ন্ত্রন। সময়—১২টাড্রপুর

৫ই এপ্রিল, ১৯৪৫, ৫৯৯নং ইউনিটে কমাণ্ডার কর্ত্তৃক ৭৪৭নং এবং ৮০১নং ইউনিট কমাণ্ডারদের নিকট মৌখিক আদেশ লিখিতভাবে সমর্থন করা হইতেছে।

রেঃ—৮৪ইনং এবং ৮৪ইনং ম্যাপসীট।

৫৯৯নং ইউনিট এর মূল দল কর্ত্তৃক যে আক্রমণ পন্থা গ্রহণ করা হইবে, তদনুযায়ী নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি করিতে হইবে।

(১) ৮০১নং ইউনিট আই, এন, সি, এল, রোড হইতে পোপা ডিফেন্সের ভার গ্রহণ করিবে।

কায়ুক পাদাং—পোপা হইতে ইণ্ড, রোড পোপা পাইনবিন এবং ৬ই এপ্রিল সন্ধ্যার মধ্যে ৭৪৭নং ইউনিটের সকল সৈন্যদের রেহাই দিতে হইবে।

(২) ৮০১নং ইউনিট মিকটিলা কায়ুক পাদাং ডিফেন্স ভার গ্রহণ করিবে। এবং ৮ই এপ্রিল সকালের মধ্যে ৭৪৭নং ইউনিটের সৈন্যদের রেহাই দিতে হইবে।

৯ই এপ্রিল সন্ধ্যা হইতে ৭৭৭নং ইউনিট আক্রমনের জন্য যে নির্দ্দেশই দেওয়া হউক না কেন তজ্জন্য প্রস্তুত থাকিবে।

২। ডি, কিউ, এম, জি, ৫৯৯নং ইউনিট যানবাহন চলাচল ইউনিটদের যথাসাধ্য সাহায্য করিবার চেষ্টা করিবে। ইউনিট কমাণ্ডারগণ অগ্রবর্ত্তী যে দলগুলি কায়ুক পাদাং মিকটিলা ডিফেন্স লইবার জন্য যাইবে তাহাদের প্রয়োজনীয় কোন এম, টি-র জন্য ডি, কিউ, এম, জি-র সহিত সংযোগ রক্ষা করিতে হইবে।

(স্বাঃ) শাহ নওয়াজ খাঁ
কর্ণেল
কমাণ্ডার, ৫৯৯নং ইউনিট,
আজাদ হিন্দ ফৌজ।

ইউনিট নং ৫৯৯ কর্ম্মপন্থা অদেশ নং ৬ বিশেষ গোপনীয়

সময় ১২টা দুপুর ৯৪ এল এবং ৬নং কপি

৮৪ এফ নং ম্যাপ

তাং—এপ্রিল, ১৯৪৫

(১) **সংবাদ—**

৫৯৯ নং ইউনিটকে নূতন ভার দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার কর্ত্তব্য নিম্নলিখিতরূপ হইবে :—

(ক) প্যারাস্যুট—নিরোধ কার্য্য

(খ) এল, ও, সি পাহারা কার্য্য

(গ) ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সৈন্য যেখানে আছে সেখানে আইন ও শৃঙ্খলা আনয়ন করা।

(খ) ও (গ) সম্বন্ধে—বি, ডি, এ-র সৈন্যগণ বিদ্রোহ করিয়াছে এবং ডাকাতদল নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহারা গ্রাম লুট করিতেছে এবং ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সৈন্যদের এবং জাপানী সৈন্যদের হয়রাণ কবিতেছে। আমাদেব কর্ম্মপন্থা প্রধাণতঃ তাহাদের বিরুদ্ধেই হইবে।

(২) **উদ্দেশ্য—**

তাহাদের কার্য্য করিতে হইলে, ৫৯৯ নং ইউনিট-এর ফর্ম্মেশনদের নিম্নলিখিত অঞ্চলে প্রবেশ করিতে হইবে :—

(ক) ৬০৩ নং ইউনিট। ইহাদের বর্ত্তমান অঞ্চল—মাগওয়ে—মাইবা। ৬০৩ নং ইউনিট কর্ত্তব্যমুক্ত হইয়া—মাগওয়ে অঞ্চলে ৬০৩ নং ইউনিটের সহিত যোগদান করিবে।

(খ) ৭৪৭ নং ইউনিট। নাটমাঙ্ক-টাউংডুইগাই অঞ্চল।

(গ) ৮০১ নং ইউনিট। মাগওয়ের প্রায়-১৫।২০ মাইল দক্ষিণে—দক্ষিণ—পূর্ব্ব কোনে মিকথিলা হইতে সিনবাউংগোয়ে অঞ্চলে।

(ঘ) ৫৯৯ নং ইউনিটের হেডকোয়ার্টার মাগওয়ে অঞ্চলে কোন এক স্থানে চলিয়া যাইবে।—যথার্থ স্থান পরে জানান হইবে।

(৩) **উপায়—**

(ক) ১০ই এপ্রিল, ১৯৪৫ সন্ধ্যা হইতে ইউনিটগুলি নিজ নিজ ভাবে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিবে। গমন কার্য্য যত শীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করা হইবে। প্রত্যেক ইউনিট এই সকল হেডকোয়ার্টার্সে তাহাদের এই ষ্টেশন হইতে গমনের একটি বিস্তৃত প্রোগ্রাম দাখিল করিবে।

(খ) রাস্তা।

(১) নাচ্চিংকলাম—

ইউনিট নং ৫৯৯

নিম্নলিখিত গ্রামের মধ্য দিয়া পরিচালিত গাড়ীর সড়ক ধরিয়া যাইবে :—

কায়ুক পাদাউং—ইউয়ালা—ইয়েজোন—ওকসিটনওয়েট—মাগওয়ে।

(২) ৭৪৭ নং ইউনিট নিম্নলিখিত রাস্তা ধরিয়া যাইবে :—

কায়ুক পাদাদাউং—কাইয়াটফুন—সানগন মাগিইগন ইয়ামান—নাটমাউক—টাউংডিউইংগাই।

(ক) টিপিটি। যতদূর সম্ভব। ইউনিটগুলি তাহাদের নিজেদের

আয়োজন নিজেরাই করিবে। ভারী মালের জন্য একদল থাকিয়া যাইবে ; তাহারা পরে সুবিধামত ঐ মাল লইয়া যাত্রা করিবে।

(খ) (১) কেবলমাত্র নাট মউক-অভিগামী ইউনিট ব্যতীত প্রত্যেক ইউনিট যাত্রাকালীন পর্যাপ্ত রেশন সঙ্গে লইবে এবং আরও তিন দিনের মত লইবে।

(২) নাটমউক অভিগামী ইউনিট অন্ততঃপক্ষে ৭ দিনের রিজার্ভ খাদ্য লইবে।

যে সকল রেশন একমাসের রিজার্ভ হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল এই অঞ্চলের ইউনিটের জন্য তাহা ডি, কিউ, এম, বি, র নিকট ফেরৎ দেওয়া হইবে। এ-সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পরে পৃথক দেওয়া হইবে।

তাহাদের দায়িত্বে ইউনিটগুলি চাল এবং লবণের রিজার্ভ খাদ্য ডি, কিউ, এম, জি-র নিকট প্রত্যার্পণ করিবে।

(গ) **চিকিৎসা—**

মেডিক্যাল এয়ার পার্টি হাসপাতাল এখানে ৯ই এপ্রিল বন্ধ করা হইয়াছে। এ, ডি, এম, এস কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী রোগী এবং দ্রব্যাদি সরান হইবে।

৫৯৯ নং ইউনিটের অগ্রসরের বিশেষ বিশেষ নির্দেশ পৃথকভাবে দেওয়া হইয়াছে। তাহা কঠোরভাবে পালিত হইবে।

(৫) **সংবাদ—**

গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়া প্রত্যেক ইউনিট তাহাদের "সবঠিক" (কিম্বা অন্য কিছু) রিপোর্ট ৫৯৯ নং ইউনিট হেডকোয়ার্টার্সের নিকট পাঠাইবে।

(৬) **স্বীকার—**

(স্বাঃ) শাহ নওয়াজ খাঁ

কর্ণেল।

কম্যাণ্ডার, ৫৯৯ নং ইউনিট।

তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। গোয়েন্দা কাহিনীর মতো ইহার অধ্যায়গুলি চাঞ্চল্যকর। এ বিষয়ে এরূপ গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নাই। আজাদ হিন্দ ফৌজ লিখিয়া তারিণীবাবু খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্কলিত 'আগষ্ট বিপ্লব'ও ঘরে ঘরে সমাদৃত হইবে —যুগান্তর

"This is a graphic and moving history of the August Revolution. The author, whose book on the Azad Hind Fauj is well-known, is fast gaining a reputation as a chronicler of freedom's battles. This book is well documented. As one turns the pages, one gains the impression that the August Revolution was a spontaneous rather than an organised effort. And musing on the unequal contest between an Empire on the one side and a band of unarmed people on the other, it is difficult to resist a sigh and a tear." —The Nationalist.

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আগষ্ট বিপ্লব ও India in Revolt (1942) পুস্তকের বিক্রয় লব্ধাংশ আগষ্ট বিপ্লবে নিপীড়ীত জনগণের সাহায্য কল্পে ব্যয়িত হইবে।

প্রাপ্তিস্থান :—

হিন্দুস্থান বুক ডিপো

১২নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়

History of the August movement in Bengal and Assam

India in Revolt (1942)

PART 1.

The first instalment of History of the August Revolution on that shook India from end to end. This book shows that Bengal and Assam made no mean contribution to the movement that opened up a new chapter in the history of India's struggle for independence.

প্রাপ্তিস্থান—হিন্দুস্থান বুক ডিপো

১২নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়

মিলিটারি বুরো গেজেট নং ৯ (২) ১৭ই এপ্রিল ১৯৪২

Lt.-Col. J. K. Bhonsla, D.M.B., I.I.L.

Lt. Mirza Inayat Ali Beg., A.D.C.

'G'
[Lt]-Col. [Sh]ah-Nawaz [Kh]an, C.G.S. [2]/Lt. W. Khan Supdt.

Chief Administrator Lt.-Col. A. D. Ioganadan, 2/Lt. Abdul Rahim, Supdt.

D. P. M.
Major Abdul Rashid.

Military Secretary Major P. K. Sahgal. 2/Lt L. C. Talwar A. M. S. 2/Lt. N. D. Pathak, Supdt.

Finance Capt. Krishna Murti 2/Lt. Din Mohd. 2/Lt. Narsingh Dev.

O. T. S.
Habib ur Rahman, Capt C. S. Nagi Capt. Man Singh, Capt. A. B. Singh.

Reinf : Op.
Maj. Mata ul-Mulk Comd. Capt. Nand Lal, Adjt.

Lt. Manbahadur
Lt. Sant Ram
Lt. Misri Khan
2/Lt. Ghulam Hussain
2/Lt. Kartar Singh
2/Lt. Karan Singh
2/Lt. Sher Singh
2/Lt. Narain Ram

"A"
Maj. C. J. Stracy Capt. Uttam Singh.

Legal & Judicial
Capt. D. C. Nag.

"Q"
Maj. K. P. Capt. S. N. Dey and T. Capt. Harijinder Singh O. O. Nontoch. Lt. Faqir Chand O. O. Toch.

D. M. S
Thimayya S. Dutta.

Est.
Lt. D. C.

Ops.
[Ca]pt. P. S. Raturi.

Int.
Maj. Prabhu Dayal.

Inf.
Capt. Mohammad Ashraf Khan 2/Lt. Tika Ram

Enlightenment Culture Comd.
Maj A. D. Jahangir, Capt. M. H. Alvi, 2/Lt S.K.H. Rizvi. 2/Lt. H. C. Arora ; 2/Lt. R. L. Vermani.

মিলিটারী বুরো গেজেট নং ৯ (২) ১৭ই এপ্রিল ১৯৪৩

Lt. Col. M. Z. Kiani, Army Commander.

A. D. C.
Lt. Abdul Majid, Personal Clerk
H. Qrs. I. N. A.

General Staff Branch.

A/Q. Branch

Medical Branch.
D. D. M. S.
A. D. M. S.
Lt.-Col. K. Rai.

"A" Branch.
D. A. G. Capt. Jagir Singh.

"O" Branch.
D. Q. M. G.
Maj. G. S. Dhillon.

Base Hosp.
Lt. Col. Lasliwal.

Med. Aid Party.
Maj. S. W. Palskar.

East. Branch
Capt. Amar Singh

Empl. pl.
2/Lt. Dharam Singh.

Ops. plans and and S. Duties Branch
Major. Jaswant Singh.
Capt. Ghulam Sarwar.
Capt. Jiwan Singh.
Clerk i/c "G" Br.
S. O. I. Mohammad Afsar.

Trag. Branch
Lt./Col. R. M. Arshad.
Capt. H. S. Bedi.

Ordnance.
Technical.
Capt. Amir Singh.
Non Tech.
Lt. Akbar Ali.

Supply and Tyt.
Major N. N. Khosla.
Lt. Mehtab Singh.
Lt. Girdhari Lal.

Clerk i/c. A. Q. Branch 2/Lt. G. I. Kohli.

মিলিটারি বুরো গেজেট নং ৯ (২) ১৭ই এপ্রিল ১৯৪৩

Guerrilla Regiments.

Gandhi Grla. Regt.

Comd. Lt.-Col. I. J. Kiani, 2-in C.

Thakar Singh Adj.

Q. M. 2/Lt. Mohammad Riza.
Sappar Officer, Lt. Pritam Singh.

Liaison Offr. Int. Officer Lt. Chanan Singh.

- I Grla Bn. Maj. Thakar Singh.
- II Grla Bn. Capt. M.A.K. Ranan.
- III Grla Bn. Maj. Pritam Singh.

Azad Grla Regt.

Maj. Comd. Maj. Gulzara Singh 2-in-C.

A. I. S. Dera, Adjt.

Q. M. 2/Lt. Imam ud Din, Int. Offr.
Hav. Darshan Singh.

Sapper Offr 2/Lt. Mastra Liaison off 2/Lt. Kishori Lal.

- IV Grla Bn. Capt. P. J. Lewis.
- V. Grla Bn. Capt. Ram Singh.
- VI Grla Bn. Lt. Jodh Singh (Temp).

Nehru Grla Regt.

Maj. Comd. Lt.-Col. Aziz Amad Khan, 2 in-C.

Maj. Bishan Singh, Adj.
2/Lt. Mohd. Hayat, Q. M.
Lt. Fazal Qadir Qureshi.
Sapper Offr. 2/Lt. Shiv Rao Devikar.

Int. Offr. 2/Lt. Yaspal Singh
Liasison offr.

- VII Grla Bn. Lt. Hari Singh (Temp).
- VIII Grla Bn, Lt Chander Bhan.
- IX Grla Bn. Capt. Padam Singh.

Intelligence Group.

Comd. Maj. S. A. Malik.
Staff Offr. Lt. Harnam Singh.
Adjut.
Q. M. 2/Lt. Atma Singh.
Interpreter 2/Lt. T. S. Wasan.
Hav. C. Basu.
2/Lt. S. K. Banerjee.
Sappar Offr. 2/Lt. Mohammad Afzal.

Coy. Comd. Niwaz Khan

Bahadur Group.

Comdt. Lt -Col. Burhan-ud-Din.
Staff. Offr.
Adjut.
H. M. Lieut. Gurbachan Singh.
Coy. Comds. Capt. M. M. Khurana.